অর্পিতা সরকার
চেনা অচেনার ভিড়ে

কিছু কথা

উপন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা হয় না। আমি মনে করি, পাঠকবন্ধুরা নিজেরাই পরিচয় করে নেবে উপন্যাসের চরিত্রদের সাথে। এই সংকলনে মোট তিনটে উপন্যাস আছে। তিনটে উপন্যাস তিনটে সময়কে নির্দেশ করছে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের একজন মানুষের মানসিকতার সাথে আজ থেকে পনেরো বছর আগের মানুষের মানসিকতার কতটা পরিবর্তন ঘটেছে অথবা আজকের এই মুহূর্তে মানুষের কাছে ভালোবাসা বা সম্পর্কের সংজ্ঞা ঠিক কি, সেটা বুঝিয়ে দেবে এই উপন্যাসের চরিত্ররা।

"কাছের সঙ্গী", "সহযাত্রী", "পরজন্ম চাই" তিনটে উপন্যাসের চরিত্রগুলোই আপনার ভীষণ পরিচিত। হয়তো বা আপনিই মিশে আছেন এর ব্যতিক্রমী অস্তিত্বের মূলে।

আমার আগের দুটো উপন্যাস "প্রাণের আলাপের" দয়িতা, অরিত্র আর "সে ছিল অন্তরালের" নয়না, রণজিৎকে আপনারা যেভাবে আপন করে নিয়েছেন, আশা করি এই উপন্যাসগুলোর চরিত্রদেরও ভালোবেসে আপন করে নেবেন।

চির পরিচিত চরিত্রগুলো কখনো আমাদের সামনে ধরা দেয় অচেনার রূপে। তখন পরিচিত মানুষের গন্ধটা ভীষণ অচেনা হয়ে যায়। আবার কখনো অপরিচিত মানুষটাই

হয়ে ওঠে কাছের। তাই এই উপন্যাসগুলোর চরিত্রদের সাথে আপনারা নিজেরাই আলাপ জমিয়ে নিন।

পাঠকবন্ধুদের ভালোবাসাই আমার লেখনীশক্তি।

অর্পিতা সরকার

সূচিপত্র

কাছের সঙ্গী

।। ১।।

আজ্ঞে কর্তাবাবু, বলছি, নায়েবখানার দিকের দক্ষিণের দেওয়ালে একটা বড় বটগাছ মাথাচাড়া দিচ্ছে। শিকড় বাকড় নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। মন বলছে, সে দক্ষিণের দেওয়ালকে ভেঙে দেবে।

গৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী সস্তার সিগারেটে টান দিয়ে বললো, ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর বলছো? তা দিক না। কে বটের সাহসের সাথে লড়াই করতে যাচ্ছে? আর বিষ্ণুকাকা, তুমি কেন বোঝো না বলতো, আমার ধমনীতে জমিদারী রক্ত বইছে বলেই আমি জমিদার নই। তোমার বয়েস তো কম হলো না, প্রায় বিরাশি না চুরাশি, সে যাইহোক মোট কথা আশির ঘর ছেড়ে দ্রুত দৌড়াচ্ছে। তারপরেও তুমি কি সেই আমায় কর্তাবাবু বলেই ডাকবে বিষ্ণুকাকা?

বিষ্ণুচরণ এ বাড়ির পুরোনো কর্মচারী। বংশানুক্রমে ওদের গোটা পরিবার এই রায়চৌধুরী বাড়িতে কাজ করে গেছে। এমন কি বিষ্ণুচরণের ছেলেও এই বাড়ির গাড়ির ড্রাইভার। তাই মহেশডাঙার এই জমিদারবাড়ির প্রতি বিষ্ণুচরণের টান আজন্মকাল ধরে।

বাবার সাথে নতুন জামা পরে প্রথম এই রায়চৌধুরী বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়েছিল। তখন এ জমিদার বাড়ির চাকচিক্য ছিল আলাদা। শ খানেক ঢাকি ঢাক বাজাচ্ছে। চণ্ডীমণ্ডপকে ঘিরে বিশাল ম্যারাপ বাঁধা। সেখানেই পংক্তিভোজনের ব্যবস্থা। গোটা গ্রামের লোক এসে জড়ো হয়েছিল। অষ্টমীর পুজো দেখে, ভোগ খেয়ে তবে সব বাড়ি ফিরবে।

খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের লুচি, ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, চার রকমের মিষ্টি। সেসব স্বাদ তো ভোলার নয়। গৌরীশঙ্কর তখনও জন্মায়নি। গৌরীশঙ্করের দাদুর জমিদারীর আমল। যদিও ইংরেজরা এসে জমিদারদের ক্ষমতা তখন প্রায় খর্ব করে দিতে শুরু করেছিল তবুও চন্দ্রশঙ্কর রায়চৌধুরীর দাপট তখনও অবশিষ্ট রয়েছে মহেশডাঙায়।

জমিদারী ক্ষমতা চলে গেলেও তার জমির পরিমাণ কিছু কম ছিল না। খাজনা আদায় প্রথা উঠে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার আয় বা সঞ্চিত অর্থ তখনও তাকে প্রভাবশালী মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করার মতো ছিল।

আর মহেশডাঙার মানুষজন তখনও তাকে দেখলেই পেন্নাম ঠুকে বলতো, আজ্ঞে জমিদারবাবু আমার বড় ছেলের বড্ড অসুখ, আপনি একটু না দেখলে মারা যাবে যে। জমিদার চন্দ্রশঙ্কর রায়চৌধুরীও গোমস্তা বা নায়েবকে ডেকে হুকুম দিতেন, ওরে কে আছিস এর হাতে কিছু টাকা দিয়ে দে। আর দেখিস যেন ছেলের চিকিৎসাটা

ভালো করে হয়। যদি দেখিস নেশা করে ওড়ালো তাহলে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নিস।

বিষ্ণুচরণ এসব যখন দেখেছে তখন ওরও কম বয়েস। বেশির ভাগই ওর বাপ ঠাকুরদার কাছ থেকে শোনা কথা। যেহেতু তারা এই বংশের সাথে আজীবন যুক্ত ছিল তাই বিষ্ণুর ঘর বলতেও এই রায়চৌধুরী বাড়ির ঘর। সংসার বলতেও এবাড়ির মানুষগুলো। বাপ, ঠাকুরদার কাছে এবাড়ির দোর্দণ্ডপ্রতাপ সব জমিদারদের কথা শুনে শুনে বিষ্ণুচরণের সব মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল।

এবাড়ি যেমন একদিকে ঐতিহ্যের প্রতীক, দান-ধ্যানের প্রতীক তেমনি দাপট আর অহংকারের ইতিহাসও লেখা আছে এর দেওয়ালের গোপন কক্ষে। খাজনা আদায়ের জন্য অনেক গরিব কৃষকের রক্তে রাঙা হয়েছে বৈঠকখানার দেওয়ালে টাঙানো শঙ্কর মাছের চাবুকটা। বিষ্ণুচরণের চোখ তার সাক্ষী নয় ঠিকই কিন্তু বিষ্ণুচরণের ঠাকুর্দার নিজের চোখের দেখা ঘটনা থেকেই ও জানতে পেরেছে রায়চৌধুরী বাড়ির রক্তে ছিল দম্ভ। এমন কি চন্দ্রশঙ্কর রায়চৌধুরীর দম্ভও কিছু কম ছিল না। পুজোর সময় দত্ত বাড়ির পুজোর সাথে কম্পিটিশন করে ঢাকির দল ডাকতেন তিনি। কিছুতেই যেন দত্তরা মানে উঠতি বড়লোকরা ছাপিয়ে না যায় রায়চৌধুরীদের বংশমর্যাদাকে। মুখে বলতেন, তেল বেচা চারটি টাকা পেয়ে দত্তরা দুর্গাপুজো চালু করলো, জানে না তো দুর্গাপুজোর খরচ। দেখা যাক ওই নতুন পালক গজানো দত্তরা কতদিন এ পুজো টানতে পারে!

দুর্গাপুজোর খরচ জোগাতে কান্তপুরের জমিদারকে তার জমিদারী অবধি নিলাম রাখতে হয়ছিল, সেখানে ওই কাঁচা পয়সার মালিক দত্তরা তো নেহাতই শিশু।

বিষ্ণুকাকা, দুর্গাপুজোর খরচ যা দাঁড়াচ্ছে তাতে আমার এই কেরানির চাকরির টাকায় তা কুলানো সম্ভব নয়। তাছাড়া মহেশডাঙায় এখন অনেকগুলো পুজো হয়। এখানের মানুষ আর সেই আগের মত জমিদারবাড়ির পুজোর অপেক্ষায় বসে নেই।

বিষ্ণুচরণের মুখে কেউ যেন এক পোচ কালো কালির তুলি টেনে দিলো মূহূর্তে। মুখের সবটুকু আলো নিভিয়ে বিষ্ণুচরণ বললো, তাই বলে মায়ের পুজো বন্ধ করে দেবে কর্তাবাবু? এমনিতেই তো তোমার বিয়েটা এখনও এই মহেশডাঙার লোকজন মেনে নিতে পারেনি। তারপর যদি বড় কর্তাবাবু মারা যাবার একবছরের মধ্যেই পুজো বন্ধ করে দাও, তাহলে তো লোকে ছি ছি করবে!

গৌরীশঙ্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, বাবার মৃত্যুটা আকস্মিক ছিল না বিষ্ণুকাকা। বাবার লিভারটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অত্যাধিক মদ্যপান তার কারণ বলেছিলেন ডাক্তাররা। কিন্তু আমার মনে হয় কারণটা বোধহয় আমি। বাবা তো অল্প বয়সে এমন বেহিসেবি জীবনযাপন করেননি, বরং বেশ গোছানো জীবন ছিল।

জমিদারী রক্তের অহংকার, রূপের দম্ভ, সম্মানের আকাঙ্খা নিয়ে বেশ ভালোই ছিলেন। বাবার দুই মেয়েরই ভালো বিয়ে হয়েছিল। সত্যি বলতে কি একমাত্র পুত্র সন্তানটি কুলাঙ্গার হবার পর থেকেই মনোকষ্টে বাবা

বেহিসেবি জীবন যাপন করতে শুরু করেন। তাই আমি জানি, বাবার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।

বিষ্ণুচরণ মুখ নিচু করে বলল, ছোট মুখে বড় কথা কর্তা, তবুও বলছি, নিজের জমি ভেস্ট করে দেওয়ার মত এমন অলুক্ষণে কথা কেউ শোনেনি। সেটাও তুমি করলে। তাছাড়া তোমার বিয়েটাও বড় কর্তাবাবু কোনোদিন মেনে নিতে পারেননি। কর্তামাও মনে মনে তোমাকেই দোষারোপ করেন বৈকি।

ত্রিশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গৌরীশঙ্করের গোঁফের ফাঁকে হালকা হাসির ছোঁয়া দেখা দিল। ফিসফিস করে বললো, ওই জন্যই তো বলি বিষ্ণুকাকা, আমি তোমাদের জমিদারবাবু নই। আমাকে ছোটকর্তা বলে ডেকো না। ছোটবেলায় যেমন দাদাবাবু বলতে অমনি বলো। জমিদারী রক্তের ভার আর বইতে পারছি না। দীর্ঘশ্বাসটা গোপন করার চেষ্টা না করেই বললো ও। রায়চৌধুরী বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে।

বিষ্ণুচরণ একটু থমকে দাঁড়িয়ে থেকে বললো, তাহলে কর্তামাকে গিয়ে কি বলবো? তুমি কি অন্দরে গিয়ে নিজেই বলবে?

গৌরীশঙ্কর হাতের সিগারেটটা কারুকার্য করা স্ফটিকের ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে বললো, বেশ আমিই বলবো যা বলার। তবে এই পুজো চালানো আর আমার দ্বারা সম্ভব নয় গো। চারটে হাতি পোষার খরচ। আমার একবছরের মাইনে দিলেও এমন রাজকীয় পুজো করা সম্ভব নয়।

লম্বা টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে দেখলো, মাধবীলতা একা দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনদীঘির সবজে জলের দিকে তাকিয়ে। এক সময় ওই পুকুরে গোলাপী পদ্ম ফুটতো। গৌরীশঙ্কর আর মাধবীলতা দুজনে একসাথে সাঁতরে বড় বড় পদ্ম তোলার খেলায় মেতে উঠতো।

।। ২।।

মাধবীলতাকে ও চেনে সেই বছর ছয়েক বয়েস থেকে।

মহেশডাঙার রায়চৌধুরী বাড়িতে একটা ছোট্ট মত পুতুলকে সাজিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। পরণে লাল বেনারসী, নাকে নথ, কপালে সিঁথিময়ূর, ছোট্ট কপালে বেশ বড় একটা লাল টিপ। গৌরীশঙ্করের চেয়ে মেয়েটা বছর তিনেকের ছোট। ও তখন ক্লাস ফাইভে পড়ে। অবাক চোখে দেখছিল অমন ছোট্ট মেয়ের বউ বউ সাজ। মায়ের কাছে গিয়ে বলেছিল, ওটা কে মা? ওকে অমন কেন সাজানো হয়েছে? ওর মাথায় মুকুট কেন?

মা হেসে বলেছিল, এবার থেকে এই বাড়ির পুজোয় কুমারীপুজো চালু হলো। তোর দাদু গতবছর পুজোর সময় বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন, ওখানে দেখেই এ বছর থেকে এ বাড়িতেও কুমারী পুজো শুরু করলেন।

কিছুই মাথায় প্রবেশ করছিল না ওর। হঠাৎ ঠাকুরের পাশে ওই পুচকি মেয়েটা কেন গিয়ে বসলো, কেনই বা সবাই ওকে ঠাকুরের মত পুজো করবে...অনেক প্রশ্নের ভিড়ে একটা কথাই মনে হয়েছিল, ওদের বাড়ির পুজোয় ওর পুজো করা হয় না, আর একটা বাইরের মেয়ের পুজো কেন হবে!

ওর দাদুর বয়েস তখন প্রায় পঁচানব্বই। তবুও বেশ শক্তপোক্ত ছিলেন। তিনিই দাঁড়িয়ে পুজোর তদারকি করছিলেন। বাবাও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। গৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী বাড়ির একমাত্র বংশপ্রদীপ বলে ওর একটু বেশিই আদর ছিল। আর বাবার যথেষ্ট বেশি বয়েসের সন্তান ও। বাকি সব দিদি আর বোন। এমনকি ওর মেজ কাকারও দুই মেয়ে, ছোট কাকারও এক মেয়ে। বংশে ছেলে বলতে শুধু ও। তাই চন্দ্রশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রায় বলতেন, দাদাভাই ভাগ্যিস জন্মালো তাই মহেশডাঙার রায়চৌধুরী পদবীটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না। বাকি সব তো পরগোত্রে চলে যাবে। মেয়ে মানেই তো অপরের সম্পত্তি, নিজের বলতে শুধুই গৌরী।

সেই দাদুই কিনা একটা পুচকি মেয়ের পুজো করছে ওকে বাদ দিয়ে।

হন্তদন্ত হয়ে ও পৌঁছেছিল দাদুর সামনে। দাদুকে মহেশডাঙার সবাই ভয় করে বলেই হয়তো দাদুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বেশ ভয়ই করতো ওর। তবুও এ অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না ভেবেই ভয়ে ভয়ে বলেছিল, আমি যদি তোমার সংসারের একমাত্র প্রদীপ হই তাহলে আমায় বাদ দিয়ে ওই বাইরের মেয়েটাকে পুজো কেন করছো?

দাদু একটু থমকে দাঁড়িয়ে তারপর দরাজ গলায় হেসে বলেছিলেন, এটা যে কুমারী পুজো, তাই রমেশ ঘোষালের একমাত্র কন্যা, সুলক্ষণা মেয়েটিকেই বেছে নিতে হয়েছে

এই পুজোর জন্য। একটু ভুল হলেই মা কুপিত হবেন যে দাদুভাই।

রাগে ধপ ধপ পা ফেলে ও এসে দাঁড়িয়েছিল চণ্ডীমণ্ডপের সামনে। ততক্ষণে ওই মেয়ে বসে পড়েছে ব্রাহ্মণের সামনে। বিরক্ত হয়েই গৌরীশঙ্কর ওকে জিভ ভেঙিয়েছিলো। সে মেয়েও চুপ করে থাকেনি, পাল্টা জিভ দেখিয়েছিল ওকে। পুজোর শেষে বেনারসী গুটিয়ে কোমরে হাত দিয়ে ওর সামনে এসে বলেছিল, ঠাকুর দেবতাকে কেউ জিভ দেখায়? তোমার জিভ খসে যাবে।

গৌরীশঙ্কর মুখ ভেঙিয়ে বলেছিল, যে ঠাকুর নিজেই জিভ দেখায় সে আবার ঠাকুর কি?

ওই পাকা মেয়ে তখন আরেকধাপ গলা চড়িয়ে বলেছিল, মা কালীও তো সবাইকে জিভ দেখায়, তাই বলে কি তাকে আমরা জিভ দেখাবো? তুমি যে আমায় জিভ দেখালে তোমার জিভ এবারে মাটিতে খসে পড়বে।

গৌরীশঙ্কর বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল মেয়েটার নিখুঁত যুক্তি শুনে।

ভয়ে ভয়ে বলেছিল, তাহলে আমায় এখন কি করতে হবে?

মেয়েটা আর কিছু না বলে কোমরে শাড়িটা গুটিয়ে পালিয়েছিল।

ও মেজকাকিমার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ঠাকুরকে জিভ দেখালে কি হয় গো?

মেজকাকিমা কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলেছিল, জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়, বোবা হয়ে যায়!

গৌরীশঙ্কর বলেছিল, আর ওই যার কুমারী পুজো হলো তাকে জিভ দেখালে?

মেজকাকিমা বলেছিল, ওমা, মাধবীলতাও যে এখন ঠাকুর রে। দেখলি না ব্রাহ্মণ ওকেও মন্ত্র বলে মাতৃজ্ঞানে পুজো করলো?

ভয়ে ওর বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল।

মেজকাকিমা বলেছিল, কান মুলে ক্ষমা চেয়ে নিস ঠাকুরের কাছ থেকে। তুই ছোট ছেলে, তোর ওপরে কি উনি রাগ করে থাকতে পারেন?

গৌরীশঙ্করের তখন উভয়সঙ্কট অবস্থা। একে তো ওই মাধবীলতা নামক অত্যন্ত পাকা মেয়েটাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে। তাছাড়া ওইটুকু মেয়ের সামনে নিজের জিভ বাঁচাতে কান মুলে ক্ষমা চাওয়াটাও সম্মানহানির বড় কারণ। তবুও ক্ষমা ওকে চাইতেই হবে রাত পেরোনোর আগেই। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতেই দেখলো নথ পরা মেয়েটা একটা পিঙ্ক কালারের ফ্রক পরে কাঞ্চনদীঘির ধারে বসে পা দোলাচ্ছে।

গৌরীশঙ্কর একটু সাহস করেই মেয়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটা ওকে দেখেই জিভ ভেঙচে বলল, পচা ছেলে, আমি খুব রেগে আছি। এমন পাপ দেব যে বিকেলে তুমি তোমার ব্যাটটাই খুঁজে পাবে না।

এমন সংকটে ওকে আগে পড়তে হয়নি।

নরম গলায় গৌরীশঙ্কর বলেছিল, আমি তো তোমাকে ঠাকুর ভেবেই তোমায় একটা গিফট দিতে এলাম। আর তুমি বলছো তুমি আমায় পাপ দেবে?

মেয়েটা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বলেছিল, কি গিফট? কই দেখি?

আজ সকালেই মেজপিসি এসেছে কলকাতা থেকে। একটা খুব সুন্দর পেন্সিলবক্স এনেছিল ওর জন্য।

পাপের ভয়ে এখন এই মেয়েটাকে থুড়ি ছোট্ট মেয়ে ঠাকুরটাকেই এটা দিতে হচ্ছে। আরেকবার প্রিয় পেন্সিলবক্সটাতে হাত বুলিয়ে ও মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, এই নাও।

মেয়েটা পেন্সিলবক্সটা উল্টে পাল্টে দেখে বললো, বা দারুণ তো। আবার গাড়ির ছবিও আঁকা আছে। তারপরেই মুচকি হেসে বলল, এটা তুমিই নাও। আমি তোমায় পাপ দেব না। কিন্তু ঠাকুররা কখনো ঘুষ নেয় না। ঠাকুররা এমনিই সবার ভালো চায়। আমারও তো বামুনদাদু পুজো করেছে। আর বাবা বলেছে, আমিও যেন সবার ভালো চাই। তাই তোমার পছন্দের পেন্সিলবক্সটা আমি নেব না। তুমি মনে দুঃখ পেলে আমিও কষ্ট পাবো।

গৌরীশঙ্করের চোখদুটো প্রায় কপালে উঠে যাচ্ছিল। বাপরে মেয়েটা কি মারাত্মক কথা বলে। কত কথা জানে। ও সে তুলনায় বয়েসে বড় হয়েও বোকাই রয়ে গেল।

নিজের এই বেশি কথা না বলতে শেখার জন্য এই মুহূর্তে বাবার ওপরেই রাগ হলো বেশি। বাবা সব সময় বলেন, ছোটদের মুখে বড় বড় কথা নাকি বড্ড বেমানান।

গৌরিশঙ্কর পেন্সিলবক্স হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির রাস্তা ধরেছিল। ঠিক তখনই মেয়েটা বলে উঠলো, আমার নাম মাধবীলতা, তোমার নাম কি?

গৌরীশঙ্কর দাঁড়িয়ে পিছন ঘুরে বলেছিল, গৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী।

মাধবীলতা ফিক করে হেসেছিল। হাসলে মেয়েটার গালটা ফুটো হয়ে যায়। মা যেন এটাকে কি একটা বলে। যাকগে ওই ফুটো গালের মেয়েটার দিকে একটু গম্ভীর ভাবেই তাকিয়ে গৌরীশঙ্কর বলেছিল, কি ব্যাপার হাসছো কেন?

মেয়েটা আরেকবার হেসে বলেছিল, তোমার এত বড় নাম? শুধু গৌরী বা শুধু শঙ্কর হলেই তো চলতো। আমি তোমায় শঙ্করদা বলে ডাকবো। এই যে তোমায় আমি পাপ দিলাম না, তাই তোমার জিভটাও মুখের মধ্যেই রয়ে গেছে, পড়ে যায়নি এইজন্য তোমায় একটা কাজ করতে হবে। আমায় ক্রিকেট খেলা আর ডাংগুলি খেলা শিখিয়ে দিতে হবে।

গৌরীশঙ্কর খুব খুশি হয়েছিল। সাধারণত মাঠে খেলতে গেলেই বড় ছেলেরা হাত থেকে ব্যাট বলটা নিয়ে মাঠের শেষে বল কুড়ানোর জন্য দাঁড় করিয়ে দেয়। আর সমবয়সীদের সাথে খেলতে গেলে দু বলে আউট করে দিয়ে বলে, যা বাড়ি যা। জমিদার বাড়ির ননীর পুতুল হয়ে থাকিস। এর সবগুলোই বেশ অপমানজনক।

বরং এই মাধবীলতাকে যদি শিখিয়ে নেওয়া যায় তাহলে মন্দ হয় না। গৌরীশঙ্কর এক কথায় লাফিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসলো।

বেশ নরম গলায় বলল, তুমি কখনো খেলেছো? খেলতে জানো ক্রিকেট?

মাধবীলতা বেশ দৃঢ়তার সাথে বললো, জানি। আমি খেলতেও পারি। আমি যখন মামার বাড়ি যাই তখন দাদাদের সাথে খেলেছি। কিন্তু এই পাড়ায় মেয়ে বলে কেউ খেলা নেয় না। বলে যা পুতুল খেল। কিন্তু আমার পুতুল খেলতে ভালো লাগে না।

গৌরীশঙ্কর মাধবীলতার হাতটা চেপে ধরে বলেছিল, আমরা বন্ধু হলাম। সব সময় পাশে থাকব। মাধবীলতা মিষ্টি করে হেসে বলেছিল, খুব মজা হবে। বন্ধু শব্দের প্রকৃত অর্থ না জেনেই শুরু হয়েছিল ওদের বন্ধুত্ব।

গৌরীশঙ্কর নিজের সবটুকু ক্ষমতা দিয়েই মাধবীলতাকে ব্যাট বলের লড়াই শেখানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মাধবী প্রতিদিনই রেগে গিয়ে বলতো, তুমি কিছুই জানো না। মেয়েদের আউট করতে নেই তাও জানো না।

অগত্যা সর্ব বিষয়ে পারদর্শী মাধবীর কাছে শঙ্করকে হার মানতে হয়েছিল। ওর কথা না শুনলেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করতো মাধবী, তাই বাধ্য হয়ে কান্না থামাতে ওভারের পর ওভার বল করে যেত শঙ্কর। আর উইকেট আগলে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতো মাধবী। বারংবার আউট হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং দুর্গার অংশ এবং মেয়ে হওয়ার দৌলতে শঙ্কর কোনদিনও ব্যাটসম্যান হতে পারতো না।

কুমারীপূজার পর থেকেই মহেশডাঙার লোকজন মাধবীলতাকে পথে ঘাটে দেখলেই হাত জোড় করে প্রণাম করতো। ওর মুখ দেখলে নাকি তাদের দিন ভালো যায় এমন এমন একটা কথার প্রচলন হয়েছিল গ্রামে। পথচলতি লোকজন তাদের ছোট্ট দুর্গার হাতে চকলেট,

কেক, বিস্কুটের প্যাকেট ধরিয়ে দিতো। মাধবী অবশ্য বন্ধুত্বের শর্ত মেনে সে সব জিনিস একা খেত না। শঙ্করের জন্য বিকেল পর্যন্ত রেখেও দিতো।

এমনিতে শঙ্করের মাধবীকে খারাপ লাগতো না। কিন্তু ব্যাট নিয়ে নিলেই বলতো, এমন অভিশাপ দেবে যে শঙ্করের জিভ খসে যাবে। এমন ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলের বিরুদ্ধে গিয়েই শঙ্কর পর পর দুদিন মাধবীর সাথে না খেলতে এসে পাড়ার অন্য বন্ধুদের সাথে খেলতে গিয়েছিল। দূর থেকে মাধবীকে দেখেও পাত্তা দেয় নি। এমনকি মাধবী হাতের ইশারায় লালচে রঙের কেকের প্যাকেটটা দেখালেও সাড়া দেয়নি শঙ্কর। প্রায় মাস দুয়েক পরে হাতে ব্যাট পেয়ে ও তখন খেলতে ব্যস্ত ছিল।

মাধবী মিনিট কুড়ি মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে নানা রকম ভাবে শঙ্করকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

শঙ্কর দেখেও দেখেনি এমন ভাব করে বন্ধুদের সাথে খেলছিল।

দিন পাঁচেক মাধবীলতার আর দেখা পায়নি শঙ্কর। নিজের মনেই স্কুল গেছে। স্কুল থেকে ফিরে পড়াশোনা খেলাধুলো নিয়েই মেতে ছিল।

সপ্তম দিনে মাঠে বেরোতেই একটা দৃশ্য দেখে থমকে গিয়েছিল শঙ্কর। মাধবীলতা ওরই বয়েসী একটা ছেলের সাথে ক্রিকেট খেলছে। ব্যাট বল দুটোই নতুন।

ছেলেটা বল করছে মাধবীর নির্দেশ মত, আর মাধবী ব্যাট চালাচ্ছে।

দেখেই কোনো কারণ ছাড়াই অযৌক্তিক রাগে গাটা জ্বলে উঠেছিলো ওর। কটকট করে মাধবীলতার দিকে তাকিয়ে গৌরীশঙ্কর বলেছিলো, তা ইনি বুঝি মা দুর্গার বাহন?

মাধবী মুখটা বেঁকিয়ে বলেছিল, চল পীযুষ তুই বল কর। যে বন্ধু হবে কথা দিয়েও কথা রাখে না, তার সাথে আমার আড়ি।

গৌরীশঙ্কর অসহায় গলায় বলেছিল, ঠাকুরকে জিভ দেখালে জিভ খসে পড়ে, আর ঠাকুর মুখ বেঁকালে কিছুই বুঝি হয়না?

মাধবীলতা যথারীতি ওই পীযুষ নামক ছেলেটির বলে আউট হয়েও নিজের জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, হয় তো। সেও জীবনে অনেক কষ্ট পায়। তারও কোনো বন্ধু হয়না। কথাটা বলেই কাঁদো কাঁদো গলায় ব্যাট বল পীযুষের হাতে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল।

ওর ওই কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে আর অভিমানে ছুটে চলে যাওয়ার পথের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে মনে মনে ভেবেছিল, ইস, ছোট মাদুর্গাকে কাঁদিয়ে ফেললাম! বড় অন্যায় হলো। মুখ ভার করে বাড়ি ফিরেছিল গৌরীশঙ্কর। বেশ কয়েকদিন রাস্তায়, স্কুল যাওয়ার পথে আর মাধবীলতার দেখাই পায়নি ও।

কিছুদিনের মধ্যেই ভয়ঙ্কর মনখারাপ করা একটা খবর এসেছিল গৌরীশঙ্করের কানে। ওকে নাকি পড়াশোনার জন্য কলকাতায় মামার বাড়িতে পাঠানো হবে।

জমিদারী চলে গেছে কবেই, তবুও রায়চৌধুরী পরিবারের ঠাটবাটের ভাটা পড়েনি কিছুতেই। বাড়ির অন্য ছেলে মেয়েদের মতোই গৌরীশঙ্করও নিজেকে জমিদার, রায়বাহাদুর ভাবতে শুরু করার আগেই ওকে এই পরিবেশ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। গৌরীশঙ্করের বড়মামা ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যার সামনে ওর দাদু চন্দ্রশঙ্কর রায়চৌধুরীও মাথা নিচু করে কথা বলতেন। মামা নিজের দুই ছেলেকে ডাক্তার বানানোর কাজে মন দিয়েছিলেন। সে কাজ সফল হবার মুখেই একমাত্র ভাগনার প্রতি তার নজর পড়ে। ব্যস, গৌরীশঙ্করের মা নন্দিনীদেবীকে নির্দেশের সুরে বলেন, নদী, ছেলেটাকে মানুষ করতে দে। তোদের ওই জমিদারী হালচাল আর বেশিদিন টিকবে না এ রাজ্যে। মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে রে। অশিক্ষিত জমিদারদের দিন শেষ। তাই গৌরীকে আমার কাছে কলকাতায় পাঠিয়ে দে। নন্দিনীদেবী মহেশডাঙায় যতই জমিদারগিন্নীর ভাবসাব করুক না কেন, বড়দার চোখের দিকে তাকিয়ে তার নির্দেশ অগ্রাহ্য করবে এমনটা কল্পনাতেও আনতে পারবে না।

পুজোর ছুটিতে বা গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি গেলেই মামা অঙ্ক কষাতে বসত, যেটা গৌরীশঙ্করের একেবারেই নাপসন্দ ছিল, সেই বাঘের গুহায় মা ওকে নির্দ্বিধায় ঢুকিয়ে দিয়ে আসবে আজীবনের মত এটা ভাবতেই দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল। কিন্তু বড়মামার কথা যে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে তার আভাস বাবা, মায়ের কথাতেই

পেয়েছিলো ও। উমাশঙ্কর রায়চৌধুরীও সেদিন ঘরে বসেই বলছিলেন, বুঝলে নন্দিনী, তোমার দাদা কিন্তু প্রস্তাবটা খারাপ দেননি। উনি বিচক্ষণ মানুষ। ঠিকই বুঝেছেন, জমিদারী উঠে গেছে, সরকারের জমি অধিগ্রহণ কর্মসূচি চলছে চারদিকে। তাই গৌরীশঙ্কর যদি এই জমিদারীর ভরসায় জীবন কাটায় তবে বড়ই দুর্দিন আসছে। তার থেকে ছেলেটা তোমার দাদার মত মানুষ হোক। সুশিক্ষিত মানুষের সম্মান গোটা দেশময়। গৌরী না হয় মহেশডাঙার বাইরে পা দিয়েই বুঝুক জীবনটা কেমন। আমরা তো এই গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যেই কাটিয়ে দিলাম। নন্দিনীদেবীর ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে উমাশঙ্কর বাবু বলেছিলেন, দূরে বিদেশে তো কোথাও যাচ্ছে না, যাচ্ছে তো তোমার বাপের বাড়িতে। তোমার বৌদি মানুষটিও বড় ভালো। গৌরীর অনাদর কোনোমতেই হবে না। তোমার কদিন কষ্ট হবে নন্দিনী, কিন্তু ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এটুকু কষ্ট তোমায় মানতে হবে বৈকি!

।। ৩।।

মায়ের ঘর থেকেই আওয়াজটা শুনতে পেল গৌরীশঙ্কর।

না না বিষ্ণু তুমি আর ওর হয়ে সালিশি করতে এস না বাপু। রায়চৌধুরী বাড়িতে একটা কুলাঙ্গার জন্মেছিল। এর থেকে এ বংশ নির্বংশ হলেই বোধহয় ভালো হতো। এ বংশের মান তো কবেই ডুবিয়েছে কাঞ্চনদীঘির জলে। এখন ঐতিহ্যটুকুও শেষ করে দিতে বদ্ধপরিকর। মায়ের গলার তীক্ষ্ন ব্যঙ্গাত্মক কথাগুলো শুনেই গৌরীশঙ্করের

দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলো মাধবীলতা। কিন্তু ঠোঁটটা অল্প ফাঁক করেই আবার বন্ধ করে নিলো। বোধহয় এই আলোচনা করার অধিকার ওর নেই বলেই এমন মৌনব্রত! গৌরীশঙ্করের ঠোঁটে করুণ হাসি। ওর চেনা সেই মাধবীলতার কি মারাত্মক পরিবর্তন। সেই কথায় কথায় কোমরে হাত দিয়ে রুখে দাঁড়ানো মেয়েটার যেন বিবর্তন ঘটে গেছে। পুনর্জন্ম নিয়েছে একটা মুখচোরা, নির্বিবাদী, ভাবনার জগতে বাস করা মেয়ে। এই মাধবীলতাকে গৌরীশঙ্কর চিনতো না কোনো কালে!

কিছু বলবে মাধবী? নিঃসংকোচে বলো, আমার কাছে দ্বিধা কিসের?

মাধবীলতা ধীর গলায় বলল, তোমার জন্য তোমার মা অপেক্ষা করছেন দক্ষিণের ঘরে। আমি এই কথাটা বলতেই এসেছিলাম। তারপর কাঞ্চনের সবজে জলে স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম।

গৌরীশঙ্কর বললো, তো কাঞ্চনের গভীর সবজে জলে আমারও একটা মূল্যবান জিনিস হারিয়ে গেছে। পারলে একটু খুঁজে দেখো। খুঁজে দিতে পারলেই পুরস্কার আছে।

মাধবী বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, কি জিনিস?

গৌরীশঙ্কর ওর কানের কাছে ফিসফিস করে বললো, আমার পরিচিত মাধবীলতা।

ও পাশ থেকে জেঠিমা বলে উঠলো, দিনের বেলায় বেহায়াপনা এ বাড়ির কোনো পুরুষ করেছে বলে শুনিনি গৌরী! এ মেয়ে কি সব রকম ছলাকলা শিখেই এসেছে! আমি আর তোমার মা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি তোমার

সাথে কথা বলবো বলে, যদি সময় পাও তো একবার পায়ের ধুলো দিও ওঘরে।

মাধবীলতা মাথায় ঘোমটা দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

ওর চলে যাওয়ার সময়ের সংকোচটুকু বলে গেলো, দোহাই, আর অপমান করো না আমায় তোমরা! সেদিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে যাচ্ছিল গৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী। এ বংশের শেষ বংশধর।

মাধবীলতা হালকা পায়ে অন্দরে ঢুকে গেলো। যদিও মূল অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার ওর নেই। বৈঠকখানার পাশ দিয়ে নায়েবখানাকে উত্তরে রেখে যে মস্ত ঘরটাতে এখন মাধবীলতা প্রবেশ করলো সেটাকে এবাড়ির লোকজন ভদ্রভাষায় অতিথিশালা বলতো। গৌরীশঙ্কর ছোটবেলায় দেখেছে, এ বাড়ির বিশেষ অতিথি এলে এই ঘরেই রাজকীয় ব্যবস্থা করতেন দাদু। তারপর ধীরে ধীরে এ ঘর তার ঐতিহ্য হারিয়েছে গোটা রায়চৌধুরী বাড়ির মতই। এখন ভীষণ ভাবে আটপৌরে এর সাজসজ্জা। নেহাত পুরোনো আমলের মেহগনি কাঠের পালংক আর দেরাজ খানা আছে তাই ঘরটা জমিদারীর গন্ধ বহন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাধবীলতার স্থান হয়নি নন্দিনীদেবীর খাস অন্দরমহলে। তার ঠাঁই হয়েছে এই অতিথিশালা নাম বহনকারী ঘরটাতেই। মাধবীর অবশ্য তাতে কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি তার কিছুতেই নেই। শুধু তার কারণে কেউ গৌরীশঙ্করকে অপমান করলে বড্ড অসহায় বোধ করে ও। তখন নিজেকে অকারণে দোষারোপ করে ক্ষতবিক্ষত করে ওর নিষ্পাপ মনটাকে।

গৌরীশঙ্করের হাজার নিষেধ সত্ত্বেও বারবার নিজেকে দোষারোপ করে যন্ত্রণা ভোগ করে মাধবীলতা। যন্ত্রণা, কষ্ট এগুলো পাওয়া যেন তার জন্মগত অধিকার।

গৌরীশঙ্কর অন্যমনস্ক ভাবে নানা কথা ভাবতে ভাবতেই এগোলো মায়ের ঘরের দিকে।

নন্দিনীদেবীর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার সব সময় দেখতে পায় গৌরীশঙ্কর। বন্ধুদের মুখে যে মায়ের বর্ণনা শুনেছে, তার সাথে ওর মায়ের যেন বড্ড পার্থক্য। ছোটবেলায় যদিবা স্নেহের স্পর্শ পেত, একটু বড় হতেই জমিদার গিন্নীর অহংকার বড় বেশি সুস্পষ্ট হতে লাগলো ওর চোখে। তখন থেকেই মায়ের গায়ে আর সেই নির্মল মা মা গন্ধটা পেত না গৌরীশঙ্কর। বরং দেখতো এক গা গয়না আর দামি শাড়ি পরে নির্দেশরত এক অপরিচিত মহিলা। যার কাছে রায়চৌধুরী বাড়ির ঐতিহ্য অনেক দামি একমাত্র সন্তানের জ্বরো কপালের চেয়ে। ছেলের মাথায় জলপট্টি দেওয়ার চেয়ে বর্গাদারদের সাথে হিসেব বুঝে নেওয়ায় ছিল বেশি উৎসাহ। মাতৃস্নেহ সেভাবে না পেয়েও মাকে সম্মান করে গেছে গৌরীশঙ্কর। কারণ স্বল্পপরিচিত দূরের ওই মহিলাকেই একমাত্র ও মা বলে ডাকতে পারতো। তাই নন্দিনীদেবীর অনেক অন্যায্য কথাও নির্বিবাদে মেনে নিয়ে এসেছে কিছুদিন আগে পর্যন্ত। কিন্তু মায়ের সব আব্দার মানতে মানতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে গৌরীশঙ্করের। নিজের ইচ্ছেগুলোর জলাঞ্জলি দিয়েই ও মেনে নিচ্ছিল রায়চৌধুরী বাড়ির অযৌক্তিক নিয়ম কানুন।

বড় ঘরের কোণে একটা বিশাল আবলুস কাঠের পালংকে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন নন্দিনীদেবী। সামনে রুপোর ডাবর। তার থেকে পান সেজে দিচ্ছে বিন্দু পিসি। বিন্দু পিসিই গৌরীকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। মায়ের থেকে বয়েসে বছর দুয়েকের ছোটই হবে। কিন্তু বেঁটে বেঁটে গোলগাল চেহারার বিন্দুপিসির মুখে চোখে এখনো গ্রাম্য সরলতা। বিন্দু পিসিও একজনকে ভালোবাসতো। গৌরী জানতো তার কথা। কিন্তু নন্দিনীদেবীর কাছের বিশ্বস্ত চাকরানীর কোনোদিন বিয়ে হতেই পারে না, এমন সিদ্ধান্তে স্থির থেকেই বাড়ির ড্রাইভার গোবিন্দকাকাকে বিনাদোষে কাজ থেকে বিতাড়িত করেছিল মা। গোবিন্দকাকার অনেক কাকুতি মিনতিতেও গলেনি নন্দিনীদেবীর মন। বিন্দুপিসিকে লুকিয়ে কাঁদতে দেখেছিল ও। সেই থেকেই বিন্দুপিসি ওর মায়ের কথাবলা বাধ্য তোতাপাখি হয়েই রয়ে গেছে এবাড়ির অন্দরমহলে।

মায়ের পাশে জেঠিমাও বসে রয়েছেন দেখে ধীর নরম গলায় গৌরিশঙ্কর বললো, মা আমায় ডেকেছিলে?

নন্দিনীদেবী বিন্দুপিসির হাত থেকে পানটা নিয়ে মুখের মধ্যে ভরে দিয়ে ভ্রু কুঁচকে বিরক্ত মুখে বললো, অনেকক্ষণ ধরেই ডাকছিলাম শঙ্কর, কিন্তু আপাতত তোমার ফুরসৎ বড়ই কম মিলছে বলে শুনেছি। তা কলকাতার বাসাতেও কি আঁচলের নীচে থাকতেই ভালোবাসো? এবাড়ির কোনো পুরুষমানুষ নারীদের দ্বারা বশীভূত হয়নি বলেই জানতাম, তুমি দেখছি সব নিয়মের মত এই নিয়মটিও ভাঙতে উদ্যত হয়ে পড়েছো।

নেহাত কচি খোকাটা তো নয়। তোমার বাবার তোমার বয়েসে দুটো মেয়ের জন্ম হয়ে গিয়েছিল। তাই বিয়ের পরের মাদকতায় ভাসছ শুনতেও বড্ড শ্রুতিকটু আর কি। সে যাকগে, এবারের দুর্গাপুজোর বিষয়ে কথা বলতেই তোমায় ডাকলাম।

কুমারী পুজোয় এবাড়ির যা সর্বনাশ হয়ে গেছে তাতে আমি বাধ্য হলাম তোমার দাদুর প্রবর্তন করা পুজো বন্ধ করে দিতে। কুমারী পুজো ছাড়াই এবাড়ির দুর্গা পুজো হবে এবার। তোমার বাবার অকালে মৃত্যুর কারণও হয়তো তুমি আন্দাজ করতে পারছ! মানুষটা মনকষ্টেই শেষ হয়ে গেলেন। জমিদারী হারিয়ে তোমার দাদু এত কষ্ট পাননি, এবাড়ির ঐতিহ্য হারিয়ে তোমার বাবা যা পেলেন। আর সেটার কারণ যে তুমি সে বিষয়ে নিশ্চয়ই তোমার কোনো দ্বন্দ্ব নেই! গতবছর কালাশৌচ ছিল বলেই নম নম করে পুজো সারতে হয়েছে। এবছর কিন্তু বেশ ঘটা করে করবো ভেবেছি। ব্যবস্থা করো শঙ্কর।

গৌরীশঙ্কর আমতা আমতা করে বললো, কিন্তু পুজোর তো অনেক খরচ! নন্দিনীদেবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে বললেন, কি বলতে চাইছো তুমি?

।।৪।।

কি বললে তুমি? তুমি মামার বাড়ি চলে যাবে? এমন কথা তুমি বন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারলে? মাধবীলতা বেশ ছলছল চোখে তাকিয়ে বলেছিল গৌরীশঙ্করকে।

মহেশডাঙা ছেড়ে কলকাতা যেতে হবে ভেবেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল, তারপর মাধবীলতার চোখে জলের বিন্দুর আনাগোনা দেখে নিজেই কেঁদে ফেলেছিলো পুরুষত্বের অহংকারকে বর্জন করে।

নিজেকে সামলে নিয়ে গৌরীশঙ্কর বলেছিল, কেন তোমার তো নতুন বন্ধু হয়েছে দেখলাম। যাকে নিয়ে তুমি ক্রিকেট খেলছিলে। কদিন তো আমার ধারে কাছেও আসো নি।

মাধবীলতা কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিল, ওকে মেরে ভাগিয়ে দিয়েছি। তুমি আমায় খেলা না নিলেও তুমিই আমার বন্ধু। করুণ স্বরে গৌরীশঙ্কর বলেছিল, আর খেলা! কদিনের মধ্যেই তো চলে যেতে হবে।

মাধবীলতা বয়েসের তুলনায় একটু বেশিই পাকা ছিল। গম্ভীর ভাবে বলেছিল, যখন বাড়ি ফিরবে তখন যেন দেখা করতে ভুল না। মনে রেখো এই মহেশডাঙায় একজন বন্ধু তোমার জন্য বসে আছে। কাঞ্চনদীঘির দিকে তাকিয়ে মাধবী বলেছিল, আমি সাঁতার শিখবো, পরেরবার তুমি যখন আসবে তখন তোমায় ওই পদ্মটা তুলে দেব। পুজোর সময় আমার হাতে পদ্ম ছিল বলে তোমার রাগ হচ্ছিল, তাই না? আমি তোমায় গোলাপী পদ্ম তুলে দেব।

গৌরীশঙ্কর মাধবীলতার হাতটা শক্ত করে ধরে বলেছিল, আমায় ভুলে যাবে না তো?

মাধবী নিজের কান্না ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলেছিল, ঠাকুররা কি কাউকে ভুলে যায়? আমিও তো কুমারী ঠাকুর, আমি কাউকে ভুলবো না।

গৌরীশঙ্করের মন ভালো করার জন্যই মাধবী বলেছিল, বেশ, আমি আজ বল করবো সারাক্ষণ আর তুমি ব্যাট।

খেলায় মেতে উঠেছিলো দুজনে। তারমধ্যেই ঘুরে ফিরে আসছিল গৌরীর মহেশডাঙা ছেড়ে যাবার দুঃখ।

মাধবীলতার সাথে খেলে বেড়ানোর দিন যে হাতেগোনা সেটা বুঝেই মান অভিমান ভুলে রোজ বিকেলে নিয়ম করে ওরা এসে বসছিলো কাঞ্চনদীঘির পাড়ে।

কচুপাতার ওপরে জলের ফোঁটা নিয়ে শুরু হতো দুজনের প্রতিযোগিতা। কতক্ষণ কার পাতায় জলের অস্তিত্ব বজায় থাকে তারই পরীক্ষা চলতো।

বেশিরভাগ দিনই জিতে যেত গৌরীশঙ্কর। কারণ মাধবীলতা স্বভাবে বড়ই চঞ্চল। এক সেকেন্ডও সে চুপ করে বসতে পারে না। জল ভর্তি কচুপাতা নিয়েই সে হুটোপাটি করতো। ফলস্বরূপ তারা পাতার জল খুব দ্রুত মাটি স্পর্শ করতো। ধীর, স্থির গৌরীশঙ্করের জয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। তবে নিজের জেতার থেকেও হেরে গিয়ে মাধবীলতার মুখের বোকা বোকা হাসিটা দেখতে ওর ভারী মিষ্টি লাগতো। মনে মনে ভাবত, এমন দুষ্টু ঠাকুর হলে ভক্তদের যে কি হাল হবে। একদণ্ড স্থির নয় এমন চঞ্চল ঠাকুরকে হারিয়েও বেশ মজা হতো ওর। রাগ করে নিজের কচু পাতাটা মাটিতে ফেলে দিয়ে মাধবী বলতো, তুমি খুব পচা। আমায় একটা বাজে পাতা দিয়ে নিজে ভালো পাতাটা নাও, তাই আমার পাতায় কিছুতেই জল দাঁড়ায় না।

পরক্ষণেই মেতে উঠতো খেলনা বাটি খেলতে। জেনে নিতো গৌরীশঙ্করের পছন্দের পদগুলো। তারপরেই ওর তৈরি মাটির উনোনে নারকেলের মালাইয়ে রান্না হত কাতলা মাঝের কালিয়া। কবে যে নিজের পছন্দ ভুলে গৌরীর পছন্দ মতই রান্নার মেনু ঠিক করতে শুরু করেছিল মাধবীলতা সেটা বোধহয় ও নিজেও জানে না। তবে এটুকু জানতো, গৌরীশঙ্কর কাতলা মাছের কালিয়া, সোনামুগের ডাল, মুড়িঘন্ট, বড়ি দিয়ে সুক্ত ভীষণ ভালোবাসে। যদিও কি করে সেসব পদ রাঁধতে হয় তা জানত না মাধবী, তবুও ওর ধুলো বালির সরঞ্জামেই রান্না হতো গৌরীশঙ্করের সব পছন্দের পদগুলো। গৌরীও মাধবীলতার মুখে হাসি দেখবে বলেই মিথ্যে অভিনয় করতো। পাতার ঝোলে হাত ডুবিয়ে মুখে আওয়াজ করে বলতো, উফ দারুণ হয়েছে মাছের ঝালটা। আমাদের বাড়ির বামুনও এমন রাঁধতে পারে না। ঝলমলে হয়ে উঠত মাধবীলতার চোখ দুটো। ঠোঁটের কোণে হালকা লজ্জা মিশিয়ে বলতো, তোমার ভালো লেগেছে আমার রান্না? আমার বাবা বলে আমার মেয়ের মতন রাঁধতে এ দুনিয়ায় কেউ পারে না। আমি তো বাবাকেই এতদিন রেঁধে খাওয়াতাম। বাবা বলে, আমি মায়ের চেয়ে ঢের ভালো রাঁধি।

রমেশ ঘোষাল ওদের বাড়ির কুলপুরোহিত। রমাকাকাকে ছোট থেকেই দেখেছে ওদের গোপালের মন্দিরে পুজো করতে ঢুকতে। নেহাতই নিরীহ মানুষ। সাত চড়ে রা করেন না। বরং গোপালের নাড়ু, ভোগ গৌরীর

হাতে দিয়ে বলেন, খাও বাবা। এ বংশ যে তোমায় রক্ষা করতে হবে। তোমার অনেক দায়িত্ব।

সেই রমেশকাকার মেয়ে কিনা এমন ডাকাত!

এতদিন বাবাকে ধুলো বালির মাছ, তরকারি খাইয়ে সাধ মেটে নি, এখন আবার গৌরীশঙ্করকে পাকড়াও করেছে।

একমুহূর্ত স্থির নয় এই মেয়ে। চোখের পলকে গাছের ডাল থেকে পা ঝুলিয়ে বলেছে, পেয়ারা খাবে?

হি হি করে হেসে বলেছে, এতক্ষণ তো মিছিমিছি খাবার খেলে। পেট তো ভরেনি! এই নাও ভালো পেয়ারা খাও।

ওকে গাছের ডালে বসে থাকতে দেখে শঙ্কিত হয়ে ও বলেছে, নেমে এস বলছি। পড়ে যাবে যে, হাত, পা ভাঙবে!

মেয়েটা আরো জোরে হেসে উত্তর দিয়েছে, আহা, ভীতুরাম জমিদার। গাছেও উঠতে পারেনা। সাঁতারও কাটতে পারেনা। মুখ ভেঙিয়ে উঠে গেছে আরও উঁচুতে। নীচে দাঁড়িয়ে গৌরী ভগবানের নাম জপেছে। মনে মনে বলেছে, মেয়েটার যেন কিছু না হয়। মাধবী ফ্রকের মধ্যে করে পেয়ারা এনে ওর হাতে দিয়ে বলেছে, নাও খাও। কিছুই তো পারো না, পুরো সংসারই আমায় সামলাতে হবে। উফ, আর পারি না বাবা। পাক্কা গিন্নীর সামনে গৌরী চিরকালই অসহায়ের মত হেসে বলেছে, গাছে উঠলে দাদু বকবে। সেই ছোটবেলা থেকেই গৌরীশঙ্করের ধারণা হয়েছিল, ওর থেকে বয়েসে ছোট মেয়েটা বোধহয় অনেক

ক্ষমতার অধিকারিণী, তাই ওকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করা হলো। মাধবীলতা সঙ্গে থাকলে কোনো বিপদ স্পর্শ করতে পারবে না গৌরীশঙ্করকে।

মাধবীর সাথে বন্ধুত্ব হবার পরে পাড়ার ছেলেরা ভেংচি কেটে বলেছে, জমিদারবাড়ির ছেলের বন্ধু কিনা শেষ পর্যন্ত একটা পুচকে মেয়ে! ওর রাগ হয়নি, বরং ভালো লেগেছিল, কারণ মাধবীলতাকে ও বিশ্বাস করত।

কিন্তু ওর মহেশডাঙা ছেড়ে চলে যাওয়ার দিন অনেক চেষ্টা করেও মাধবীর সাথে দেখা করতে পারে নি ও। ওদের সব খেলার জায়গা, লুকোচুরির লুকোনোর সমস্ত সম্ভাব্য জায়গা খুঁজেও মাধবীর দর্শন পায়নি। আগেরদিন মাধবী কত কথা বলেছিল, কিন্তু যাওয়ার দিন ওকে না খুঁজে পেয়ে খুব মনখারাপ হয়েছিল গৌরীর। বড় মামার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল গেটের বাইরে, মা, বাবা এমনকি দাদুও মুখ কালো করে দাঁড়িয়েছিল। তাই মাধবীর সাথে দেখা না করেই গাড়িতে চাপতে হয়েছিল ওকে।

মাও সঙ্গে এলো না। মামাই বোধহয় বলেছে, ওকে বড় হতে দে, ইমোশন কন্ট্রোলের জিনিস, সেটাই কর নদী।

কষ্ট হচ্ছিল খুব, ভীষণ রকম কান্না পাচ্ছিলো গৌরীশঙ্করের। কিন্তু মাধবীলতা বলেছিল, ভীতু, বাচ্চা ছেলেরা কাঁদে, তুমি কি তাই?

ওই কথাটা শোনার পর থেকে নিজেকে বড় প্রমাণ করার তাগিদেই কান্নাকে কন্ট্রোল করে ও। তবুও আজ বড় বড় দুটো ফোঁটা জল ওর গাল বেয়ে টুপ করে পড়েছিলো হাতের চেটোতে।

।। ৫।।

বেশ কড়া গলায় ভর্ৎসনার সুরে মা বললো, আর লোক হাসিও না শঙ্কর। বাবার মৃত্যুর বছর না ঘুরতেই পুজো বন্ধ করে দিতে চাও কোন সাহসে? এ বাড়ির সম্মান তুমি বহুভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছো, বারবার একই কাজ করো না। কলকাতায় চাকরি করো, সংসারে মাত্র কয়েকটা টাকা পাঠাও। জমি জায়গার কিছুই দেখছো না। যা ইচ্ছে করছ, আমি কিছুই বলছি না। তাই বলে দুর্গাপুজো বন্ধ করে দেবে এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না।

গৌরীশঙ্কর ধীর গলায় বলল, মা, বাবা বেঁচে থাকতেই আমাদের ম্যাক্সিমাম জমি ভেস্ট করে নিয়েছিল সরকার। জমি অধিগ্রহণ কর্মসূচিতে একজন মানুষের নামে খুব বেশি পরিমাণ জমি রাখার নিয়ম নেই। আর আমাদের সব জমিই ছিল দাদুর নামে। খুব কম সংখ্যক জমি ছিল বাবার নামে। দাদুর মৃত্যুর পরে সেসব জমি সরকার ভেস্ট করে নিয়েছে। তাই এখন জমি থেকে বিশাল কিছু আয় হয়না। আমি অনেক লড়াই করে বাড়িটা বাঁচিয়েছি।

নন্দিনীদেবীর চোখে দৃঢ় অবিশ্বাস ফুটে উঠলো।

সেটা বেশ খেয়াল করলো গৌরী। বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠলো। নিজের মাও ওকে বিশ্বাস করে না, বাকিরা যে করবে না সেটাই তো স্বাভাবিক। বাবা মৃত্যুর আগে গৌরীকে বলেছিলেন, তোমায় শহরে রেখে পড়াশোনা করালাম এই জন্য? নিজেদের জমির কাগজগুলো নিয়ে গিয়ে সরকারের কাছে বেচে দিয়ে এলে? পড়াশোনা জানা ছেলে নিজের পরিবারের সর্বনাশ করলে?

তোমার দাদু আমি কত কষ্ট করে জমিগুলো আগলে রেখেছিলাম আর তুমি কিনা এই বংশের একমাত্র বংশধর হয়ে এভাবে পথে বসালে? বাবার ভেঙে পড়া অসহায় গলা শুনে কষ্ট হয়েছিল গৌরীশঙ্করের। কিন্তু ও বোঝাতে পারেনি গত একমাস ধরে বি.এল.আর.ও. অফিস, কোর্ট, কাছারি করেও সরকারের জমিঅধিগ্রহণ নীতির বিরোধিতা করতে পারেনি। করলে হয়তো শেষ পর্যন্ত বাবার জেল হয়ে যেত। ও জানে রায়চৌধুরী বাড়ির বেশির ভাগ ভালো জমিই এখন বেহাত। বাকি যে ক বিঘে ধানী জমি আছে তাতে উর্বরতা একটু কমের দিকেই। চাষ করতে গেলে ভালো মত খরচ হয়। দামি কীটনাশক, সারের যা খরচ, তাতে চাষে লোকসানই হয়। এছাড়াও বর্গাদারদের জমিগুলোও আর ওদের নেই। প্রায় চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর ধরে বংশ পরম্পরায় যারা চাষ করছে সরকারের আনুকূল্যে সে সব জমির মালিকানা এখন তাদের। এসব কথা রায়চৌধুরী বাড়ির কেউ বুঝতে চায়নি। বাবা, মা থেকে কাকা, জ্যাঠারাও মনে করেছে, গৌরী নিজেদের জমি ভেস্ট করিয়ে সরকারের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছে।

গৌরীশঙ্কর জমিদারী সম্পর্কে উদাসীন। বংশ পরিচয় নিয়ে উদগ্রীব নয় ঠিকই কিন্তু অসৎ নয়, এটাই কাউকে বিশ্বাস করাতে পারেনি ও। এমন কি বিষ্ণুকাকাও বলেছিল, ছোটকর্তাবাবু, এমন ভাবে কেউ নিজেদের সর্বনাশ করে? দোষ না করেও দোষের বোঝা মাথায় বহন করছিল গৌরীশঙ্কর। যখন দেখেছিলো গোটা পরিবার

রায়চৌধুরী বংশের এই মারাত্মক ক্ষতির জন্য শুধু ওকেই দোষী করে গেছে তখন নিজেকে আর এই পরিবারের একজন মনে হয়নি। চারিদিকে সবার চোখেই ভর্ৎসনার দৃষ্টি দেখেছে ওকে কেন্দ্র করে। এমনকি বাবার মদ্যপান অতিরিক্ত বেড়ে যাবার জন্যও মা অবশেষে দায়ী করেছে ওকেই। নন্দিনীদেবী মদ্যপানে অচেতন স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় বলেছিলেন, সম্পত্তি হারানোর যন্ত্রণা ও কি বুঝবে? কেন যে গর্ভে ধরেছিলাম, কেন যে গর্ভপাত হলো না। ও না থাকলে আজ এই দিন দেখতে হতো না। মানুষটা একটু একটু করে নিজেকে শেষ করে দেবার খেলায় মেতেছে। আর ছেলে হয়ে সে খেলায় অগ্নিসংযোগ করে চলেছে। মায়ের বদ্ধমূল ধারণা গৌরিশঙ্করই দায়ী বাবার আকস্মিক মৃত্যুর জন্য।

নন্দিনীদেবী আরেকটা পান মুখে পুরে বললেন, আমি বিষ্ণুকে বলেছি দুর্গাপুজোর পুরো লিস্টটা করতে। ওই দেড়শ ঢাকিই হবে আর অষ্টমীর ভোগও হবে। শুধু এ বছর কুমারী পুজো হবে না।

মনে মনে কল্পনা করে চমকে উঠলো গৌরীশঙ্কর। গত বছরের পুজোর ধার এখনো পরিশোধ করে উঠতে পারেনি ও। তাও গতবছর বাবার মৃত্যুর কারণে নম নম করে পুজো হয়েছিল। দেড়শ ঢাকি দিয়েই পুজো শুরু করেছিলেন চন্দ্রশঙ্কর রায়চৌধুরীর পূর্ব পুরুষ। সেই থেকেই এ বাড়িতে দেড়শ ঢাকি চলে আসে পঞ্চমীর দিনই। সেদিন থেকে ওদের খাওয়া দাওয়া নতুন পোশাক

সব এবাড়ির দায়িত্ব। তারপর আছে পুরোহিতের খরচ। এ অসম্ভব মা বলে প্রায় আর্ত চিৎকার করে উঠলো গৌরী।

নন্দিনী দেবী বিরক্ত মুখে বললেন, সব সম্ভব। তোমার বেতনের টাকাটা এ মাসে পুরোটাই আমার হাতে দিও।

গৌরীশঙ্কর কি করে বোঝাবে ওর বেতনের চল্লিশ হাজার টাকায় এখনকার দিনে চল্লিশ জনকে পাত পেড়ে খাওয়ানো সম্ভব নয়, সেখানে এই মস্ত আয়োজন!

নন্দিনীদেবী রায় ঘোষণা করে দেবার ঢঙে বললেন, এবারে তুমি এস। আমি বিষ্ণুচরণকে নিয়ে নিমন্ত্রণের লিস্টটা সেরে ফেলি। প্রতিবাদ করতে যাওয়ার দ্বিতীয় চেষ্টা না করে রায়চৌধুরীদের বিশাল ছাদের সিঁড়িতে পা দিলো গৌরী। মাথার মধ্যে হাজার পোকার কিলবিল, কি করে হবে! কোথায় পাবে টাকা! জমি বিক্রি করে যদি পুজো করে তাহলে মায়ের আশ্রিত এই বিষ্ণুচরণ, বিন্দু পিসি, শ্যামলীপিসির মত মানুষগুলোর পেট চলবে কি করে। ওই জমিগুলোর ধান, আলুতেই রায়চৌধুরীদের বিশাল হাঁড়ি থেকে ভাত ফোটার গন্ধ বেরোয়। কলকাতায় যে ছোট ফ্ল্যাটটা ও অনেক কষ্ট করে কিনেছে তার লোন শোধ হতে এখনো তিনটে বছর। বড় মামার মৃত্যুর পরে দুই ভাইই মামীকে নিয়ে বিদেশে চলে গেছে। হাত পাতার মত কাউকেই খুঁজে পাচ্ছে না গৌরীশঙ্কর। মা চাইছে এবাড়ির দুর্গাপুজোটা হোক। ও এমন কুলাঙ্গার ছেলে যে সেটুকুর জোগাড় করার মত সামর্থ্যও ওর নেই।

অসহ্য অব্যক্ত কষ্টে দুমড়ে যাচ্ছে ওর বুকের ভিতরটা। এই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লেই বোধহয় তার সুরাহা

মিলবে। নীচের সবুজ ঘাস ছোঁবে ওর লাল রক্ত, মুক্তি পাবে ও। জমিদারের রক্ত নিয়ে নয়, আভিজাত্যের মুখোশ পরে নয়, পরজন্মে ও জন্মাতে চায় ওই দূরের জমিতে খালি গায়ে চাষ করা রাখালের মত। উন্মুক্ত আকাশের নিচে সবুজের মাঝে শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছে ছেলেটা। ওর মত ভারী বাতাসটাকে জোর করে প্রবেশ করাতে হচ্ছে না বেঁচে থাকার তাগিদে।

ছাদ থেকে একবার যদি লাফিয়ে পড়তে পারে তাহলেই মুক্তি, দুশ্চিন্তারাও নিশ্চিন্তে ঘুমাবে ওর সাথে।

।। ৬।।

কলকাতায় আসার পর থেকে আগের মামার বাড়িতে আসার আনন্দটা কি ভাবে যেন নিরানন্দে পরিণত হয়েছিল। আগে যখন মায়ের সাথে বছরে একবার মামা বাড়ি আসতো তখন এই হঠাৎ পাওয়া ঝাঁ চকচকে শহর, নানারকম নতুন খাবার, খেলনা দেখে আবেগে ভাসতো ও। ফিরতেই ইচ্ছে করতো না মহেশডাঙায়। কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে থেকে মনটা সর্বক্ষণ পড়ে ছিল মহেশডাঙার কাঞ্চনদীঘির পাড়ে। মামী যতই আদর করে খেতে দিক, মামা নতুন ব্যাগ, ড্রেস কিনে এনে দিক, মনখারাপি বাতাসটা কিছুতেই ওর পিছু ছাড়ছিল না। মামা বলেছিল, দুদিন পর থেকে তোর স্কুল। শীতের মরা রোদের দিকে তাকিয়ে হালকা করে ঘাড় নেড়েছিলো ও।

মামী বলেছিল, দেখবি কত নতুন নতুন বন্ধু হবে তোর।

বন্ধু শব্দটা শুনেই ছুটে মামাবাড়ির ছাদে উঠে এসেছিল গৌরী।

কালো পিচের রাস্তা দিয়ে ঝড়ের বেগে চলছিল বাস, লরি। গৌরীর ইচ্ছে করছিল, ছাদ থেকে লাফ দিয়ে একটা বাসের মাথায় চেপে বসতে। তারপর ড্রাইভারকে বলতে, মহেশডাঙা রায়চৌধুরীদের বাড়িতে নিয়ে চলো। ওরা তো জমিদার। চন্দ্রশঙ্কর রায়চৌধুরীকে নিশ্চয়ই সবাই চেনে। লাল রঙের বাসটার ড্রাইভার কাকুও নিশ্চয়ই চেনে। তাহলে এই বাসটায় চড়ে চলে যাবে কাঞ্চনদীঘির ধারে। তারপর মাধবীলতাকে অবাক করে দিয়ে বলবে, ওর পালিয়ে আসার গল্প। শুনে মাধবী নিশ্চয়ই চোখ বড় বড় করে বলবে, বাপরে শঙ্কর, তোমার কি সাহস! তারপর ওর মিথ্যে উনুনে চড়াবে গৌরীর পছন্দের রান্নাগুলো।

মাধবীর কথা ভাবতে ভাবতেই ওর ঠোঁটে হাসি ফুটেছিল। মনে পড়ছিল ওর পাকামী। মিথ্যে রান্নার অভিনয় করতে করতে কপালের ঘাম মোছা, আর গৌরীকে দোষারোপ করে বলা, তুমি তো দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছ, সংসার কি করে চলে সে খেয়াল রাখো?

এসব ভাবতে ভাবতেই চোখের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছিল লাল রঙের বাসটা। তখন আবার একমুঠো মনখারাপের কালচে রং এসে ঢেকে দিয়েছিল গৌরীর দৃষ্টিপথ। ঢাকা পড়ে গিয়েছিল রায়চৌধুরী বাড়ির উঠোন, ছাদ, বিষ্ণুচরণকাকার স্নেহ জড়ানো মুখটা। ঢেকে গিয়েছিল বিন্দুপিসির খাবার থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। আবছা হয়েছিল দাদুর আদরগুলো। মায়ের ওপরে মারাত্মক

অভিমান জমেই ছিল গৌরীর। বাবা ওর খুব কাছের মানুষ কোনোদিনই ছিল না। সামনের রাস্তার কোলে এখন অন্ধকার নামছে। নিভছে দিনের আলো।

তবে কলকাতায় অন্ধকার হয়না, স্ট্রিট লাইটের আলোয় আবার দিনের মতোই ঝকঝক করে ওঠে। সেই আলোর তীব্রতায় গৌরী বুঝেছিলো মামাবাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার রাস্তা নেই। রাস্তার কালো পিচের দিকে তাকিয়ে ও ভেবেছিল, একবার ঝাঁপ দিয়ে দেখবে? মরে গেলে যাবে।

ঠিক তখনই ছোট্ট দুর্গারূপী মাধবীলতা চোখ পাকিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছে, ছি, তুমি না আমার বন্ধু! আমায় কথা দিয়েছিলে সাঁতার শিখে কাঞ্চনদীঘি থেকে পদ্ম তুলে এনে দেবে, এখন বাজে কাজ করতে চাইছো? আমি খুব পাপ দেব।

কালো রাস্তার থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে, সিঁড়ির দিকে টুকটুক করে পা বাড়িয়েছে গৌরী। নীচে নেমেই মামীকে বলেছিল, আমি সাঁতার শিখবো। মামী খুশি হয়ে বলেছিল, বেশ, তোকে সুইমিং ক্লাসে ভর্তি করে দেব কাল। সাঁতার শিখতেই হবে। নাহলে বাড়ি ফিরে ওই ডাকাত মেয়ের সামনে হেনস্তার চূড়ান্ত হতে হবে।

কলকাতায় এসে অবধি মনমরা হয়ে ছিল ও। মামা, মামীর অনেক চেষ্টাতেও মুখে হাসি ফোটেনি। তাই সাঁতার শেখার প্রস্তাবে মামা, মামী দুজনেই খুশি হয়ে বলেছে, এই তো, আমাদের ছোট জমিদার এবারে সাঁতরে মহেশডাঙা চলে যাবে।

দিন সাতেক স্কুলে গিয়েই গৌরীশঙ্কর বুঝতে পেরেছিল, গ্রামে ওর যতই সম্মান থাকুক, এখানের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে ওকে বেশ বেগ পেতে হবে। শহুরে ছেলে মেয়েগুলোকে ভীষণভাবে লক্ষ্য করছিল শঙ্কর, আর রোজই শিখছিলো নতুন নতুন আদব কায়দা। বেশ কয়েকজনের সাথে পরিচয় হয়েছিল ঠিকই, তবে ওদের ও ক্লাসমেট বললেও বন্ধু বলতে নারাজ। কম কথা বলা, নিজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা গৌরীশঙ্করের বন্ধু কোনোদিনই খুব বেশি নয়। মাধবীলতার মত সবাইকে বলতেও পারে না, তুমি আমার বন্ধু হবে?

এই যে এখন শঙ্কর মহেশডাঙায় নেই, এখন নিশ্চয়ই মাধবী অন্য কাউকে বন্ধু পাতিয়ে তাকেই রেঁধে খাওয়াচ্ছে ওর ধুলোবালির তরিতরকারি। হয়তো এই একমাসে শঙ্করকে ভুলেই গেছে। অন্য কারোর বলে হয়তো ছয় মারতে ব্যস্ত সে। তার তো সবার সাথে গল্প না করলে আবার চলে না। শঙ্কর কিন্তু কাউকেই আর বন্ধু ভাবতে পারে না। পারলেও এদের ভাষায় বেস্টফ্রেন্ডের নাম জিজ্ঞেস করলে, ও বলে মাধবীলতা। সেদিন শঙ্করের ইঁচড়পক্ক ক্লাসমেট বললো, মাধবীলতা কি তোর গার্লফ্রেন্ড? বলেই চোখ মটকে হাসলো। মফঃস্বলের ছেলে, ক্লাস সিক্সের বিদ্যেতে এটুকুই বোঝে, গার্ল মানে মেয়ে আর ফ্রেন্ড মানে বন্ধু। তাই সে ঘাড় নেড়েই উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ।

ব্যস, ক্লাসের বেশ কয়েকটা মহা পাকা এসে ওকে ঘিরে ধরে বলেছিল, শঙ্কর তোর গার্লফ্রেন্ডের বয়েস কত?

প্রেম করিস বুঝি!

অজানা ভয়ে কেঁপে উঠেছিলো শঙ্কর। কেউ আবার মাধবীকে খারাপ বলবে না তো! তাই ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দিয়েছিল, মাধবীলতা আমার খেলার সাথী, আমার বন্ধু।

ছেলেগুলো সদুত্তর না পেয়ে মুখ বেঁকিয়ে চলে গিয়েছিল।

সেই তবে থেকেই মাধবীকে আড়াল করতে শুরু করেছিল শঙ্কর। অধিকারবোধ ঠিক নয়, তবে মূল্যবান কিছুকে যে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হয় এটা তখন থেকেই বুঝেছিলো শঙ্কর।

মামার বাড়িতে টেলিফোন থাকলেও মহেশডাঙায় তখনও টেলিফোন প্রবেশ করেনি। কালো ভারী যন্ত্রে কি সুন্দর শোনা যায় অন্যের গলা। এই টেলিফোনের গল্পটা যখন মাধবীকে বলেছিল শঙ্কর একমাত্র তখনই দামাল চোখদুটো স্থির হয়েছিল মুহূর্তের জন্য। অবাক হয়ে শঙ্করের হাতটা চেপে ধরে সে বলেছিল, সত্যি? এমন যন্ত্র আছে?

এর আগে বটগাছের কোটরে টিয়ার বাসা, কচুপাতায় জল থাকে না, হেলিকপ্টারের দুটো ডানা থাকে এসব গূঢ় তত্ত্ব যখনই ওই মেয়েকে বলতে বসেছে তখনই সে নাক কুঁচকে বলেছে, ধুর, আমি এগুলো সব জানি।

একমাত্র টেলিফোনের বিষয়টা সবজান্তা মেয়েটা জানেনা দেখে বেশ গুছিয়ে বসেছিলো শঙ্কর। নম্বর ডায়াল করার টেকনিক বোঝানোর সময় মাধবী তো রীতিমত উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, তারপর, কিরিং কিরিং সাইকেলের মত

আওয়াজ হবে? মুশকিল হলো, মাধবীকে তো তাও দু চারটে নিজের জ্ঞান বিতরণের সুযোগ ছিল। কিন্তু এই স্কুলে তো, এরা সবাই ওর থেকে বেশি জানে। তাই ওকেই চুপ করে সকলের সবটা শুনতে হয়। শুনেই অবশ্য মাথার মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখে গৌরীশঙ্কর, যেদিন মহেশডাঙা ফিরবে সেদিনই কাঞ্চনদীঘির ধারে বসে সব বলবে মাধবীকে। মেট্রোট্রেনের গল্প, চিড়িয়াখানা, তারামণ্ডল....এসব শুনে ওর মুখটা কেমন হবে সেটাই ভাবার চেষ্টা করছিল গৌরী।

।। ৭।।

গৌরীশঙ্কর মহেশডাঙা ছেড়ে চলে যাওয়ার দিন কিছুতেই ওর সাথে দেখা করেনি মাধবী। এ কেমন বন্ধু, যে ওকে ছেড়ে কলকাতা চলে যায়। মায়ের অনেক ডাকেও দরজা খোলে নি ও। একটা ঘরের মধ্যে বসে কেঁদেই গেছে। ও ছোট বলে কি ওর কষ্ট হতে নেই? স্কুলে গিয়েও পুরোনো বন্ধুদের সাথে হাসি গল্প করতে পারেনি। মা বাবাকে আড়ালে বলেছে, কেন যে কুমারী পুজোর জন্য আমার মেয়েটাকে খুঁজে পেল রায়চৌধুরীরা, আর তুমিও যে কেন রাজি হলে! তিনটে সন্তান নষ্ট হবার পরে আমি মাধবীকে পেয়েছিলাম তুমি কি জানতে না? তারপরেও মা দুর্গার পাশে বসিয়ে ওকে পুজো করার কি দরকার ছিল। পুজোর পর থেকেই মেয়েটা আমার কেমন বয়েস ছাড়া বড় হয়ে গেল। কদিন ধরেই দেখছি মেয়েটা আনমনা থাকে। পছন্দের খাবার খেতেও চায়না। এমনকি বন্ধুরা এসে ফিরে গেছে, মেয়ে আমার খেলতে যায়না। মা

বলে জড়িয়ে ধরেনি কতদিন। কি এমন হল মেয়েটার! সব সময় মুখ কালো করে, মনখারাপ করে বসে থাকে। সব হলো এই তোমার জন্য মাধুর বাপ। মেয়েটার বকবকে আমি রান্নাঘরে বসেও অতিষ্ঠ হতাম, মেয়েটার খলখল হাসিতে আমার দুপুরের ঘুম ভাঙত, সেই মেয়ে যেন বোবা হয়ে গেছে।

মাধবী আড়াল থেকে সব শুনেছিল। কিছুটা বুঝেছিলো, কিছুটা নয়। ও নিজেও জানে না কেন ওর আর খেলনাবাটি খেলতেও ইচ্ছে করছে না, কেন ওর কাঞ্চনদীঘির ধার দিয়ে গেলেই বুকের ভিতর কষ্ট হচ্ছে আর কারণ ছাড়াই চোখে জল বেরোচ্ছে। তবে জমিদার বাড়ির ছেলেটার জন্য খুব মনখারাপ করে। ক্রিকেট খেলতেও ইচ্ছে করে না। কেন যে ওর বন্ধুটা কলকাতা চলে গেল! রান্না করতেও ইচ্ছে করে না মাধবীলতার, শুধুই মনে হয়, কার জন্য আর করবো, কেই বা খাবে! সেদিন বিজয়া এক মুঠো দই পাতা নিয়ে এসে বলেছিল, চল দই পাতি, তাতেও মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল মাধবীর। শঙ্কর ওর পাতা সবুজ রঙের থক থকে দই দেখে বলেছিল, ওমা, একেবারে দইয়ের মত। তুমি কত কি জানো মাধবী। একমাত্র শঙ্করই স্বীকার করতো ওর গুণের কথা। বাকি সবাই তো দস্যি মেয়ে, বাচাল মেয়ে বলে ডাকে।

মাধবী জানে শঙ্কর এখন কলকাতায়, তবুও রায়চৌধুরীদের বিশাল বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় রোজ তাকাত গৌরীশঙ্করের দোতলার দক্ষিণের ঘরের

দিকে। বারবার মনে হতো এই বুঝি ওই সবুজ রঙের জানালাটা খুলে গিয়ে কেউ মুখ বাড়িয়ে বলবে, এই যে দুগ্গা ঠাকুরের বাহন চললে কোথায়! মাধবী কোমরে হাত দিয়ে বলতো, আমি নিজেই দুগ্গা ঠাকুর, তুমি আমার বাহন বললে? শঙ্কর জিভ ভেঙিয়ে বলতো, ওরে আমার ঠাকুর রে। বল করতে পারে না, আউট হলে ব্যাট দেয় না, সেও নাকি ঠাকুর।

স্কুলে যাওয়ার পথে ওই ঝগড়াটা আর এখন হচ্ছে না। তবুও ওই বন্ধ জানালার দিকে রোজ তাকায় মাধবী।

বাবাকেও জিজ্ঞেস করে, তুমি যে ওবাড়িতে পুজো করতে যাও, ও বাড়ির সব চেয়ে বদমাশ ছেলেটা কি কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরেছে?

বাবা ঘাড় নেড়ে বলে, কে গৌরী? না না সে এখন মস্ত ব্যস্ত আছে শুনলাম। নামী স্কুলে পড়ছে, পড়ার বড় চাপ।

মাধবী মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, থাকুক কলকাতায়, মহেশডাঙায় তার আছেই বা কে! মাধবীলতা হঠাৎই ছয়মাসে বেশ বড় হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে আর আম বাগানে, জাম বাগানে ঘুরে বেড়ায় না। মা অবাক হয়ে বলেছে, মেয়েটা আমার আচমকা বড় হয়ে গেল।

গ্রীষ্মের দাবদাহের দুপুরে মাধবীলতা ঘুমাচ্ছিলো ওদের একতলার ঘরে। হঠাৎই কেউ জানালায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলো ওকে, মাধবী....এই মাধবী...

মা বলে দুপুরে যারা রোদে ঘোরে তাদের নাকি দুপুর ভূতে ধরে। কিন্তু মাধবী তো এখন রোদে ঘুরছে না তবুও

কেন ওর জানালায় টোকা পড়ছে। তবে কি ভূতে ঢিল ছুঁড়ছে!

ভয়ে ভয়ে রাম নাম জপ করছিল মাধবী।

তবুও দরজায় ধাক্কা কমলো না, বরং দ্বিগুণ বেড়ে গেলো।

মা গেছে পাশের বাড়িতে, রমলা জেঠিমার কাছে। এসময় ওরা উলবোনা শেখে, গল্প করে। মাধবীও দিনদুই গিয়েছিল মায়ের সাথে। এখন আর যায় না। রমলা কাকিমা শুধুই বলে, এসব কাজ শিখে নে মাধু, অমন ছেলেদের মত ক্রিকেট খেলিস না। বিয়ের পরে এসবই কাজে লাগবে। ভিতরে ভিতরে রাগ হয়েছিল এসব শুনে। তাই মাধু আর যায় না মায়ের সাথে। বাবা বোধহয় এখনো পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছে। মাধবী এখন কাকে যে ডেকে বলবে ওর জানালায় ভূতের ঢিল পড়ছে, সেটাই ভাবতে ভাবতে আবার শুনতে পেল, এই মাধবী আমি শঙ্কর....

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে জানালাটা খুললো মাধবী।

ঘুম চোখে তাকিয়ে দেখল, ফর্সা মত একটা ছেলে তাকিয়ে হাসছে ওর দিকে।

মাধবী ভয়ে ভয়ে বললো, তুমি সত্যিই শঙ্কর, নাকি ভূত! ওর গলা নকল করে ডাকছ আমায়? শঙ্কর তো এত ফর্সা ছিল না?

গৌরীশঙ্কর হেসে বললো, এই যে ভীতু ঠাকুর, আমি শঙ্করের ভূত, তোমার ঘাড় মটকাব বলেই তো কলকাতা থেকে একটু আগেই এলাম।

মাধবী ভয়ে ভয়েই বললো, দাঁড়াও আমি যাচ্ছি তোমার কাছে। তবে একটা কথা জেনে রাখ, আমার গায়ে খুব জোর, যদি ভূত হও তাহলেও আমি তোমায় বেঁধে রাখবো বুঝলে!

মাধবী দরজার বাইরে বেরোতেই ওর হাতটা ধরে হেঁচকা টান দিলো শঙ্কর। চলো এখুনি, তোমায় ম্যাজিক দেখাবো।

মাধবীর চোখে তখনও ঘোর লেগে ছিল। ফর্সা, দারুণ সুন্দর চুলের কাট, আরেকটু লম্বা ছেলেটা সত্যিই কি গৌরীশঙ্কর? নাকি ভূত বা ছেলেধরা।

মাধবীর হাত ধরে উষ্ণ হাওয়া উপেক্ষা করে ছেলেটা ছুটতে ছুটতে নিয়ে এলো কাঞ্চনদীঘির ধারে। তারপর বলল, মাধবীলতা, দীঘির দিকে তাকাও।

কথা শেষ হবার আগেই জলে ঝপাং আওয়াজ তুলে লাফ দিলো শঙ্কর। ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল মাধবীর।

কাঞ্চনদীঘিতে অনেক জল। গভীরতাও কম নয়। সেখানে সাঁতার না জানলে কেউ নামতে পারে না। আর এইটুকু ছেলে হয়ে দীঘির জলে নেমে পড়লো!

মাধবী বড় বড় চোখ করে দেখছিল ছেলেটা অবলীলায় কাঞ্চনদীঘিতে সাঁতার কাটছে। দুটো পদ্মপাতা তুলে এনে বললো, চলো তোমায় সাঁতার শেখাই।

মাধবী ভীতু গলায় বলেছিল, যদি ডুবে যাই।

গৌরীশঙ্কর বেশ দম্ভের সাথেই উত্তর দিয়েছিল, শঙ্কর বেঁচে থাকতে মাধবীলতার কোনো ক্ষতি হবে না। ওই

ছোট ছেলেটার গলায় সেদিন যে কি ছিল জানে না মাধবী, শুধু মনে হয়েছিল, একে ভরসা করা যায়। ঠিক যেমন বাবাকে করে তেমন। শীতকালে টিউবওয়েলের ঠাণ্ডা জলে হাত দিয়েও বাবা বলে, মাধু একেবারে গরম জল, তাড়াতাড়ি এক বালতি মাথায় ঢেলে নে। শুধু বাবার কথায় বিশ্বাস করে ঠাণ্ডা জলকেও ওর গরম মনে হতো।

ঠিক ওরকমই মনে হয়েছিল, এই ছেলেটাও ওকে সামলে রাখবে। তাই কোনো কথা না ভেবেই শঙ্করের হাত ধরে নেমেছিল কাঞ্চনদীঘিতে।

জলের মধ্যেই শঙ্কর বলেছিল, সুইমিং শিখতে যেতাম ওখানে সপ্তাহে তিনদিন। তখন থেকেই ভাবতাম কবে তোমায় শেখাবো! এবারের ছুটিতে তোমায় সাঁতার শিখিয়ে ফিরবো। পরের বার দুজনের কম্পিটিশন হবে কিন্তু।

মাধু ওর গলাটা চেপে ধরে বলেছিল, ডুবিয়ে দিও না কিন্তু। শঙ্কর ফিসফিস করে বলেছিল, নিজে ডুবলেও তোমায় ডোবাব না।

।। ৮ ।।

এ সংসারটাকে ভরাডুবি না করলে বোধহয় তোমার চলছে না তাই না মাধবীলতা? পুরোহিতের মেয়ে হয়ে লজ্জা করে না এমন কাজ করতে! যার চরিত্রের ঠিক নেই সেই মেয়েই কিনা রায়চৌধুরী বাড়ির বংশধরের স্ত্রী।

মাধবীর স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে কাটা কাটা স্বরে কথাগুলো বলে গেল নন্দিনীদেবী। আমার ছেলেটাকে কেড়ে নিয়েও শান্তি পাওনি তাই না? এখন পড়েছো এ পরিবারের ঐতিহ্য নষ্ট করার খেলায়!

আসলে কি বলতো, বংশপরিচয়, ঐতিহ্যের তুমি কি বুঝবে! তোমার বাবা আমাদের বাড়ি থেকে দুটো চাল কলা নিয়ে যেত আর সেই রান্না করে দিন কাটতো, সে বুঝবে রায়চৌধুরী পরিবারের সম্মান! তোমার বুদ্ধিতেই বোধহয় গৌরী এ বাড়ির এত বছরের পুজো বন্ধ করার কথা ভাবনার মধ্যেও আনতে পেরেছে? তিলতিল করে এ বাড়ির সম্মান মাটিতে মিশিয়ে কেন দিতে চাইছো? এ বাড়িতে তোমায় বৌরানী হিসাবে বরণ করা হয়নি বলে?

দেখো মাধবীলতা, তোমার যা চরিত্র তাতে গৌরী তোমায় মেনে নিলেও আমি অন্তত মেনে নিতে পারবো না।

মাধবীলতা স্থির চোখে তাকিয়ে আছে নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে। রায়চৌধুরী বাড়ির এই সাদা কালো দাবার ছকের মত মেঝেতে ছোটবেলায় অনেকবার পা দিয়েছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করতো সব সাদা বা সব কালো ঘর নয় কেন! কেন একটা সাদা একটা কালো?

মাধবীর বাবা সহজ সরল ভাষায় বলেছে, এ পৃথিবীর সব মানুষ কি সমান? কারোর মন কালো, কারোর সাদা। কিন্তু আমরা তো গা ঘেঁষাঘেঁষি করেই বেঁচে আছি। তাই এই মেঝেতেও সাদা পাথরের পাশেই কালো পাথর আছে।

মাধু বিস্ময়ের গলায় বলেছিল, বাবা সাদাগুলোই যে ভালো, বুঝলে কি করে?

আমাদের পাড়ার মনিপিসি তো খুব ফর্সা কিন্তু মনটা খারাপ। আর মেনকাদির গায়ের রং তো কাল কিন্তু মনটা

আকাশের মত বড়।

মেয়ের জটিল প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে বাবা মাথা চুলকে বলেছিল, বেশ বেশ সাদা কালো দুই ভাই। তাই পাশাপাশি থাকে বুঝেছিস! তখন থেকেই এই সাদা কালো মেঝের প্রতি একটা মারাত্মক আকর্ষণ ছিল মাধবীর। শুধু মেঝের প্রতি কেন এবাড়ির বাগানের ওই কাঠচাঁপা গাছটার প্রতি ছিল ওর ভীষণ মায়া। তাই তো বাগানের এক কোণের অবহেলিত কাঠচাঁপা গাছটাকে যত্ন করতে নিজেই মাঝে মাঝে হানা দিতো এ বাড়ির বাগানে। মালি কাকাকে বলতো, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকাকে এত যত্ন করার পরেও তো এরা শুধু শীতকালেই ফুল দেয়। আর কাঠচাঁপাটা তো সারাবছর ফুল দেয় গো মালিকাকা, তারপরেও কেন ও একটুও যত্ন পায় না?

মালিকাকা হেসে বলতো, ও হলো এ পরিবারের পুরোনো সদস্য বুঝলে! তাই ওকে যত্ন না করলেও এ পরিবারেই থাকবে ও। কিন্তু নতুন অতিথিদের যদি আপ্যায়ন না করি তবে তারা মনমরা হয়ে পালাই পালাই করে পালাতে চাইবে। গোলাপ, ডালিয়ারা হলো কদিনের অতিথি, তাই তো ওদের যত্ন করতে হয়। আর তোমার ঐ কাঠচাঁপা তো জানেই এ পরিবারটা কেমন, তাই ওর রাগ-অভিমান হয় না। ও সারাবছর হাসি মুখে সুখ-দুঃখ সহ্য করে নেয়। ও যে পরিবারের অংশ। পরিবারের অংশ তো নিজেই অতিথি আপ্যায়নে মন দেবে, নিজে কি পেল না পেল তার হিসেব কষবে, পাগলী মেয়ে!

সেদিন থেকেই ছোট মাধুও হয়ে গিয়েছিল এই রায়চৌধুরী পরিবারের অংশ। কেউ ওকে সদস্য করেনি, নিজেই নিজেকে এ পরিবারের অংশ ভাবত ও। এবাড়ির প্রতি ওর টান যেন জন্মজন্মান্তরের। বাবার সাথে আসার ফলে এ বাড়িতে ওর যাতায়াত ছিল অবাধ। তাই বহুবার এই সাদা কালো মেঝেতে পড়েছে ওর পায়ের ছাপ। অবশ্য তখন ওকে এবাড়ির সবাই ভালোবাসতো, কারণ মাধবীলতা তখন এ বাড়ির সদস্য ছিল না। অতিথি বলেই হয়তো সাময়িক যত্ন করতো। গৌরীশঙ্করের মা, কাকিমা, জেঠিমারা আদর করে নাড়ু, মিষ্টি, লজেন্স হাতে দিয়ে বলতো, ভারী মিষ্টি মেয়ে। সেই মিষ্টি মেয়েটাই যখন ভাগ্যের চক্রান্তে এ বাড়ির অংশ হয়ে গেল তখন থেকেই সবাই বিরূপ হলো ওর প্রতি।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না মাধবীলতা? তোমার প্ররোচনাতেই ছেলেটা এ বাড়ির দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য নিয়ে ছেলেখেলা করার সাহস পাচ্ছে। তবে তুমিও শুনে রাখো, যদি এবাড়িতে দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার দায় কিন্তু তোমার। আমরা সবাই দোষারোপ করবো তোমায়!

কেঁপে উঠলো মাধবীলতা। আবার দোষের ভাগিদার হতে চলেছে ও। অকারণে দোষী হয়ে ওঠাটা বোধহয় ওর ভাগ্যে আছে।

মেঝের দিকেই তাকিয়ে আছে ও। নন্দিনীদেবীর দোষারোপের কোটা তখনও পূর্ণ হয়নি বলেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী। যতক্ষণ না ওকে এ ঘর ছেড়ে যেতে বলা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ও নড়তেও পারছে না।

মাধবীলতা তো সেই কবে থেকেই এ পরিবারের সদস্য ভাবে নিজেকে তাই এই অকারণ দোষারোপে তেমন কষ্ট হচ্ছে না ওর বরং এসব অপমানকে তুচ্ছ করেও একটাই চিন্তা মাথার মধ্যে আঁকিবুঁকি কাটছে, শঙ্কর কোথায় পাবে এত টাকা! শঙ্করের চোখের ভাষা পড়ার ক্ষমতা এ বাড়ির কারোর না থাকলেও মাধবীর আছে। সেই খেলনাবাটির সময় থেকেই মাধবীলতা বুঝতো ওর না বলা ভাষাদের।

যেভাবে বুঝেছিলো ওর পছন্দের খাবার, ওর প্রিয় রং, রাগ অভিমানের অভিব্যক্তিগুলো। শঙ্করকে কখনো বলতে হয়নি মুখফুটে ওর পছন্দের তালিকা, মাধু নিজেই বুঝে নিতো। ঠিক তেমনই এই মুহূর্তে শঙ্করের অসহায়ত্ব বুঝেই চিন্তা হচ্ছিল মাধবীলতার। নন্দিনীদেবীর ওকে বলা তীকষ্ন কথার জ্বালা, শঙ্করের কষ্টের কাছে কিছুই না মাধবীর কাছে। মাধবী জানে কতটা নিরুপায় হয়ে আজ শঙ্কর মায়ের সামনে এসে বলেছে, এ পুজোর ব্যয়ভার সামলান সত্যিই দুঃসাধ্য তার কাছে। গৌরীশঙ্করকে মাধবীলতার মত করে কেউ বোঝেনা। মাধবী জানে নিতান্ত অসহায় না হলে শঙ্কর কোনোদিন কোনো দায়িত্ব থেকে পিছু হটে না। সেই ছয় বছর থেকে চিনেছে মানুষটাকে তাই বেশি করে চিন্তা হচ্ছে। কি করে সামলাবে ও রায়চৌধুরী বাড়ির এই বিশাল খরচের পুজো!

নন্দিনীদেবী আরো বিরক্ত হয়ে বললেন, এমন ভাব করে দাঁড়িয়ে আছো যেন কিছুই বোঝো না! বেরও আমার চোখের সামনে থেকে। মাধবীলতা এতক্ষণ এই আদেশটার অপেক্ষাতেই ছিল। শঙ্করের কাছে যেতে হবে ওকে, সময়

নেই ওর হাতে। এমন চাপে পড়ে মানুষটা হয়তো শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে নেবে জীবনের কাছে। শঙ্করের হার সব থেকে বেশি কষ্ট দেবে মাধবীকে। ওর হার কিছুতেই মেনে নিতে পারে না মাধবীলতা।

।। ৯।।

কোমরে হাত দিয়ে ঝগড়া করছে ক্লাস টেনের মাধবীলতা। মহেশডাঙার সবাই প্রায় পরিচিত রমেশ ঘোষালের মেয়ের এই রূপের সাথে। অন্যায্য কিছু দেখলেই সে প্রতিবাদ করবেই। তাই বলে আজ যেটা করছে সেটা সত্যিই অন্যায্য। আম্পেয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই গৌরীশঙ্করকে আউট ঘোষণা করেছে। গৌরীশঙ্কর নিজেও হেলমেট, প্যাড খুলে ব্যাট অন্যের হাতে দিয়ে দিয়েছে। সেই অবস্থায় মাধবীলতা জোর তর্ক করে চলছে, শঙ্কর নাকি আউট ছিল না। ওর প্যাডে লেগেছিল বল। ওকে সবাই বোঝানোর চেষ্টা করছে। এটা পাড়ার ক্রিকেট ম্যাচ, অত সিরিয়াস কিছু নয়, তবুও কিছুতেই শোনে না মেয়ে। গৌরীশঙ্করের সাথে মাধবীলতার অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্বের কথা মহেশডাঙার সকলেই জানে। গৌরী বছরে দুবার বাড়ি ফেরে কলকাতা থেকে। যে পনেরো দিন থাকে এখানে, বেশিরভাগ সময় ওকে মাধবীর সাথে বনেবাদাড়ে ঘুরতে দেখে লোকজন। ছেলেটা ভীষণ শান্ত ভদ্র কিন্তু মাধবী হলো ডাকাত মেয়ে। তাই দুজনের যে কি করে এমন বন্ধুত্ব হলো সেটাও লোকজনের কাছে বিস্ময়।

সে সব বিস্ময়ে পাত্তা না দিয়েই বেড়ে উঠেছিলো ওদের বন্ধুত্ব। কুমারী পুজোর দিন প্রথম দেখা, তারপরে ঝগড়া খুনসুটির মধ্যে একটাই শব্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা হলো বন্ধুত্ব। গৌরীশঙ্কর কলকাতায় থাকে, মহেশডাঙায় আসে মাঝে সাজে তাতেও কমতি পড়েনি ওদের সম্পর্কের গভীরতায়।

মাধবীলতা একনাগাড়ে বলেই চলছে, আমি দেখেছি বলটা ব্যাটে নয়, প্যাডে লেগেছিল, তাই ও নট আউট।

কিছুতেই হারতে দেবে না গৌরীকে। ওর তর্কের ঝড়ে শেষ পর্যন্ত আম্পেয়ার বলেছিল, বেশ আবার তবে নামুক গৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী।

মাধবীলতা চিৎকার করে বলেছিল, হুর রে।

গৌরীশঙ্কর খুব শান্ত স্বরে বলেছিল, মাধবী প্লিজ, ঝগড়া করো না। আমি সত্যিই আউট হয়েছি। ওই গলার স্বরে মাধবী হেরে যাওয়ার যন্ত্রণা শুনেছিল, আর সেটা কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না মাধবীর। বারবার মনে হচ্ছিল, আউট হয়ে যাওয়াটা শঙ্করের কাছে হার। তাও আবার নব্বয়েই দোর গোড়ায় গিয়ে। সেদিন ও প্রথম বুঝেছিলো, শঙ্করের পরাজয়ে মাধবীর ভীষণ কষ্ট হয়, অদ্ভুত অব্যক্ত একটা কষ্ট। সেই খেলনাবাটির সময় থেকেই গৌরীশঙ্কর ওর সব থেকে কাছের বন্ধু কিন্তু সেদিন ওই খেলার মাঠে মাধবী প্রথম অনুভব করেছিল, শঙ্করের ওপরে ওর একটা অন্যরকম অধিকারবোধ আছে। শঙ্করের সব কিছুতেই যেন মাধবীর অলিখিত আধিপত্য কাজ করে। তাই ওর হেরে যাওয়াটা নিজের ব্যর্থতার মতই মনে হয়েছিল।

মুখ গোঁজ করে কাঞ্চনদীঘির সামনে বসে ছিল মাধবী। মাঠে বাকি খেলা দেখার উৎসাহ হারিয়ে চুপ করে জলের দিকে তাকিয়ে বসেছিলো ও। সাইকেলটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখেছিলো। সাইকেলটাই মাধবীর সর্বক্ষণের সঙ্গী। মা বলে মাধুর ময়ূরপঙ্খী। গৌরীশঙ্করই ওকে সাইকেল চালানো শিখিয়েছিল। সাঁতার থেকে সাইকেল মাধবীকে ওই শিখিয়েছে। যেদিন প্রথম ওর লাল রঙের সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে মাঠে নিয়ে গিয়েছিল, সেদিন গৌরীর কলকাতা ফেরার দিন ছিল। তবুও ওর সাইকেল দেখে গৌরী বলেছিল, চলো মাধবী তোমাকে আজ সাইকেল শিখিয়ে দিয়ে তবেই আমি কলকাতা ফিরবো। ক্লাস সিক্সের মাধবীলতা বেশ গম্ভীরভাবে বলেছিল, থাক থাক তোমার আর শিখিয়ে কাজ নেই। তুমি যাও শহরে। আমিই সাত বার পড়ে, হাত পা ভেঙে ঠিক শিখে নেব।

শঙ্কর মুচকি হেসে বলেছিল, শুধু রাগ করা তাই না? চলো ওঠো সাইকেলে।

মাধবীলতাকে সাইকেলের সিটে চাপিয়ে কেরিয়ার ধরে ওর পিছনে ছুটে ছুটে নিজের হাতের তালু লাল করে ফেলেছিল ও। ঘন্টা দুয়েকের আপ্রাণ চেষ্টায় অবশেষে মাধবী সাইকেলে বসে নিজেই প্যাডেল করেছিল।

গৌরীশঙ্কর আবার সেদিন বলেছিল, বলেছিলাম না, মাধবীলতাকে সাইকেল শিখিয়ে তবেই আমি কলকাতা ফিরবো।

মাধবী ওর হাতের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, এ বাবা, রক্ত জমে গেছে যে!

সেদিকে তাকিয়ে নিজের কষ্ট ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে ও বলেছিল, কিছু পেতে গেলে কিছু তো দিতেই হবে।

ক্লাস টেনের গৌরীশঙ্করের অনেক গম্ভীর কথার মানেই মাধবীর ছোট মাথায় ঢুকত না, তবে এটুকু ও বুঝতো এই মানুষটা সঙ্গে থাকলে সব সমস্যার সমাধান আছে।

সেই থেকেই ওর সব সময়ের সঙ্গী ওই সাইকেল। কাঞ্চনদীঘির সবজে আর নীল মেশানো জলের দিকে একমনে তাকিয়ে ছিল মাধবী। খেয়াল করেনি কখন নিজের চোখদুটো জলে ভরে গিয়েছিল। আচমকা ওর সাইকেলের বেলের আওয়াজে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলো, একটা কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে গৌরীশঙ্কর। মাধবী জল ভরা চোখে মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল। গৌরীশঙ্কর ওর পাশে বসে ওর হাতে কাপটা দিয়ে বলেছিল, এই নাও, ক্লাবের সভাপতি এটা তোমায় দিতে বললেন। আমি আজকের খেলায় ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছি, তারপরেও আমার হাতে কাপটা দিয়ে সভাপতি বীরেন্দ্র বাবু বললেন, এই কাপটা মাধবীলতাকেই দিও, যেভাবে ঝগড়া করে তোমাদের দলকে জেতাতে চাইছিলো, তাতে এটা ওর প্রাপ্য।

শঙ্করের ঠোঁটের মুচকি হাসিটার দিকে তাকিয়ে রেগে গিয়ে মাধবী বলেছিল, আম্পেয়ার যখন নিজেই বললো আরেকবার মাঠে নামতে ব্যাট নিয়ে, তখন তুমি কেন নামলে না, তাহলে সেঞ্চুরি হয়ে যেত তোমার।

ভারী গলায় গৌরীশঙ্কর বলেছিল, অন্যায় হতো আর মাধবী তো কখনো অন্যায়কে সাপোর্ট করে না। তাই

তোমায় হারতে দিতে চাই না বলেই মাঠে নামলাম না।

মাধবী চোখগুলো লাল করেই কাপটা হাতে নিয়ে দেখছিলো। আচমকা গৌরীশঙ্কর বলেছিল, মাধবীলতা, একটা প্রশ্নের সত্যি উত্তর দেবে? কাঞ্চনদীঘিকে সাক্ষী রেখে সত্যি করে বলতো, আমার হারে তোমার এত কষ্ট হয় কেন?

মাধবী একটু ভেবে বলেছিল, আমি কি জানি, আমার কষ্ট হয় সেটাই বুঝি, কেন হয় জানতে গেলে তো যোগেন ডাক্তারের বাড়ি যেতে হয়। সেই টেস্ট করে বলবে।

শঙ্কর ফিসফিস করে বলেছিল, মাধু তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাও, তোমায় অনেক কিছু বলার আছে। কিছু অনুভূতির সঠিক মানে বোঝানো বাকি আছে। মাধবী হাঁ করে তাকিয়ে বলেছিল, আর কিছু শিখতে পারব না বাপু। সাঁতার শিখেছি, সাইকেল শিখেছি এমন কি কঠিন অঙ্কগুলো অবধি তুমি শিখিয়ে ছেড়েছ আর ওসব মানে টানে শিখতে পারবো না, এই বলেই দিলাম। গৌরীশঙ্কর বলেছিল, এই ম্যান অফ দ্য ম্যাচের কাপটা তুমি নাও মাধু, তোমার জন্যই আমি এটা পেয়েছি।

মাধবী বলেছিল, আমার জন্য কেন পাবে! তুমি ভালো খেলেছ তাই পেয়েছো।

শঙ্কর মুচকি হেসে বলেছিল, আমার শক্তি প্রদানকারীর শক্তি ধার করেই তো আমি জিতি মাধু, তাই এটা তোমার জন্য।

মাধু বিরক্ত হয়ে বলেছিল, যবে থেকে তুমি কলকাতা গেছ তবে থেকে শক্ত শক্ত কথা বলতে শিখেছো। আমার

ভালো লাগে না।

শঙ্কর ওর একটা হাত ধরে বলেছিল, আরেকটু বড় হও মাধবীলতা তারপর দেখবে অজানা কষ্টের মানে বুঝবে, মনখারাপের কারণ চিনবে তুমি। তখনই বুঝবে শক্তির আধার কেন বলছি তোমায়! জানো মাধবীলতা, কলকাতায় প্রতিটা পরীক্ষার আগে দুশ্চিন্তার মুহূর্তে আমি তোমার মুখটা কল্পনা করি, ব্যস আমার সব দুশ্চিন্তা কেটে যায়, মনের আকাশ ঝলমল করে ওঠে।

মাধবীলতা আনমনে বলেছিল, সে তো আমি তোমার ভালো বন্ধু বলে তুমি আমায় ভালোবাসো।

শঙ্কর আলতো হেসে বলেছিল, ঠিক বলেছো ভালোবাসি।

মাধবীলতা কাপ হাতে করে সাইকেল চালিয়ে ফিরে এসেছিল বাড়ি। হয়তো গৌরীশঙ্কর ওর ফেরার পথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সেদিন বলেছিল, মাধবী পরের বার যখন দেখা হবে তখন তোমায় বোঝাবো ভালোবাসা শব্দের নিজস্ব অনুভূতিগুলোকে। কাউকে ভালোবাসলে যে উপলব্ধিগুলো হয়, সেগুলো শেখাবো তোমায়।

কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে ঊর্মি নামের একটা ভীষণ স্মার্ট আর সুন্দরী মেয়ে গৌরীশঙ্করকে প্রোপোজ করেছিল।

শঙ্কর মুচকি হেসে বলেছিল, সরি ফ্রেন্ড, আমি এনগেজড। এনগেজড সেই ক্লাস ফাইভ থেকে। ঊর্মি বলেছিল, ইস কি পাকা ছিলে তুমি, তখন থেকেই প্রেম করতে?

শঙ্কর হেসে বলেছিল, উঁহু তখন প্রেম করতাম না, ওর সাথে কেউ বন্ধুত্ব করতে এলেই রাগ করতাম। অনেক পরে বুঝলাম এই অদ্ভুত পজেসিভনেসের নাম ভালোবাসা। তবে জানো ঊর্মি ও এখনো জানে না যে ও আমায় পাগলের মত ভালোবাসে। ভাবে আমরা শুধুই আর পাঁচটা বন্ধুর মত। ঊর্মি বলেছিলো, কে সেই লাকি গার্ল?

শঙ্কর চলে যেতে যেতে বলেছিল, আগে সে বুঝুক সে আমায় ভালোবাসে, তারপর নাম বলব তার।

।। ১০।।

আমি জানি তুমি কষ্ট পাচ্ছ। মাকে পুজো করতে পারবে না কথাটা বলার সময়েও তোমার খুব কষ্ট হয়েছে।

আমি পড়েছি তোমার চোখের পাতার অব্যক্ত যন্ত্রণাদের। মাধবীর গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে হালকা স্বরে শঙ্কর বললো, মাধবী তুমিও বড় হয়ে গেলে তাই না? সব জটিলতার মানে বুঝে গেলে! সংসারের জটিলতা, মানুষের মনের অন্ধকার রূপ, আভিজাত্যের অহংকার, সব কিছু বুঝে গেলে তাই না?

মাধবীলতা, তুমি অন্তত এসবের বাইরে থাকো, যেখানে গিয়ে বসলে আমি দুদণ্ড শান্তি পাবো। তুমিও যদি জটিল হয়ে যাও, তাহলে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেব কোথায়!

মাধবী একটু ক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো চুপ করে, তারপর ছাদ থেকে নেমে এলো।

মাধবীর চলে যাওয়ার দিকে একমনে তাকিয়ে ছিল গৌরীশঙ্কর। দুশ্চিন্তার মধ্যেও এই একটা মুখ দেখলে মনখারাপি বাতাস মুহূর্তের জন্য পথ ভোলে, একমুঠো

টাটকা বাতাস এসে বলে, এখনো বেঁচে আছো তুমি, এ পৃথিবীতে এখনো একটা মানুষ আছে, যে তোমায় ভালবাসে।

কলকাতা থেকে গৌরীশঙ্কর মহেশডাঙা এসেছে মাত্র দিন তিনেক আগে। এর মধ্যেই রায়চৌধুরী পরিবারের আভ্যন্তরীণ অসন্তোষে হাঁপিয়ে উঠেছে ও। সকলের অভিযোগ ওকে ঘিরে। স্কুল, কলেজে পড়ার সময় যখন কলকাতা থেকে ছুটিতে মহেশডাঙা আসতো তখন ওর মনে হতো বাতাসে ধূপের গন্ধ, মাটিতে প্রাণের সারা। সব কিছু কেমন বদলে গেল ধীরে ধীরে। চন্দ্রশঙ্কর রায়চৌধুরী মারা যাবার পরেই এবাড়ির সেই ঠাটবাট অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। নায়েবখানার ঝাড়লণ্ঠনের আলো তখন থেকেই ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল। তবুও চন্দ্রশঙ্করের রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ নেহাত কম ছিল না। কিন্তু উমাশঙ্কর রায়চৌধুরীর বৈষয়িক বুদ্ধি তার বাবার মত না হওয়ায়, সম্পত্তির পরিমাণ কমছিলো দ্রুত। ড্রাইভার থেকে চাকর বাকরদের ভরণ পোষণ করতেই নাজেহাল হচ্ছিলেন উমাশঙ্কর। তারপরেও লোক-লৌকিকতা, পুজো-আর্চার খরচ তো ছিলই। দাদু যখন মারা যান তখন গৌরীশঙ্কর সবে মাধ্যমিক দিয়েছে। বয়েস নিতান্ত কম হলেও বুঝেছিলো, রায়চৌধুরী বাড়িতে এবারে আলোর রোশনাই কমে যাবার দিন উপস্থিত। সকলের আলোচনা শুনে এটুকু বুঝতো ওর বাবা দাদুর মত বিষয়ী মানুষ ছিলেন না। তবে বাবাকে ওর মন্দ লাগতো না। খেয়াল খুশি মত চলতে ভালোবাসতো। রক্তে আভিজাত্যের অহংকার থাকলেও

মাটিতে মেশার চেষ্টাও ছিল আপ্রাণ। আর গৌরীশঙ্কর হয়েছিল এদের সকলের থেকে আলাদা। জমিদার শব্দটাতেই ওর মারাত্মক এলার্জি ছিল। বড়মামা প্রায়ই বলতো, বুঝলি গৌরী জমিদার শব্দটার মধ্যে ঐতিহ্য নেই রে বরং শোষণ লুকিয়ে আছে। তুই যদি জমিদারদের ইতিহাস পড়িস, তাহলেই বুঝতে পারবি দান ধ্যান করা জমিদাররাও প্রজাদের শোষণ করে খাজনা আদায় করেছে কোনো এক সময়। তুই ভেবে দেখ, একশ্রেণীর মানুষ নিয়ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে একশ্রেণী তার ফল ভোগ করছে বিনা পরিশ্রমে শুধু সম্পত্তি বেশি থাকার কারণে। মামার কথাগুলো বেশ পছন্দ হয়েছিল অল্পবয়েসের আবেগপ্রবণ গৌরীশঙ্করের। তাই তো ক্লাস ইলেভেনে ভর্তির পরে যখন মাধবীলতা বলেছিল, কি গো জমিদারের ছেলে, এত ভালো রেজাল্ট করলে তারপরেও মিষ্টি খাওয়ালে না, এ কেমন বন্ধুত্ব!

গৌরীশঙ্কর বিরক্ত হয়ে বলেছিল, প্লিজ মাধবী, আমায় বন্ধু বলো বা শত্রু বলো, কখনো জমিদারের ছেলে বলো না। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয়। যবে থেকে এই শব্দটার সঠিক অর্থ বুঝতে পেরেছি, তবে থেকেই নিজেকে সাধারণ নাগরিক বলে বেশি খুশি হই, জমিদারের ছেলে বলার থেকে। মাধবীলতা হেসে বলেছিল, ওমা রাগ করছো কেন! জমিদার মানেই কি অত্যাচারী ছিল নাকি! কত জমিদার গ্রামে কুয়ো, পুকুর খনন করে দিয়েছে, স্কুল করে দিয়েছে, তারাও তো জমিদার নাকি!

গৌরী একটু স্বাভাবিক হয়ে বলেছিল, তা ঠিক। এই জন্যই তোমায় আমার এত ভালোলাগে। তুমি সব খারাপের মধ্যে থেকেও ভালো খুঁজে বের কর। মহেশডাঙায় একমাত্র তোমার সাথেই গল্প করে শান্তি পাই।

মাধবীলতা ঠোঙা থেকে আলুর চপ বের করে বলেছিল, এই নাও খাও। তোমার ভালো রেজাল্ট হয়েছে বলে আমিই খাওয়ালাম। গৌরীশঙ্কর একটু থমকে গিয়ে বলেছিল, তুমি যাকে ভালো রেজাল্ট বলে আনন্দ পাচ্ছ, সেটা আসলে ওই স্কুলের অ্যাভারেজ রেজাল্ট। মামা খুব রাগ করেছে। একেবারেই খুশি হয়নি। বলেছে উচ্চমাধ্যমিকে যদি খারাপ রেজাল্ট করি, তাহলে মহেশডাঙায় ফেরত দিয়ে যাবে।

মাধবীলতা হাততালি দিয়ে বলেছিল, খুব ভালো হবে। আবার আমি আর তুমি রোজ গল্প করতে পারবো।

মুচকি হেসে গৌরীশঙ্কর বলেছিল, কেন তোমার আর সব বন্ধুদের সাথে গল্প করে মন ভরে না বুঝি?

ওই যে পীযুষ, রিনি, পলি এরা তো চব্বিশ ঘন্টা ঘিরে থাকে তোমায়, তুমিই তো এদের দলের পাণ্ডা, আমায় আবার কি দরকার! মাধবী অবাক হয়ে বলেছিল, তুমি তো আচ্ছা বোকা ছেলে গো, মাথায় তো কিছুই নেই দেখছি। এরা তো আমার এমনি বন্ধু আর তুমি তো....

গৌরীশঙ্কর ওর কথার রেশ ধরেই বলেছিল, হ্যাঁ সেটাই তো জানতে চাইছি, আমি কি? এদের থেকে আলাদা কিছু?

মাধবী সরল গলায় বলেছিল, ওমা আলাদাই তো, তুমি তো আমার সব থেকে ভালো বন্ধু। ঝগড়া হলেও রাগ করো না, আবার ভাব করে নাও।

গৌরীশঙ্কর অন্য কিছু শোনার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ক্লাস সিক্সের মহেশডাঙার সরল মেয়েটার কাছ থেকে অন্য কিছু শুনতে পায়নি। তবে ওর অভিব্যক্তি বুঝিয়ে দিয়েছিল, এদের সকলের থেকে শঙ্করকে ও আলাদা চোখে দেখে। শঙ্কর বহুবার বলতে চেয়েছে মাধুকে, নিজের অনুভূতির কথা, ভালোবাসার কথা কিন্তু কিছুতেই বলে উঠতে পারেনি। যদি বন্ধুত্ব হারিয়ে যায়। যদি মাধবীলতা ওকে খারাপ ভেবে দূরে ঠেলে দেয়। মুখচোরা ঘরকুনো বন্ধুবিহীন শঙ্করের বড্ড ভয় করে মাধুকে হারানোর, তাই অনেক চেষ্টা করেও মাধবীকে কখনো বলে উঠতে পারেনি যে ও মাধুকে ভালোবাসে। ভালোবাসে সেই সেদিন থেকে যেদিন জিভ ভ্যাঙানোর অপরাধ মাফ করে দিয়ে, কুমারী পুজোর পুতুল পুতুল ঠাকুরটা ওর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিল। ভালো তো সেদিন থেকে বেসেছিলো, যেদিন মাটির ছোট্ট উনুনে নারকেলের মালাই চাপিয়ে পাক্কা গিন্নীর মত মাধু বলেছিল, বলো তোমার পছন্দের খাবার কি, সেগুলোই আজ আমি রাঁধবো।

ভালো তো সেদিন বেসেছিলে যেদিন, কাঞ্চনদীঘিতে ওর হাত ধরে নেমে এসে মাধু বলেছিল, আমি কিন্তু সাঁতার জানিনা, শুধু তুমি সাঁতার জানো তাই ডুবে যাবার ভয় বাদ দিয়ে নেমেই পড়লাম। মাধবীর চোখে শঙ্করের

জন্য আবেগ দেখেছিলো, বিশ্বাস দেখেছিলো, অধিকারবোধ দেখেছিলো, তাই তো মাধবীলতা নামক মেয়েটাকে বড্ড কাছের মনে হয় ওর। মনে হয় মাধু যেন ওরই শরীরের একটা অংশ। কিন্তু মাধুটা যে কেন বড্ড ছোট! কিছুতেই বড় হয় না, আর কিছুতেই বোঝে না গৌরীশঙ্করের এই অন্যরকম অনুভূতিগুলোর কথা।

গৌরীশঙ্কর আরেকটু সাহস করে বলেছিল, মাধবী তুমি কাকে বিয়ে করবে?

মাধবী বিরক্ত হয়ে বলেছিল, আমি বিয়ে থা করবো না বাপু। বিয়ে করলেই মায়ের মত অনেক কাজ করতে হবে। আমি বিয়ে করবো না। তবে যদি কখনো বিয়ে করি, তাহলে যে আমার থেকেও চড়চড় করে গাছে উঠতে পারে, তেমন ছেলেকেই করবো। গৌরীশঙ্কর গাছে উঠতে পারে না। তাই উঁচু গাছ থেকে কিছু পেড়ে দিতেও পারে না মাধুকে। সে আক্ষেপ মাধু অনেকবার করেছে।

বার দুই উঁচু কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বলেছিল, তাহলে বরং তুমি আমাদের মালিকাকাকেই বিয়ে কর! ও সুপারি গাছেও উঠতে পারে। কথাটা মাধুর মনে ধরেছিল। পরদিন ভোরে উঠেই বাগানে ঘুরতে ঘুরতে শঙ্কর শুনেছিল, মালিকাকা নিজের মনে হাসছে আর বলছে, এক্কেবারে পাগলী মেয়ে আমাদের মাধবীলতা। বলে কিনা, মালিকাকা আমি তোমাকেই বিয়ে করবো।

শঙ্করের ভীষণ রাগ হয়েছিল। বিকেলে মাধু কাঞ্চনদীঘির ধারে বসে আছে দেখেও, ও যায়নি। মাধু

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মুখ কালো করে চলে গিয়েছিল। নিজেও চোখ ছলছল করে দূরে থেকে মাধুর চলে যাওয়া দেখেছিলো শঙ্কর। এমন অভিমান মাধুর ওপরে ওর অনেকবার হয়েছে। তারপর আবার কি করে যেন সব ভুলে গিয়ে মাধুর সব থেকে ভাল বন্ধু হয়ে গেছে ও।

আজও এই দোটানায়, অর্থনৈতিক সংকটের মুহূর্তে একমাত্র মাধবীলতাই এসেছিল ওর হাতে হাত রাখতে।

কিন্তু কিছু কষ্ট থাকে যেগুলোকে কারোর কাছেই বলা যায় না। পুরুষ মানুষ হয়ে নিজের অসহায়ত্বের কথা কি করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলবে! কি করে বলবে মাসের শেষে তার হাতে সেদিন বাজারের টাকাটুকুই অবশিষ্ট থাকে। জমিদার বংশের সন্তান হয়ে কেরানির চাকরি করে জীবন কাটাচ্ছে, এতেই নাকি রায়চৌধুরী বাড়ির অপমান। কেউ বুঝতেই পারছে না কলকাতার মত শহরে, একটা ছোট মাথা গোঁজার মত ফ্ল্যাট কিনে দিন কাটানোটাও কতটা কঠিন। এ বাড়ির সকলে ভাবে ও বোধহয় মস্ত বড় চাকরি করে, ইচ্ছে করেই নিজের টাকা পয়সা জমাচ্ছে ব্যাংকে। গৌরীশঙ্কর নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এবারে মায়ের কাছে বলেছিল, দুর্গা পুজো করার বিশাল ব্যয় ভার সে সামলাতে পারবে না। তাতেই এ বাড়ির সকলে এক বাক্যে তাকে কুপুত্র আখ্যা দিয়েছে।

ক্যালকুলেটর আর নিজের সেভিংস খুলে আতিপাতি করে খুঁজছে গৌরী, কোথা থেকে কতটা লোন নেওয়া যেতে পারে। অলরেডি কলকাতার ফ্ল্যাটের লোনটা রানিং,

এমন কোনো সম্পত্তি নেই যেটা দেখিয়ে এক চান্সে পাবে অনেকগুলো টাকা। নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে অকারণেই এলোমেলো করছিল চুলগুলো। কোনো উপায় বের করতে পারছিলো না গৌরীশঙ্কর। নিজেই মনে মনে ভাবছিলো, পুরুষের অনেক কিছুতেই বারণ থাকে। তাদের চোখের জলে থাকে নিষেধাজ্ঞা, যখন তখন তার অবাধ্য হওয়া মানা। একমাত্র রাতের অন্ধকারে নোনতা জলে বালিশ ভেজানো ছাড়া, কেউ যেন তার অস্তিত্ব বুঝতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হয় পুরুষদের। পুরুষদের বলতে নেই, আমি অপারগ, আমার পকেটে টাকা নেই। নেই শব্দটা বললেই সকলে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকে, তাদের দৃষ্টিতে থাকে ভর্ৎসনা। তারা বুঝিয়ে দিতে চায়, তুমি নামেই পুরুষ, আসলে তুমি ভীষণ বেকার। চাহিদার সাথে জোগান দিতে না পারলেই তুমি সংসারের এক কোণের অবহেলিত বাসিন্দা হয়ে যাবে নিমেষে। গৌরীশঙ্করের অবস্থাও এখন বিষ্ণুকাকার বলা নায়েবখানার দেওয়ালে সদ্য গজিয়ে ওঠা বটগাছটার মত। যে দেওয়ালটা ভাঙার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে তার পৌরুষত্ব প্রমাণের আশায় কিন্তু পুরোনো বাড়ির মজবুত ভিতে তেমন দখল জমাতে পারছে না। ও নিজেও নিজেকে সক্ষম রোজগেরে পুরুষ প্রমাণের চেষ্টায় মাথা খুঁড়ে মরছে, ক্লান্ত হচ্ছে ওর চিন্তা ভাবনারা, রক্তাক্ত হচ্ছে ওর ব্যর্থ চেষ্টারা, তবুও এ বাড়ির রাজকীয় দুর্গাপুজোর খরচ সামলাতে পারছে না কিছুতেই। একটা ঘন কালো ব্যর্থতা ক্রমশ গ্রাস করছে ওকে। একটু একটু করে এগিয়ে

আসছে ঘন কালো রংটা। কালো রংটা এতটাই তীব্র, যে আর সব রঙকে ঢেকে দিতে চাইছে সে খুব দ্রুত।

।। ১১।।

ঘন কালোর ওপরে লালের ছোপ ছোপ চুড়িদারটা পরে সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে আসছে মাধবীলতা। ক্লাস টুয়েলভের মাধবীলতা একটু যেন অন্যরকম। দামাল কিন্তু খরস্রোতা নয়, বাঁকের ধারে একটু থামে কখনো বা। এক মাথা ঘন কালো চুল শাসন না মেনেই কোমর ছাপিয়েছে, বড় বড় দুটো চোখে কৌতূহলী চাহনি, উজ্জ্বল গায়ের রঙে আকর্ষণীয়। সদ্য যৌবনে পা রাখা মাধবীর শরীরেও ঘটেছে পরিবর্তন। সেই রোগা পাতলা মেয়েটা আর নেই। উদ্ধত স্তনে আর কোমরের ভাঁজে সে এখন পরিপূর্ণ নারী। সরল হাসিতে এক টুকরো লজ্জা মিশেছে। তার শাসন না মানা অবাধ্য চুলের গোছা যখন অকারণেই মাধবীর কপালে, মুখে চুম্বন করে.. তখন জগৎ ভুলে হাঁ করে গৌরীশঙ্কর তাকিয়ে থাকে তার বাল্যসখীর দিকে।

কি হলো চুপ করে আছো কেন! সামনেই আমার উচ্চমাধ্যমিক, এখনও আমি জিওগ্রাফি প্র্যাকটিক্যাল কমপ্লিট করতে পারিনি, সেটা শুনেও তুমি চুপ করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছো! আরে কিছু হেল্প করবে কিনা বলো!

তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে আসার জন্যই হয়তো অথবা উত্তেজনায় মাধবীর নাকের ডগায় হীরক বিন্দুর মত ঘামের ফোঁটা জমেছিল। সেদিকে একমনে তাকিয়ে ছিল গৌরীশঙ্কর। দ্রুত কথা বলায় মাধবী একটু জোরেই শ্বাস

নিচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে ও বললো, বুঝলাম তোমার বিশাল প্রবলেম। কিন্তু আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, আমি এ ব্যাপারে তোমায় কি সাহায্য করবো?

মাধু বেশ অবাক হয়ে তাকালো, যেন খুব গর্হিত কথা উচ্চারণ করে ফেলেছে গৌরীশঙ্কর। তারপর ওর নিজস্ব ভঙ্গিমায় কোমরে হাত দিয়ে বললো, ওহ, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট। তাই তুমি জিওগ্রাফির কিছুই জানো না। তুমি তো কলকাতাবাসী তাই তোমার সাঁতার না জানার কথা, গাছে উঠতে না পারার কথা....

গৌরী ওর পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুন জানে, যে মাধু কিছু অযৌক্তিক যুক্তি দিয়ে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেবে যে শঙ্কর নিতান্তই ভুলভাল কথা বলছে। আজও সেদিকেই এগোচ্ছে মাধু।

তাহলে বলো, কলকাতায় থেকেও তুমি কি করে এগুলো শিখলে?

গৌরী নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছানোর আশায় বললো, আরে এগুলো তো আমি অনেক চেষ্টা করে শিখেছি। সাঁতার শিখেছিলাম কারণ তোমায় কথা দিয়ে গিয়েছিলাম—কাঞ্চনদীঘির জল থেকে পদ্ম তুলে দেব তাই। আর তুমিই শর্ত দিয়েছিলে, যে তোমার থেকেও তাড়াতাড়ি গাছে উঠতে পারবে, তাকেই নাকি তুমি বিয়ে করবে। তাই বাধ্য হয়ে নিজের হাঁটুর অর্ধেক মাংস গাছের কাণ্ডকে প্রদান করে, মালিকাকাকে ঘুষ খাইয়ে তারপর শিখেছিলাম গাছে ওঠা।

মাধবীলতার লালচে ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা, তবুও জোর করে হাসিটাকে শাসন করে রাগী গলায় বলল, এইটাই তো আমি বলতে চাইছিলাম। এগুলো যেমন কষ্ট করে শিখেছো আমার জন্য, তেমন জিওগ্রাফি প্র্যাকটিক্যালের লাইটট্রেস আর ম্যাপপয়েন্টিং দুটোই তাড়াতাড়ি শিখে নাও। তোমার হাতে মাত্র দুদিন টাইম।

আমাদের ক্লাসের অরুণাংশু ভীষণ ভালো প্র্যাকটিক্যাল করে, আমাকেও হেল্প করতে এসেছিল। আমিই রাজি হইনি। ভাবলাম আগে তোমায় বলি, তুমি তো দিন সাতেকের জন্য এসেছো এবারে। যদি তুমি একান্ত না পারো, তাহলে না হয়....মাধবীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ওর প্র্যাকটিক্যাল খাতা আর পেন্সিলবক্সটা হাতে নিয়ে গৌরীশঙ্কর বেশ দাপটের সাথে বলেছিল, আমিই করে দেব। আর শোনো স্কুলে গিয়ে পড়াশোনাটা মন দিয়ে কর, এত বন্ধু জোটানোর কি আছে!

মাধবীলতা সেই ছোটবেলার ভঙ্গিতেই মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, আর তুমি যে দুবছরের নাম করে সারাজীবনের জন্য কলকাতা চলে গেলে, তার কি হলো!

গৌরীশঙ্কর নিজের দিকে দড়ি টেনে বলেছিল, বাবা, মা, তুমি, মহেশডাঙা, ছেড়ে ওখানে থাকতে বুঝি আমার ভালো লাগে? কিন্তু কি করবো? পড়াশোনার জন্যই তো বাধ্য হয়ে থাকতে হয়। আমার মনখারাপের কষ্ট, তুমি আর কি করে বুঝবে!

মাধবীলতা সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে ওর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলেছিল, তা অবশ্য সত্যি। দাদু মারা যাবার

পরে রায়চৌধুরী বাড়িটাও যেন কেমন একটা হয়ে গেল। আর যেতে ভালোই লাগে না। তারপর জানো শঙ্কর, তোমার কাকিমা সেদিন আমায় ডেকে বলেছিল, শোন মাধবী তুই এখন বড় হয়েছিস, বিয়ের যোগ্য হয়েছিস, এখন আর ধেই ধেই করে শঙ্করের সাথে ঘুরবি না।

বোঝো কাণ্ড, বড় হয়েছি বলেই নাকি তোমার সাথে ঘুরতে পারবো না! আমিও বললাম, এ কেমন কথা কাকিমা, শঙ্কর আমার সব থেকে ভালো বন্ধু, বড় হলে কি বন্ধু পাল্টে যায়! তুমিই বলো শঙ্কর, আমি কি অন্যায্য কিছু বললাম? তুমি তো আমার সব থেকে কাছের মানুষ, সব থেকে কাছের সঙ্গী।

মাধবীর মেয়েলি হাতের নরম মুঠোর মধ্যে শঙ্করের পুরুষালী হাতটা মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠছিল। মাধবীর মুখে "কাছের মানুষ" কথাটা বহুবার শুনেছে গৌরীশঙ্কর, কখনো এমন অনুভূতি হয়নি। এ যেন অন্যরকম বলা, অন্যরকম প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল শঙ্কর। মাধবীলতা আর সেই ছোট মেয়েটি নেই। তার পুতুল পুতুল রান্নাঘর এখন বড় সড় সংসার গড়তে পারে!

বসন্তের মিঠে হাওয়ায় মাধবীকে নতুন করে ভালোবেসেছিলো শঙ্কর। এ ভালোবাসা বাল্যসখীকে নয়, এ ভালোবাসা কিশোরের খেলার সাথীকে নয়, এ ভালোবাসা শুধু মাত্র একজন পরিপূর্ণ নারীকে বাসতে পারে একজন পুরুষ। ছেলে থেকে পুরুষ হয়ে ওঠার সন্ধিক্ষণে গৌরীশঙ্কর বুঝেছিলো, মাধবীলতা ছাড়া তার জীবন ব্যর্থ। ওকে ছাড়া আকাশের বিশালতাও শূন্যতায়

পরিণত হবে। কিন্তু সমস্যা তো একটাই, মাধবীলতা কিছুতেই এই ভালোবাসা শব্দের সঠিক মানে বোঝে না।

যা রাগী মেয়ে, এখন যদি শঙ্কর ওকে ভালোবাসা শব্দের প্রকৃত অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করে তাহলে হয়তো ভুল বুঝে ওকে ছেড়ে চলেই যাবে। তার থেকে বরং মাধুর কাছের মানুষ, ভালো বন্ধু, এই সম্পর্কগুলোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকুক ওর একনিষ্ঠ প্রেম।

মাধু তখন শঙ্করের দৃষ্টির ব্যকুলতাকে অগ্রাহ্য করেই হাতের ঠাকুর মূর্তিটির দিকে মনোনিবেশ করানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলছে।

দেখো না শঙ্কর, আমার মুখের দিকে নয়, এই ঠাকুরকে দেখো। আমি কুমোরকাকার সাথে মাটি মেখে ঠাকুর গড়লাম। কুমোরকাকা বললো, আমি নাকি বড় হয়ে শিল্পী হবো। দেখো এটা হলো লক্ষ্মীঠাকুর। রোজ স্কুল থেকে ফিরে আমি কুমোরকাকার কাছে যাবো, কাকা আমাকে আরো অনেক কিছু শেখাবে বলেছে। ছাঁচের ঠাকুর গড়ার থেকেও শক্ত হলো নিজের ভাবনা থেকে সৃষ্টি করা। দেখো না শঙ্কর! তুমি যে কেন আমার মুখের দিকে অমন বোকার মত তাকিয়ে থাকো কে জানে! কলকাতা গিয়ে তোমার মাথাটা পুরো গেছে। নিজস্ব ঢঙে বক বক করছিল মাধবী।

শঙ্কর লজ্জা পেয়ে বলেছিল, বাহ, দারুণ গড়েছ তো! সেদিনও ওকে বলা হয়ে ওঠেনি, কেন শঙ্কর মৃন্ময়ীর নিখুঁত মুখের দিকে মনোনিবেশ না করে চিন্ময়ী মাধবীর দিকেই তাকিয়ে থাকে অপলক। মাধবীলতাকে দেখে দেখেও আশ মেটে না ওর। একে ঠিক কি বলে! নেশা,

ঘোর নাকি ভালোবাসা! জানে না শঙ্কর। শুধু জানে মাধবীর সবটার ওপরে শুধুই ওর অধিকার। ওর কপালে দুই ভ্রুর মধ্যের অহংকারী টিপ থেকে শুরু করে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের অবশিষ্ট নেলপলিশে পর্যন্ত ওর আধিপত্য থাকবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে এক বন্ধুকে বলেছিল, ওর আর মাধবীলতার সম্পর্কের কথা। বন্ধুটি সবটা শুনে বলেছিল, পারলে এখনই বোঝা ওকে, না হলে কিন্তু এই মেয়ে কোনদিন তোকে বিয়ের পিঁড়ি ধরার নিমন্ত্রণ করবে। বন্ধুর মুখে "প্রোপোজ করে ফেল" শুনেই ওর হৃৎপিণ্ড থেমে গিয়েছিল। কলকাতার ছেলেরা ঠিক বুঝবেই না মহেশডাঙার ক্লাস টুয়েলভের মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু আচমকা প্রেম নিবেদন করা যায় না। মাধুর বন্ধুদের তো অর্ধেকের বিয়ে হয়ে গেল। নেহাত মাধবী একটু ডাকাবুকো আর রমেশ ঘোষাল তেমন সংসারী নয়, বলেই তার মেয়ে লোকলজ্জার মাথা খেয়ে সাইকেল নিয়ে কোয়েড স্কুলে যাচ্ছে। মাধবীলতা ছাড়াও বোধহয় আরও গোটা দশেক মেয়ে পড়ে ওই ক্লাসে। মহেশডাঙার মানুষদের সোজা হিসেব, মেয়েকে নাম সই করতে শেখাও, আসন বুনতে শেখাও, রান্নাবান্না শিখিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দাও। পড়াশোনা, স্কুল, কলেজ এসব তো মোটেই নয়।

রায়চৌধুরী বাড়ির মেয়ে হয়েও গৌরীশঙ্করের দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে মাধ্যমিক পাশের পরেই।

গৌরীশঙ্করের কলেজের মেয়েদের পোশাক আর কথাবার্তা শুনলে, গোটা মহেশডাঙার মানুষ যে এক দিনে হার্টফেল করবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমনিতেই গৌরীশঙ্করের পোশাক-আশাক কথা বলার ধরন, চুলের কাটিং দেখে ওর পরিবারের অনেকেই বলেছেন, উমাশঙ্কর তার ছেলেটাকে মানুষ করতে কলকাতায় পাঠিয়েছিল কিন্তু ছেলেটা লায়েক হয়ে ফিরল। জমিদার বাড়ির মান ডোবালো। এ বাড়ির ছেলে নাকি লোহালক্কড় নিয়ে পড়ে চাকরি করবে। এ লজ্জার কথা রায়চৌধুরী বাড়ির আনাচে কানাচে আলোচনা হয়, তা ও নিজেও জানে। বিষ্ণুকাকা একদিন কাঁচুমাচু মুখ করে এসে বলেছিল, দাদাবাবু, তুমি আর পুরুতমশাইয়ের মেয়ের সাথে দীঘির পাড়ে বসে থেকো না গো, লোকে পাঁচকথা বলে। পুরুতমশাই নিরীহ ব্রাহ্মণ, তাই মুখফুটে কিছু বলতে পারেন না, কিন্তু মেয়েটারও তো বিয়ে দিতে হবে নাকি! বিষ্ণুকাকার দিকে অবাক বিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল গৌরীশঙ্কর। মাধবীলতার সাইকেল চালানো, কোয়েড স্কুলে পড়া, মাঝদুপুরে দীঘিতে সাঁতার কাটা, বকবক করা নিয়ে যদি ওর কোনো প্রবলেম না থাকে, তাহলে বিয়ের সমস্যা কোথায়?

বিয়েটা তো গৌরীশঙ্কর করবে মাধবীলতাকে। সেটা নিয়ে বিষ্ণুকাকার বা বিন্দুপিসির কিসের সমস্যা সেটাই মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছিল ও। অনেক ভেবে কারণটা বের করেছিল, গ্রামের অর্ধশিক্ষিত লোকজন এখনও

মেয়েদের অন্যের মনমর্জির পুতুল মনে করে বলেই এইসব প্রবলেম খুঁজে বের করছে।

সেদিন সন্ধেতে মহেশডাঙায় রায়চৌধুরী বাড়িতে নিজের ঘরে বসে মাধবীর প্র্যাকটিক্যাল খাতাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মহেশডাঙা স্কুলে জিওগ্রাফি সদ্য চালু হয়েছে। এই স্কুলের হেডস্যার খুবই দায়িত্ববান মানুষ। শহরের অফিসে ধর্না দিয়ে দিয়ে স্কুলের জন্য অনেক কিছুই স্যাংশন করিয়েছেন। বায়োলজি প্র্যাকটিক্যালের ইন্সট্রুমেন্ট থেকে শুরু করে স্পোর্টসের সরঞ্জাম পর্যন্ত। কিন্তু আসল সমস্যা হলো এই গ্রামের মানুষজন নিজেরাই চায় না শিক্ষিত হতে। এরা এখনো মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কৃতির মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। অথচ গ্রামটা কিন্তু বেশ বর্ধিষ্ণু, মানসিকতাটাই যা থমকে আছে পুরোনো দিনে।

মাধবীর পয়েন্টিং পেন্সিলটা নিয়ে ম্যাপটা আঁকছিলো শঙ্কর। সেইসময় বিন্দুপিসি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললো, সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদাবাবু! তুমি তাড়াতাড়ি চলো মাধবীদিদির বাড়িতে।

।। ১২।।

গয়নাগাটি ওর সামান্যই আছে, সেগুলো বের করে হিসেব করতে বসলো মাধবী। এগুলো দিয়ে কি এবারের মত পুজোটা করা যাবে! যদি যায় তাহলে শঙ্করের দুঃশ্চিন্তাটা একটু কমে। অফিসের ছুটিও তো মোটে পাঁচদিন। তার দিন তিনেক অলরেডি শেষ হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত পুজো হবে কি হবে না তার সুরাহা করতে

পারেনি গৌরীশঙ্কর। আজ বিকেলে লুকিয়ে গয়নাগুলো নিয়ে একবার স্যাকরার বাড়িতে হানা দিতে হবে। তবে লোক জানাজানি হলে কিছুতেই চলবে না। রায়চৌধুরী বাড়ির বউ গায়ের গয়না বেচতে স্যাকরা বাড়ি গেছে জানলে, এ বাড়ির লোকজন মাধবীকে হয়তো গুমঘরে গুম করেই দেবে। তবে এমনভাবে ভেঙে পড়তে গৌরীশঙ্করকে কখনো দেখেনি মাধবীলতা। বরং সমস্ত কঠিন পরিস্থিতিতেই ওকে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়াতে দেখেছে। সেই কোন ছোটবেলা থেকেই মাধবী দেখেছে, যে কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করে শঙ্কর। সেই মানুষটাকে যখন ভেঙে পড়তে দেখে তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না সমস্যার শিকড় অনেকটা গভীরে প্রবেশ করেছে। মাধবীর সব বিপদে গৌরীশঙ্করকে ও পাশে পেয়েছে বন্ধুর মত, আজ যদি ওর বিপদে মাধবী পাশে না থাকতে পারে, তবে কিসের বন্ধুত্বের অঙ্গীকার নিয়েছিল কাঞ্চনদীঘির ধারে? সেদিনও তো ভেঙেই পড়েছিলো মাধবীলতা। যেদিন স্কুল থেকে ফিরে, খেয়েদেয়ে নিজের পড়া নিয়ে বসেছিলো, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটেছিল ঘটনাটা। পরীক্ষার খুব বেশি দেরি নেই, টেস্ট হয়ে গেছে। শঙ্কর বলেছিল, এটা নাকি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সময়, এ সময় যদি মাধবী ফাঁকি দেয় তাহলে এতদিনের পরিশ্রম বিফলে যাবে। ও নাকি শহরের কোনো কলেজে চান্সই পাবে না। মাধবীলতারও ইচ্ছে ছিল শহরের কলেজে পড়তে যাবে শঙ্করের মত। এতদিন শঙ্করের চোখ দিয়ে ও কলকাতা দেখেছে, কল্পনায় এঁকেছে ওই শহরকে। আর মাঝে মধ্যে

টিভির সাদাকালো স্ক্রিনে রং ধরার চেষ্টা করেছে। এবারে ভালো রেজাল্ট হলে মাধবীলতাও শঙ্করের মতই পড়তে যাবে শহরে। পৃথিবীটা নাকি অনেক বড়। শুধু মহেশডাঙা, পাটুলি, বেলতলা নয় আরও অনেক বড়। এমন কি মহেশডাঙার কাছের মফঃস্বল শহর কাটোয়ার থেকেও অনেক বড়। যদিও বাবার সাথে মাত্র বার দুয়েক কাটোয়ার গিয়েছিল মাধবী। কি সুন্দর সাজানো শহর, মাধবী হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছিলো ওখানের চলনবলন। তখন থেকেই ওর ইচ্ছে মহেশডাঙার বাইরের পৃথিবীটাকে দুচোখ ভরে দেখবে। শঙ্কর যে কলেজে পড়ে সেটাও খুব দেখার ইচ্ছে মাধবীলতার। সব ইচ্ছেপূরণের চাবিকাঠি নাকি লুকিয়ে আছে ওর উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টের ভিতরেই, শঙ্করের মুখে শুনে শুনে এমনই ধারণা হয়েছিল ওর। তাই তো পাড়ার সবার কটূক্তি সহ্য করেও পড়াশোনাটা মন দিয়ে চালিয়ে গেছে ও। কিন্তু যজমানদের বাড়ি থেকে বাবার যা আয় হয়, তাতে গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করতে পারলেও শহরে গিয়ে থাকার খরচ যে জুটবে না, সে ও ভালোই জানতো। শঙ্কর বলেছিল, আর একটা বছর সময় দাও, আমি তো চাকরি করবোই, তখন তোমার পড়ার খরচ আমিই চালাতে পারবো। স্বপ্নের কাজলটা নিখুঁত করে মাধবীর চোখে শঙ্করই পরিয়ে দিয়েছিল। সেই স্বপ্নীল দিনের আশায় মন দিয়ে পড়ছিল মাধবীলতা। তখনই পাশের বাড়ির কাকিমা চিৎকার করে ডাকছিল মাধবীকে।

ছুটে বাইরে বেরিয়েই দেখলো, মা মাটিতে পড়ে আছে। কি করবে বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো।

কাকিমা বললো, তোর মাকে সাপে কামড়েছে মাধু, বাবাকে খবর দে। হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে।

বাবা মহেশডাঙার বাইরেও পুজো করতে যেত, তাই বাবা কোথায় গেছে তা মাধু জানতো না। ওর তখন একটাই মুখ মনে পড়েছিলো, তাই ছুটে গিয়ে বিন্দুপিসিকে বলেছিল, শিগগির ওপরে গিয়ে শঙ্করকে বলো, আমি ডেকেছি, মাকে সাপে কামড়েছে।

পাড়ার লোক জড়ো হচ্ছিল। সকলেই মতামত দিচ্ছিল। বাড়ির পিছনের পুকুর পাড়ে নাকি গোখরো দেখেছে লোকজন কদিন আগেই। গৌরীশঙ্কর একটা রিক্সা নিয়েই এসেছিল। মাধবীলতা আর গৌরীশঙ্কর দুজনে মাধুর মাকে নিয়ে ছুটেছিলো পাটুলীর হাসপাতালে। যখন পৌঁছেছিল, তখন ডক্টররা জানিয়ে দিয়েছিল মাধুর মা আর জীবিত নেই।

অবাক লেগেছিল মাধবীর। স্কুল থেকে ফেরার পর মা ভাত, তরকারি বেড়ে দিলো, গল্প করতে করতে মাধু খাওয়া দাওয়া শেষ করলো। মা বাসন দুটো নিয়ে পুকুরে গেল মেজে আনতে, এখন ডাক্তারবাবু বলছেন, মা নেই!

এটা হয় নাকি!

গৌরীশঙ্কর মাধবীলতার হাতটা চেপে ধরে বলেছিল, মাধু শোন এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। দুর্ঘটনা এমন আচমকাই আসে। কি হলো, তুমি শুনেছ মাধবী! এমন স্থির হয়ে কেন দাঁড়িয়ে আছো? এই মাধু?

মাধবীকে জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে কথাগুলো বলছিলো গৌরীশঙ্কর। তবুও মাধবী স্থির হয়ে তাকিয়েছিল মায়ের

নিষ্প্রাণ শরীরের দিকে।

অপঘাতে মৃত্যু বলেই মাত্র তিনদিনে মায়ের স্মৃতিকে দূর করতে হয়েছিল মাধবীলতাকে। বাবাও কেমন যেন চুপ চাপ হয়ে গিয়েছিল মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর।

গৌরীশঙ্কর মাধবীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তোমাকে কিন্তু বাঁচতে হবে। ভালো করে পরীক্ষা দিতে হবে। আবার আগের মত হাসতে হবে, আমার পুরনো মাধবীকে ফেরত চাই। গৌরীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে প্রথম বার হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলো মাধবীলতা। ওর শরীরের কম্পনে আরো শক্ত করে আগলে ধরেছিল শঙ্কর। ফিসফিস করে বলেছিল, আমি তো আছি তোমার পাশে। আর মাত্র মাস খানেক পরে পরীক্ষা, মন দাও পড়ায় মাধু, আমার কথা ভেবে মন দাও।

কি ছিল সেদিন শঙ্করের কথায় মাধবী জানে না, তবে দিন দশেক পরে আবার নিজের বইখাতাগুলো ধুলো ঝেড়ে পড়তে বসেছিলো। উচ্চমাধ্যমিক পাশও করেছিল ভালোভাবেই। কিন্তু মায়ের অবর্তমানে ওদের ছোট্ট সংসারটা বড্ড এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। পলকা হাওয়ায় ভেঙে গিয়েছিল ওদের এক চিলতে গোছানো সংসারটা। বাবাও দিনশেষে ঘরের কোণে মনমরা হয়ে বসে থাকতো। রেজাল্টটা হাতে নিয়ে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে ধীর গলায় মাধবী বলেছিল, বাবা আমি কি কাটোয়া কলেজে ভর্তি হতে পারি? বি.এ পাশ করতে চাই। বাবা বেশ কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ রে মা, পাড়ার

সবাই বলছিলো বটে তোর বিয়ে দিতে হবে। এমনকি রায়চৌধুরী বাড়ির গিন্নীরাও সেদিন ডেকে বললো, বামুনঠাকুর এবারে মেয়েটার সদ্গতি করুন। আপনি একা মানুষ, পুজোআচ্চা করে বেড়ান। যজমানের বাড়িতেই দুটো খেয়ে নেন কিন্তু মেয়েটা বড় হয়েছে, একা একা বাড়িতে থাকে, দিনকাল ভালো নয়। বুঝলি মাধু ওরা ঠিকই বললো। বাবা হিসাবে এবারে আমারও উচিত তোর বিয়ে দেওয়া।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাধু। বাবাকে ছেড়ে এই অবস্থায় ওর বিয়ে হয়ে যাবে! ও এই বাড়ি, মহেশডাঙা ছেড়ে কোথায় যাবে!

ভাবনাগুলো এলোমেলো জট পাকিয়ে যাচ্ছিল ওর তিনদিন না আঁচড়ানো চুলের মত করে। কিছুতেই ছাড়াতে পারছিল না জটগুলো। এলোমেলো প্রশ্নগুলো মনের দরজায় এসে উঁকি মেরে বলে যাচ্ছিল, পড়াশোনাটাও হলো না তোমার মাধবীলতা!

পাড়ার লোকে বলছে, রমেশ ঘোষালের মেয়েটা এখন ঢেউহীন শান্ত নদী হয়ে গেছে। বাড়ির উঠানে পড়ে আছে ওর প্রিয় সাইকেল, চালাতেও ইচ্ছে করে না ইদানিং। স্কুলের হেডস্যার এসেছিলেন বাবাকে বোঝাতে। মেয়ের ভালো রেজাল্ট হয়েছে, ওকে কলেজে ভর্তি করে দিন, আমি সাহায্য করব। বাবা স্যারের হাতদুটো ধরে কাকুতি মিনতি করে বলছে, একটা ভালো পাত্র দেখে দিন, মেয়েটাকে পার করি। স্যার মাধবীর মাথায় হাত বুলিয়ে ফিরে গেছেন।

পাড়ার সবাই বলছে, এতদিনে নাকি মাধবীলতা বিয়ে দেবার যোগ্য হয়ে উঠেছে। আর গুন্ডাগিরি নেই, সাইকেল নিয়ে ঘোরা নেই, এমনকি কাঞ্চনদীঘির জলে সাঁতরে মাতানোও নেই। এই হলো বিয়ে দেবার সঠিক সময়।

মাধবীলতা মনে মনে তখন একজনকেই খুঁজছিল, সেটা হলো ওর সব থেকে কাছের মানুষ গৌরীশঙ্করকে। কিন্তু গত পরশু বিন্দুপিসিকে জিজ্ঞেস করলে সে বলেছিল, ছোটদাদাবাবু তো এখন খুব ব্যস্ত। কলকাতায় নাকি তার মস্ত পরীক্ষা চলছে, এই কমাস তো বাড়িও আসবে না। মা ঠাকরুন বলছিলেন, ওনার দাদা নাকি চিঠিতে বলেছেন, এটাই গৌরীর সব থেকে বড় পরীক্ষা। বিন্দুপিসি হনহন করে চলে গিয়েছিল।

একলা মনে বসে থাকতে থাকতেই শুনতে পেয়েছিল বাবার গলার স্বর। বহুদিন পরে বাবার এমন স্বতঃস্ফূর্ত গলা শুনে, কৌতূহলের বশেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিল মাধবীলতা। তখনই দেখেছিলো, বাবা একজন বয়স্ক মানুষের হাত ধরে বিগলিত গলায় বলছে, এতো আমার পরম সৌভাগ্য বিনায়কবাবু। আপনাদের মত সম্ভ্রান্ত ঘরে আমার মেয়ের বিয়ে হবে, এ কখনো কল্পনাই করতে পারিনি। এ তো মাধুর সৌভাগ্য।

তাকে বাইরের চেয়ারে বসিয়েই মাধুকে ডেকেছিল বাবা। মাধবীও যন্ত্রচালিত পুতুলের মত বাবার ডাকে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। অপরিচিত ভদ্রলোক একমুখ হেসে বলেছিলেন, রমেশ ঘোষালের মেয়ে বলেই এক কথায় আমার ভাইপোর সাথে বিয়ে দিতে রাজি হলাম।

তোমার বাবা আমাদের বাড়ির পুরোনো পরিচিত মানুষ। এমন সজ্জন মানুষের মেয়ে কি কখনো খারাপ হতে পারে!

মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে পুরোহিত মশাই। তবুও ভাইপো একবার এসে দেখে যাক। আজকালকার ছেলে তো, তার অমতে কিছুই হবার নয়। বাবা মাধবীকে চা করতে পাঠিয়েছিল। রান্নাঘরে ঢুকতেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি ওকে গ্রাস করে নিচ্ছিলো। কিছু যেন হারিয়ে যাচ্ছে ওর। খুব কাছের পরিচিত কিছু একটা হারিয়ে ফেলার অনুভূতি ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। মায়ের হঠাৎ মৃত্যুর কষ্টকে ছাপিয়ে একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল বুকের বাম দিকে। যন্ত্রণার কারণটা খুঁজতে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল মাধবীলতা। কয়েকদিনের মধ্যেই ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বাবাই বিধান দিয়েছিল, মায়ের কোনো একটা পরলৌকিক কাজ সেরে ফেলেই ওর বিয়েটা দেওয়া সম্ভব। লাল টুকটুকে একটা বেনারসী কেনা হয়েছিল। ছোট পিসিই মা মরা মেয়ের বিয়ের ভার নিয়েছিল।

যেদিন মাধবীলতাকে পাত্র দেখতে এসেছিল, সেদিন ও অবাক চোখে তাকিয়েছিল অপরিচিত ওই মানুষটার দিকে। এই মানুষটাকে তো ও চেনেও না, তাহলে এর সাথে বন্ধুত্ব করবে কি করে! বারবার চোখ ভিজে যাচ্ছিলো ওর। চোখের সামনে একটাই মুখ বারবার ভেসে উঠছিল। এলোমেলো কত কথা, কত প্রতিশ্রুতি, ছেলেবেলার খেলাঘরের বর বউ সাজা, তার সংসারের গৃহিণী হয়ে ধুলো বালি রান্না করার স্মৃতি চোখের সামনে ভাসছিল

মাধবীর। আনমনা হয়েই শুনেছিল বিয়ের পাকা তারিখ। উদাস চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলো, এই পনেরো দিনের মধ্যেও কি সে ফিরবে না মহেশডাঙা? শঙ্কর ওর কলকাতার ঠিকানাও লিখে দিয়েছিল মাধবীর কোনো একটা খাতার পাতায়। যদিও মাধবী এসে বলেছিল, কি করবো তোমার ঠিকানা নিয়ে? আমি কি একা একা কলকাতা যাবো নাকি!

শঙ্কর অস্ফুট গলায় বলেছিল, যদি কখনো চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে, তাহলে লিখ।

মাধবী আরও জোরে হেসে বলেছিল, প্রেমপত্র? আমাদের স্কুলের আশীষ দিয়েছে দেবিকাকে, দেবী টেনে একটা থাপ্পড় মেরেছে জানো তো। কিন্তু তুমি তো আমার বন্ধু, তোমায় কেন চিঠি লিখতে যাবো!

শঙ্কর বলেছিল, বন্ধুদের বুঝি খোঁজ নিতে নেই? চিঠি লিখতে নেই বুঝি? মাধবীলতা মুচকি হেসে বলেছিলো, কি লিখবো চিঠিতে? বিষ্ণুকাকা কাদায় আছাড় খেয়েছে! নাকি তোমার মেজ কাকিমা গদাধরকে এক ধামা মুড়ি দান করেছে! এগুলো লিখবো চিঠিতে?

শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বড় বড় পা ফেলে চলে গিয়েছিল। মাধবীলতা চেঁচিয়ে বলেছিল, বেশ লিখবো চিঠি কোনো একদিন। গোটা রাস্তাটা ভাবতে ভাবতে ফিরে ছিল মাধবী, চিঠিতে কি লেখা যায় শঙ্করকে? শঙ্কর তো মাধবীর সবটুকু চেনে, হয়তো ওর নিজের থেকেও একটু বেশিই চেনে। ওর মনখারাপ, ওর খুশি এগুলো বোধহয় মাধবীর থেকেও

শঙ্কর বুঝতে পারে বেশি দ্রুত। ওর প্রতিটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বোঝা মানুষটাকে চিঠিতে কি লেখা যায় কে জানে!

।। ১৩।।

কাকে চিঠি লিখছ কর্তাবাবু? আমি কি তাহলে পাল বাড়িতে খবর দেব? আমাদের বাড়ির ঠাকুর যিনি গড়েছেন বরাবর তিনি তো দেহ রেখেছেন! তার ছেলের বড় বেশি দেমাক। পারিশ্রমিকও নেয় বেশি। তবুও মা ঠাকরুন চান, ওই পাল বাড়ি থেকেই রায়চৌধুরী বাড়ির ঠাকুর আসুক। অন্যমনস্ক হয়ে গৌরীশঙ্কর বললো, চিঠি নয় বিষ্ণুকাকা এটাকে বলে অ্যাপ্লিকেশন। অফিসে আর সাতদিন ছুটি বাড়ানোর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছি। এ গ্রামের নেটের যা অবস্থা তাতে তিনদিন ধরে চেষ্টা করেও মেল পাঠাতে পারলাম না। তাই অ্যাপ্লিকেশনই ভরসা। আমার বস আবার একটু সনাতনী ধারায় বিশ্বাসী, ফোনে ছুটি চাইলে প্রথমেই নট করে দেবেন, তাই চেষ্টা চালাচ্ছি। দক্ষিণের মাঠে তো কাশ ফুলের মেলা, পুজোর ঘন্টা তো বেজেই গেল, মায়ের আদেশও মাথার ওপরে অথচ এদিকে কোনো ব্যবস্থাই করে উঠতে পারলাম না। দাঁড়াও দাঁড়াও এখুনি পাল বাড়িতে ছুটো না, আগে টাকার জোগাড় করি তারপর দেখছি। বিষ্ণুকাকার মুখে শরতের রোদ অপসৃত হয়ে বর্ষার কালো মেঘের অনাগোনাকে উপেক্ষা করেই নিজের কাজে মন দিলো গৌরীশঙ্কর।

বিষ্ণুচরণের মুখের চামড়ায় বার্ধক্য ভাঁজের আধিক্য। সেদিকে আরেকবার তাকাতেই মনে পড়ে গেলো, মাধবীলতা একবার একটা বয়স্ক মানুষের মুখ এঁকেছিলো

ওর খাতায়। নেহাতই মজার ছলে। ছবিটার নিচে লিখে দিয়েছিল, শঙ্কর যখন বুড়ো হবে।

ছবিটা বহুদিন পর্যন্ত ছিল ওর ফাইলে। মাধবীলতা সত্যিই বড় ভালো এঁকেছিলো। আচ্ছা, মাধবী আর আঁকে না কেন! মাধবী তো অনেক কিছুই পারতো কিন্তু বিয়ের পর এসব আর করেনা কেন? জিজ্ঞেস করতে হবে ওকে। অ্যাপ্লিকেশনটা খামে ভরতে ভরতে মনে পড়লো ওর জীবনের প্রথম পাওয়া চিঠিটার কথা।

মামার বড় ছেলের বিয়ের পর গৌরীশঙ্কর ইচ্ছে করেই কলেজের হোস্টেলে শিফট করেছিল। মামা অবশ্য বলেছিল, বাড়িতে কি ঘরের অভাব আছে নাকি? তোকে কেন শিফট করতে হবে?

কিন্তু মামিমার দু একটা কথায় ও বুঝেছিলো, নতুন অতিথি এসে ওকে হয়তো সহজভাবে নেবে না। তাই নিজেই বলেছিল, কলেজ হোস্টেলে থাকলে পড়াশোনার সুবিধা হয়, তাই...

মামাও রিটায়ার্ড ম্যান, অল্প বয়েসের সেই দম্ভ নিষ্প্রভ প্রায়। দুই ছেলেই প্রতিষ্ঠিত। মামার অমতেই বড়ছেলের বিয়ে হয়। তারপর মামা নিজের মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। তাই শঙ্করের প্রস্তাবে নিমরাজি হয়ে গিয়েছিল। তবে সকলের আড়ালে শঙ্করকে বলেছিল, আমি প্রতি মাসে তোকে টাকা পাঠাবো, কাউকে বলবি না।

নিজের হোস্টেলের অ্যাড্রেসটা মাধবীকে দিয়ে ও বলেছিল, চিঠি লিখো।

সে মেয়ে চিঠিতে কি লিখবে সেটাই নাকি খুঁজে পায়নি। তাই হোস্টেলে থাকা কালীন চারবছরে একটাও চিঠি এসে পৌঁছায়নি ওর ঠিকানায়। ফাইনাল এক্সামের শেষ দিনে হোস্টেলে ঢুকতেই, সবাই ওকে দেখে মুচকি মুচকি হাসছিল। ব্যাপারটা ও কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। শেষে হোস্টেল সুপার বিশ্বজিৎদা এসে বেশ গম্ভীর গলায় বলল, তোমার লাভারকে বলো, পরেরবার থেকে যেন এনভেলপের মুখ ভালো করে আঠা দিয়ে আটকে দেয়। আমি না পড়লেও তোমার রুমমেটরা অনেকেই তোমার চিঠি পড়েছে।

শঙ্কর আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতেই হাতটা পেতেছিলো। ওর লাভার! কে সে? কলেজের কোনো বিচ্ছু মেয়ে বদমাইসি করে নি তো!

চিঠিটা হাতে নিয়েই নামটা দেখে বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা আচমকা লাফিয়ে উঠেছিলো গৌরীশঙ্করের। লাবডুব শব্দটা ওর কানের কাছেই অনুরণিত হচ্ছিল যেন।

মাধবীলতার চিঠি! এ যে কল্পনার অতীত!

তবে কি মাধবী বড় হয়ে গেল!

একগুচ্ছ অচেনা অনুভূতিকে বুকের বামপাশে শান্ত করে, কাঁপা হাতে চিঠিটা খুলেছিল গৌরীশঙ্কর। কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ও।

এটা মাধবীলতা কি করলো! কেন জানালো না ওকে। এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে একবারও কি জানানোর প্রয়োজন ছিল না তার? এতটুকু অধিকারও নেই

শঙ্করের ওর ওপরে! কষ্টে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল দ্রুতগামী হৃৎপিণ্ডের সব রক্তবাহী শিরা উপশিরারা।

থমকে গিয়েছিল ওর চলতি জীবনের বাতাস, মুহূর্তে ভারী হয়ে এসেছিল ওর নিঃশ্বাস। আরেকবার ঝাপসা হয়ে যাওয়া চিঠিটা পড়লো ও, বাঁ হাতের তালু দিয়ে মুছে নিলো চোখের জল।

মাধবী লিখেছে, শঙ্কর, বাবা আমার বিয়ের ঠিক করেছে। সামনের মাসের প্রথমেই আমার বিয়ে। তুমি একবার বলেছিলে, আমার বিয়েতে নাকি তুমি কব্জি ডুবিয়ে খাবে। তাই নিমন্ত্রণের কার্ড হয়তো তোমাকে পাঠাতাম কিন্তু শেষপর্যন্ত পাঠাতে পারলাম না। এসময় তোমাকে খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শুনলাম তোমার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে, তাই তুমি আসবে না এখন। তবে জানো শঙ্কর, যবে থেকে আমার বিয়ের কথা হয়েছে আর পাত্রপক্ষ আমায় দেখতে এসেছে, তবে থেকে আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের অস্থিরতা কাজ করছে। মনে হচ্ছে এটা ঠিক হচ্ছে না। শেষ মুহূর্তে ট্রেন ফেল করার মত একটা অদ্ভুত অনুভূতি, আমিও জানি না কেন হচ্ছে।

তাই ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিলাম আমি ঘর ছাড়বো। কোথায় যাবো জানি না। বিয়ে হলেও তো ঘর ছাড়তাম, না হয় বিয়ের আগেই ছাড়লাম। হয়তো তুমি যখন এ চিঠি পাবে তখন আমি মহেশডাঙা থেকে অনেক দূরে। জানি বাবার অপমান হবে গ্রামে। কিন্তু আমার বারবার মনে হচ্ছে খুব উঁচু জায়গা থেকে আমায় কেউ ঠেলে ফেলে

দিচ্ছে, তাই বাধ্য হয়েই বিয়েটা ভেস্তে দিলাম। বাড়িতে থাকলে সবাই মিলে আমায় বিয়ে করতে বাধ্য করবে। তাই নিরুদ্দেশ হলাম। শঙ্কর, তুমি যখন মহেশডাঙা আসবে তখন দেখো, কাঞ্চনদীঘির ধারে ওই গাছের তলায় আমরা যে কাঠের ঘর বানিয়েছিলাম ওটা যেন ভেঙে না যায়। ওটাই আমার আসল সংসার। আমি ঐ সংসারেই থাকতে চেয়েছিলাম। চললাম তোমায় ছেড়ে, মহেশডাঙা ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে। আর হয়তো দেখা হবে না কোনদিন, ভালো থেকো আমার সব চেয়ে কাছের সঙ্গী।

স্থবির হয়ে দাঁড়িয়েছিল শঙ্কর। গোটা শরীর অবশ হয়ে আসছিল ওর। মাধবীলতা বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কিছুই জানে না। জানে না এখন যুবতী মেয়েদের জন্য কি ধরনের ভয়ঙ্কর বিপদ ওঁত পেতে বসে আছে! কোথায় যাবে মেয়েটা একা একা! ভয়ে শিউরে উঠেছিলো শঙ্কর। হয়তো জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে নিজেকে শেষ করে দেবার সিদ্ধান্তই নিয়ে নিলো মাধবী! আর ভাবতে পারছে না ও।

চিঠির ভাষা আর এমন সিদ্ধান্ত দেখে বেশ বুঝতে পারছিল শঙ্কর, মাধবীলতা বড় হয়ে গেছে। মায়ের আকস্মিক মৃত্যুই ওকে বড় করে দিয়েছে।

কাল কলেজে যেতে হবে, পরশুর আগে পৌঁছাবে না মহেশডাঙা। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে কলকাতায় দুটো দিন কাটিয়েছিল শঙ্কর।

মহেশডাঙায় যখন পৌঁছেছিল তখন বিন্দুপিসির প্রথম কথাই ছিল, তোমার বন্ধু ওই মাধবীলতার কাণ্ড শুনেছ?

মা বলেছিল, ওসব চরিত্রহীন মেয়ের কথায় কি কাজ বিন্দু!

পাড়ার মেয়ে, একসাথে ছোট থেকে বড় হয়েছিল, খেলেছে ধুলেছে তারমানেই কি সমতুল্য হয়ে গেল? ছেলেটা সবে বাড়ি ঢুকলো, তুই আর ওসব নোংরা কথা নিয়ে আলোচনা করিস না দেখি।

যা শঙ্কর, বাবা নায়েবখানায় বসে আছে, একটু আগেই বলছিলো, তোর কথা। এ গ্রামে নাকি টেলিফোন আসবে। কি সব কাগজে সই করতে হবে। তুই গিয়ে কথা বল, আমি তোর খাবার পাঠাচ্ছি। আনমনা হয়ে নায়েবখানার দিকে হাঁটছিল গৌরীশঙ্কর। টানা বারান্দা দিয়ে দেখতে পেলো কাঞ্চনদীঘির একটা প্রান্ত। মনটা হু হু করে উঠলো। ওখানে গেলেও আর দেখতে পাবে না মাধবীকে, এই অনুভূতিটাই যন্ত্রণা দিচ্ছিল ওকে।

সত্যি ঘটনাটা জানার জন্য একবার অন্তত ওদের বাড়ি যেতেই হবে।

বাবার ঘরে ঢুকতেই বাবা হাসি মুখে বললো, তুই চলে এসেছিস, খুব ভালো হলো। বেশ কয়েকটা কাজ আছে। এসব ইংরেজী কাগজপত্রগুলো এসেছে আমাদের বাড়ির ঠিকানায়, দেখ তো এগুলো কি!

আর শোন, পঞ্চায়েত থেকে প্রতি বাড়িতে বলে যাচ্ছে যে গ্রামে নাকি টেলিফোন আসছে। যে যে টেলিফোনের লাইন নেবে তাদের দরখাস্ত জমা দিতে হবে। তোর মা তো শুনেই উতলা হয়ে উঠলো। বললো, টেলিফোন এলে রোজ তোর সাথে কথা বলতে পারবে।

মা বাবার সাথে কোনোদিনই খুব সহজ হতে পারেনি গৌরী। হয়তো আভিজাত্যের মোড়ক সহজ সম্পর্ক গড়তেই দেয়নি। বন্ধুরা নাকি মাকে জড়িয়ে ধরে, মায়ের কোলে মাথা দিয়ে ঘুমায়, মায়ের আঁচলে মুখ মোছে আর গৌরী মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সময় ছাড়া মায়ের ছোঁয়াও পায় না। তাই মায়ের এ হেন উদ্বেগ শুনে ভালোই লাগছিলো ওর। বাবার কাছ থেকে চিঠির গোছাটা নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল ও। মাঝপথেই ওর রাজকীয় খাবারের থালা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল বিন্দুপিসি। ইশারায় বিন্দুপিসিকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়েছিল গৌরীশঙ্কর।

বিন্দুপিসিও উদগ্রীব হয়েছিল ওকে মাধবীর খবরটা দেবে বলে! শঙ্কর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলতে শুরু করলো, আর বল কেন গো দাদাবাবু, সেকি ঘটনা। লজ্জার কথা আর কি বলি! মেয়েটাকে সেই এতটুকু বয়েস থেকে কোলে নিচ্ছি, চোখের সামনে বড় হয়ে উঠলো তোমার সাথেই। তার যে পেটে পেটে এমন ছিল একটুও টের পায়নি কেউ।

মা মরা বাপটার মুখ ডোবাতে লজ্জা করলো না রে তোর।

শঙ্কর বুঝতে পারছিল ওর ধৈর্য্যের পরীক্ষা চলছে। বিন্দুপিসি এত সহজে আসল ঘটনা বলবে না। ভূমিকা, গৌরচন্দ্রিকা না করে এগোবে না। শঙ্করের মন যতই উতলা হোক মাধবীর খবর জানার জন্য, আপাতত ওকে

অপেক্ষা করতেই হবে। তবুও বললো, বিন্দুপিসি, মাধবীর কি হয়েছে!

বিন্দুপিসি এদিক ওদিক তাকিয়ে মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে চাপা স্বরে বললো, পালিয়েছে। বেনারসী অবধি কেনা হয়ে গিয়েছিলো। বলতে গেলে আশীর্বাদ অবধি করে গেছে ছেলের জেঠু। ভালো ঘর, ভালো বর তারপরেও কার সাথে যেন ভেগেছে। গোটা মহেশডাঙা তোলপাড় করেও তাকে পাওয়া যায়নি। পাত্রপক্ষ এসে রমেশ ঘোষালকে কি অপমানটাই না করে গেল। বেচারা মুখ কালো করে সব সহ্য করলো। তবে আমি বলি কি, মেয়েদের অত লেখাপড়া শেখানোর দরকার কি ছিল! ছেলেদের মত সাইকেল নিয়ে দিনরাত টংটং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখন রমেশ ঘোষাল মাথা ঠুকলে আর হবে কি! তাও তো এ গ্রামের লোকজন ভালো বলতে হবে, তাই পুরুত ঠাকুরকে দিয়েই গৃহলক্ষীর পুজো করাচ্ছে।

শঙ্কর অবশ শরীরে ভাঙা স্বরে বললো, কার সাথে পালিয়েছে বিন্দুপিসি!

বিন্দুপিসি মুখ বেঁকিয়ে বললো, কার সাথে সেটা তো কেউ জানে না গো। মহেশডাঙার কোনো ছেলে যে নয় সেটুকু জানি। তবে কোন পাড়ার ছেলে বলতে পারবো না। শুধু তিনি লম্বা চিঠিতে নাকি বলে গেছেন, আমায় খুঁজে লাভ নেই, আমি ফিরবো না। এ বিয়ে আমি করতে পারবো না, এ সংসার আমার জন্য নয়।

বোঝো! তার নাকি অন্য সংসারও আছে!

গলা দিয়ে লুচি, তরকারি, মোহনভোগ নামছিল না গৌরীশঙ্করের। বিন্দুপিসি আরও কি সব বলছিলো সেসব কানেও প্রবেশ করছিল না ওর।

মাধবীলতা তাহলে অন্য কাউকে ভালোবাসতো! ঐজন্যই কি শঙ্করকে কাছের মানুষ, ভালো বন্ধু বললেও কখনো প্রেমিক বলে স্বীকৃতি দিতে পারেনি? ওর গোটা মন জুড়ে তবে এতদিন অন্য কারোর বাস ছিল। শঙ্করের এত বছরের স্বপ্নগুলো তারমানে দিবা স্বপ্নের মতো মিথ্যে ছিল! কেন বললো না মাধবী ওকে! ভালো বন্ধুকে তো সব শেয়ার করা যায়, তাহলে! এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল ভাবনাগুলো।

বিন্দুপিসি চলে গেছে। শঙ্কর হাঁটতে হাঁটতে ওদের অতিপরিচিত পাটকাঠি আর কাঠ দিয়ে বানানো ছোট্ট সংসারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওই তো মাধবীর পাতা মাটির উনুন। সেই কবে পেতেছিলো এ সংসার সেটা আর স্পষ্ট মনে নেই শঙ্করের। তবে এই ঘরটা যে মাধবীর বিশেষ পছন্দের ছিল তা বেশ বোঝা যায়। বড় বয়েসেও এর যত্ন করতো। মাধবীর ছোট্ট পুতুল খেলার ঘরের উঠোনে পড়েছিলো কিছু শুকনো পাতা, কাঠি। গৌরী সেগুলোকে যত্ন করে ফেলে দিলো। হু হু করে উঠলো বুকের ভিতরটা। আর এ পথ দিয়ে যাবে না কখনো ও। হাজার হাজার স্মৃতির ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ওর।

রমেশকাকার বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে মাধু বলেই ডেকে উঠতে যাচ্ছিল আগের মত। প্রিয় নামটাকে অতি কষ্টে

গলার মধ্যে আটকে রেখে, ডাকলো রমেশকাকার নাম ধরে।

কয়েকদিনেই রমেশকাকার চেহারা ভেঙে গেছে। মানসিক আর শারীরিক অত্যাচার স্পষ্ট হয়েছে চেহারায়।

ওকে দেখে আলতো করে বললো, মাধবী মরে গেছে গৌরী। তোমার ছেলেবেলার খেলার সাথী মরে গেছে, আর এসো না এদিকে। আমি তার কোনো খোঁজ জানি না।

অবশ পায়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল গৌরীশঙ্কর।

একটু একটু করে ভুলতে চেষ্টা করেছিল ওরই শরীরের একটা অঙ্গকে। মাধবীলতা ফুলের যে গাছটা মালিকাকা বসিয়েছিলো ওদের গেটের সামনে তাতে গোলাপি আর লালের মিশ্রণে ফুল ধরত। আগে কখনো গাছটার দিকে নজর পড়েনি, ইদানিং পড়ে। গাছ ভরে উঠেছে ফুলের ভারে, হয়তো মাধবীর ভালোবাসার সাজানো সংসারও ভরে উঠেছে এমনই সৌরভে।

গৌরীশঙ্কর চাকরি পেয়েছে কলকাতায়। বড়মামা হার্টের অসুখে মারা গেছে গতবছর। রায়চৌধুরী বাড়ির জমি জমা ভেস্টের মামলা চলছে সরকারের সাথে। উমাশঙ্কর নিজেকে চন্দ্রশঙ্করের যোগ্য সন্তান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না করতে পেরে ইদানিং মদ্যপান শুরু করেছে। জীবনের গতি এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে। আগের মত সুখকর নয় গৌরীশঙ্করের জীবন। তবুও চলছে টালমাটাল ভাবে। বাবার ইচ্ছে ছিল রায়চৌধুরী পরিবারের শেষ বংশধর এসে এ পরিবারের দায়িত্বভার বুঝে নিক। তার বদলে গৌরীর পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় থাকতে চাওয়ার বাসনায় বেশ

আঘাত পেয়েছেন উমাশঙ্কর রায়চৌধুরী। সেটা তার ব্যবহারে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে গৌরীশঙ্কর। দাদুর মৃত্যুর পরেই এ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। গৌরীশঙ্করের এক কাকাও নিজের ভাগের জমি বেচে শহরে চলে গেছে। আরেক কাকার বিষয় সম্পত্তিতে অনীহা। উমাশঙ্করের একার পক্ষে সব দিক খেয়াল রাখা সম্ভব হচ্ছিল না বলেই ডাক পড়েছিলো গৌরীশঙ্করের। কিন্তু সবার আশায় জল ঢেলে দিয়ে এ বাড়ির শেষ বংশধর চাকুরে হয়ে চলে গেল কলকাতা। কালে ভদ্রে সে আসে মহেশডাঙায়। মহেশডাঙার বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নাকি তার কষ্ট হয়।

।। ১৪ ।।

কি হলো মাঠাকরুন, কষ্ট হচ্ছে তোমার? নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? এমন করছো কেন, জল খাবে?

বিন্দু জলের গ্লাসটা সামনে ধরেছে নন্দিনীদেবীর। নন্দিনীদেবী জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আর বাঁচতে মন চায় না বিন্দু। বুকে যন্ত্রণা হয় সময় সময়। তোদের বড় কর্তাবাবু তো ওপরে গিয়ে বেঁচেছেন, আমায় রেখে গেলেন এসব অন্যায্য অনাচার দেখার জন্য! নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে নন্দিনীদেবীর। বয়েস যে খুব বেশি, তা নয়। তবুও নয় নয় করে পঁয়ষট্টি তো হলো। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সেই কবেই। নাতি নাতনীরাও বড় হয়ে গেল। গৌরীশঙ্কর তো ওদের শেষ বয়সের সন্তান। তাই ওকে নিয়েই আশা ভরসা ছিল সব থেকে বেশি। ও যে এভাবে এ বংশের মুখে চুনকালি মাখাবে কে জানতো!

বিন্দু একটু অবাক হয়েই দেখছিল মা ঠাকরুনকে, ঝড় ঝাপটাতেও স্থির থেকেছেন তিনি, এমন কি জটিল পরামর্শও করতে দেখেছেন কর্তার সাথে। বড় পরিবারের মেয়ে আর সুন্দরী ছিলেন বলে অহংকারও নেহাত কম ছিল না এককালে! সেই মানুষটাই আজ বিন্দুর মত অতি নগণ্য মানুষের কাছে নিজের আক্ষেপের কথা বলছেন!

বিন্দুর জীবনের শখ আহ্লাদও এই মানুষটাই একসময় নিষ্ঠুর হাতে কেড়ে নিয়েছিলেন। ভালোবাসার মানুষটিকে ওর থেকে দূরে করে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র ওকে নিজের দাসী করে রাখবেন বলে। মুখে বলেছিলেন, কলঙ্ক ডেকে অনিস না বিন্দু! এ বাড়ির আশ্রয় হারাবি।

মনে মনে একটু হাসলো বিন্দু। কাজের মেয়ে ড্রাইভারের সাথে পালালে হয়তো রায়চৌধুরী বাড়ির গায়ে তেমন কলঙ্কের দাগ লাগতো না, কিন্তু শঙ্কর যেটা করলো তাতে তো গোটা পরিবারের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিলো। বড়কর্তাবাবু তো পরিবারের অতিহ্য নষ্ট হয়েছে বলেই মনকষ্টে চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। বছর তিনেক আগেই এ বাড়ির মুখে কালি ঢেলে দিয়েছে এবাড়ির একমাত্র বংশধর।

নন্দিনীদেবী আবার বললেন, অভিশাপ, অভিশাপ লাগলো এ বাড়ির ওপরে। তাই ওই নষ্ট চরিত্রের মেয়েটা এবাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

তা বিন্দু, সে মেয়ে এখন কি করছে রে!

বিন্দু ফিসফিস করে বললো, এই তো দশ মিনিট আগে দেখলাম, সেজেগুজে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। গাড়ি

ছাড়াই হনহন করে বেরোলো।

নন্দিনীদেবী মুখ বেঁকিয়ে বললো, কোথায় কোন কালীমন্দিরের বিয়েকে নাকি মেনে নিতে হবে আমায়! লজ্জা লজ্জা সবই আমার কপাল। ওই মেয়ে কি ঘরে থাকার মেয়ে নাকি! ও তো চরেই বেড়াবে। শঙ্করের টাকা-পয়সা ধ্বংস করবে আর বেহায়ার মত ঘুরে বেড়াবে! আর আমার ছেলেটাও হয়েছে তেমনি। ওই মেয়ের মধ্যে যে কি রূপের মহিমা দেখলো কে জানে! কলকাতায় থেকেও এই মেয়ের প্রতি মোহ গেল না। দিনরাত ওই নষ্ট মেয়েটার পিছন পিছন ঘুরছে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ওই মেয়ের মুখের দিকে। বুঝলি বিন্দু, বশ করেছে। ওসব মেয়েরা সব পারে। তোদের বড়কর্তা বাবু তো বলেই ছিল ওই মেয়ে যেন এবাড়ির চৌকাঠ না পেরোয়। তিনবছর আগেই তো বিয়ে করেছিল গৌরী, শুধু তোদের কর্তাবাবুর জেদে ওই মেয়েকে নিয়ে ঢুকতে পারেনি গৌরী। যেমনি বাবা মারা গেল অমনি ওই নষ্ট মেয়েটাকে নিয়েই এ বাড়ির চৌকাঠ পেরোলো ও। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, বাবা কবে মারা যাবে। নিজের পেটের ছেলেও পর হয়ে যায়! একমনে মনের সব রাগ দুঃখ উগরে দিচ্ছেন নন্দিনীদেবী। মাঝে মাঝে দেওয়ালে টাঙানো উমাশঙ্করের বিরাট ছবির দিকে তাকিয়ে বলছেন, তুমি পুণ্যবান, তাই নিজের জেদ নিয়ে স্বর্গে গেলে। আর আমি অভাগী বলেই এসব অন্যায় দেখতে হচ্ছে আমায়। এর থেকে অন্ধ হলেও ভালো হতো। আক্ষেপের সুরে কথা বলতে বলতেই গলার স্বরটা সরু করে নন্দিনীদেবী বললেন,

খোঁজ নে বিন্দু ওই মেয়ে কোথায় যায়! বাবা তো ঢুকতেই দেয়নি শুনলাম বাড়িতে। তাহলে যায় কোথায়! বেরোলেই পিছন পিছন হাঁটিবি। একবার যদি হাতে নাতে ধরতে পারিস, তাহলে শঙ্করের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব, ওই মেয়ের চরিত্র কেমন! যে মেয়ে বিয়ের আগে নিরুদ্দেশ হয় আবার এত বছর পরে আরেকজনকে বিয়ে করে, তার স্বভাব জানতে আর কারোর বাকি নেই বুঝলি!

রহস্যের গন্ধ পেয়েই বিন্দু নড়েচড়ে বসেছিলো। বিখ্যাত বাড়ির কেচ্ছার কথা জানতে সবারই মন চায়। তাছাড়া ওই আবাগীর ওপরে বিন্দুর একটু হিংসেও আছে। পুরুতের ঘরের মেয়ে কিনা রায়চৌধুরী বাড়িতে বউ হয়ে এলো? তাও অমন কাণ্ড ঘটিয়ে! মাঝের চারবছর যে সে কোথায় ছিল, তার হদিস কেউ জানে না! তারপর বছর আড়াই তিন আগে আচমকা খবর পাওয়া গেলো, ছোটদাদাবাবু নাকি কোন কালীমন্দিরে গিয়ে ওই মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে। বড়কর্তা তো কিছুতেই মেনে নেয়নি এই বিয়ে। বড়কর্তা বেঁচে থাকতে তো ওই মেয়ে এবাড়িতে ঢোকার সাহসও পায়নি। এখন নেহাত মাঠাকরুন অসহায় বিধবা মানুষ, তাই ছেলের খোঁজ করতে ওই মেয়েও এসে ঢুকেছে এ বাড়িতে।

আবার বিন্দুকে বলে কিনা, আমি তো এ বাড়ির সদস্য বিন্দুপিসি, এ বাড়ির অতিথি নয়। আমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে চিন্তা করো না। বাড়ির বউ সকলকে খাইয়েই খাবো। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। মরণ হয় না, অমন

বউয়ের। ছোটদাদাবাবুকে ভালোমানুষ পেয়ে মাথাটা মুড়িয়ে খেয়েছে গো।

বুঝলেন মা ঠাকরুণ, আমার তো মনে হয় ওই মেয়ের আবার কারোর সাথে আশনাই চলছে। আমি খুঁজে বের করবোই।

ঘরের পাশ দিয়ে পেরোনোর সময় মা আর বিন্দুপিসির কথা শুনে একটু থমকে দাঁড়ালো গৌরীশঙ্কর। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পায়ে পায়ে উঠোনের দিকে এগোলো ও। এরা মাধবীলতার সম্পর্কে এতটা খারাপ ভাবে! এতদিন গৌরী মনে করতো মাধবীলতা ওদের বাড়ির পুরোহিতের মেয়ে বলেই হয়তো বিয়েতে আপত্তি ছিল বাবা মায়ের। আজ যা শুনলো তাতে বেশ বুঝতে পারছে এরা মাধবীকে নোংরা চরিত্রের ভাবে। নোংরা শব্দটা বড্ড বেমানান মাধবীলতা নামটার সাথে। মাধবী যেন বহমান নদীর স্রোত। কোনো আবর্জনাই জমতে পারে না ওর মনে।

পুরোনো কিছু ঘটনা আজও চোখের সামনে ভাসে গৌরীশঙ্করের।

মাধবীলতা মহেশডাঙা ছাড়ার পরে আচমকাই এই গ্রামটা ওর কাছে বড্ড শূন্য হয়ে গিয়েছিলো। তাই কলকাতা থেকে গ্রামে ফেরার তাগিদটাও হারিয়েছিল।

।। ১৫ ।।

মাধবীলতা গ্রাম ছেড়েছে প্রায় বছর চারেক হলো।

গৌরীশঙ্কর চাকরি করছে বছর তিন-চার। রায়চৌধুরী পরিবারের বেশিরভাগ সম্পত্তি চোখের সামনে দিয়ে সরকার অধিগ্রহণ করে নিচ্ছে। এসব দেখেই উমাশঙ্কর

অসহায়, নিরুপায় হয়ে রাগে-আক্রোশে মদ্যপান শুরু করেছিল বেশি বয়েসে। শেষ পর্যন্ত নেশা বাবাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিচ্ছিলো। সাথে মারাত্মক রাগ জন্মেছিল গৌরীশঙ্করের ওপরে। উমাশঙ্করবাবুর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, গৌরীশঙ্কর একটু চেষ্টা করলেই জমিগুলোকে নিজেদের করে রাখতে পারতো। কিন্তু শিক্ষিত ছেলে হয়েও নিজের বংশের জন্য কিছুই করলো না গৌরী। এই আক্ষেপ থেকেই উমাশঙ্করের শরীর ভাঙতে শুরু করেছিল। নন্দিনীদেবীও তখন স্বামীর পক্ষ নিয়েই দোষারোপ করতে শুরু করেছিল গৌরীশঙ্করকে। বাধ্য হয়ে কাটোয়ার সেটেলমেন্ট অফিসে ছুটোছুটি শুরু করেছিল ও। অফিস সামলে কলকাতা থেকে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করতে হচ্ছিল কাটোয়ার অফিসে। সেদিনও হাফ অফিস করে ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরে কাটোয়ায় পৌঁছেছিল বিকেল তিনটে নাগাদ। হন্তদন্ত হয়ে স্টেশন থেকে নেমে ছুটেছিলো উকিলের বাড়ি। ওদের এসব জমি-জায়গা সংক্রান্ত বিষয়গুলো যিনি দেখছিলেন, তার কাছেই যাচ্ছিল গৌরী। সেই সময় সজোরে ধাক্কা লেগেছিল অত্যন্ত পরিচিত একটা গন্ধের সঙ্গে। ভীষণ চেনা এই গন্ধটা। না, কোনো বিশেষ পারফিউমের নয় অথবা কোন প্রিয় ফুলেরও নয়, তবুও বুনো বুনো মাদকতা মেশানো গন্ধটা ওর চেনা।

তাকিয়ে দেখেছিলো একটা অত্যন্ত সাদামাটা তাঁতের শাড়ি পরে, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছে ওর ভীষণ পরিচিত গন্ধের উৎসটি। পা দুটো অবশ হয়ে

গিয়েছিল। ধাক্কা খেয়ে অপর দিকের মানুষটিও চোখ তুলে তাকিয়ে বলেছিল, দেখে চলতে পারেন না?

মুহূর্তে তার চোখের দৃষ্টি থমকে গিয়েছিল। অস্ফুটে বলেছিল, শঙ্কর তুমি!

নিরাভরণ দুটো হাত আর দুই সিঁথির মাঝের সাদাটে অংশের দিকে তাকিয়ে শঙ্কর আচমকা বলে ফেলেছিলো, বিয়ে করো নি তুমি! তাহলে মহেশডাঙা থেকে পালিয়ে এলে কেন!

থরথর করে কাঁপছিল মাধবীলতার হালকা গোলাপি ঠোঁটদুটো। অনেক কষ্টে বললো, বিয়ে করতে হচ্ছিল বলেই তো পালিয়ে এলাম। একটা সংসার থাকতে আরেক সংসারে ঢোকা যে দ্বিচারিতা শঙ্কর। তোমার মাধবীলতা যে দ্বিচারিণী নয়। কাঞ্চনদীঘির জলের প্রতিটা পদ্ম বিদ্রূপ করতো যে আমায়, আমার গোছানো কাঠেরবাড়ির ছোট্ট সংসারটা ভ্রূকুটি করতো যে! বলতো মাধবীলতা, তোমার ঐ মাটির উননে তুমি একজনের প্রিয় খাবার রেঁধেছ, একজনের ঘরণী হয়েছ অবিরত, আজ সেসব ভুলে, সংসার ছেড়ে, কোথায় চললে! তাই আর দ্বিতীয় সংসার পাততে পারিনি শঙ্কর। বাবা ছিল অবুঝ, বাধ্য হয়ে মহেশডাঙা ছাড়লাম। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে কাটোয়ার কলেজে ভর্তি হলাম, হোস্টেলে থাকতাম আর টিউশনি করতাম। এই বি.এ. পাশ করতেই আশ্রয় হারা হয়েছি। তবে কাগজে দেখলাম, একটি বাচ্চার গভর্নেস চাইছেন এক ভদ্রমহিলা, সেই কাজের আর আশ্রয়ের সন্ধানেই যাচ্ছি এখন।

রাস্তার লোকজনকে উপেক্ষা করে, নিজের সব কিছু ভুলে গৌরীশঙ্কর জড়িয়ে ধরেছিল মাধবীলতাকে। শঙ্করের ছোঁয়ায় ছটফট করে উঠেছিলো মাধবীলতা। সেই পরিচিত ছোঁয়া একই নির্ভরতার গল্প শুনিয়েছিলো ওর কানে কানে।

চলো মাধবী, আমার সাথে কলকাতা চলো এখুনি। আমি একটা ভাড়া ফ্ল্যাটে থাকি, তোমার জন্য ওই ফ্ল্যাটের ঘর দুটো অপেক্ষা করছে। চলো মাধবী, গুছিয়ে নেবে তোমার পুতুল পুতুল সংসার।

মাধবীলতার চোখে নিষেধ না মানা জলের রেখা দেখেছিলো শঙ্কর। ফিসফিস করে মাধবী বলেছিল, তুমি আমার সব থেকে কাছের মানুষ, সব থেকে আপনজন। তবুও নাকি আমাদের বিয়ে হবে না! রায়চৌধুরী বাড়ির শেষ বংশধর তাদেরই কুলপুরোহিতের মেয়েকে বিয়ে করলে, সকলে তোমায় ব্রাত্য করবে শঙ্কর। আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দিই কি করে?

শঙ্কর হেসে বলেছিল, মাধবী তুমি এত বড় কেন হয়ে গেলে! আগের মতই আবার বলো, এই শঙ্কর তুমি আমার বর হবে? তোমায় দই, মাংস দিয়ে ভাত দেব...মাধবী আজ যদি তুমি আমায় ফিরিয়ে দাও, তাহলে আর কোনোদিন কোনোখানে গৌরীশঙ্কর নামের মানুষটাকেই খুঁজে পাবে না।

মাধবী অসহায় গলায় বলেছিল, মহেশডাঙা ছেড়েছিলাম তুমি ভালো থাকবে বলে।

গৌরীশঙ্কর বললো, তাই বুঝি! নিজের শরীরের একটা অঙ্গ বাদ দিয়ে মানুষ ভালো থাকবে বলে তোমার মনে

হয়? বিকলাঙ্গ জীবন কাটিয়ে মানুষ সুখী থাকবে বলে তোমার বিশ্বাস?

তোমায় ছাড়া আমি খুব অসহায় মাধবী, আমায় গুছিয়ে নাও প্লিজ। মাধবীর মেসের ছোট্ট স্যাঁতস্যাঁতে ঘর থেকে ওর সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ওরা সেই রাতেই পৌঁছেছিল কলকাতা। মহেশডাঙায় যখন গৌরীশঙ্কর ফোন করেছিল তখন কাকভোর।

মা শুনেই আর্তনাদ করে বলেছিল, ওই মেয়েকে বিয়ে! আমারা মানিনা তোমার এসব উশৃঙ্খলতা। আমরা তোমার বনেদী বংশের মেয়ের সাথে বিয়ে স্থির করেছি। মৌখিক কথাও বলে রেখেছে তোমার বাবা, এখন তুমি যদি অন্যথা করো, তাহলে নিজের নামের শেষে রায়চৌধুরী পদবীটা আর বসাবে না।

ফোনটা রেখেই কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে বিয়ে সেরেছিলো মাধবীলতা আর গৌরীশঙ্কর।

গৌরীশঙ্করের মুখে ছিল প্রাপ্তির আনন্দ। মাধবীলতার চোখের কাজলে ভয় আর সংকোচের মিশেল।

অনভ্যস্ত হাতে শুরু করেছিল ওদের পুতুল খেলার সংসার। তবে এখন আর মাধবী আগের মত ধুলো বালি বেঁধে ধরে দেয়না শঙ্করের পাতে। রীতিমত যত্ন করে ওর পছন্দের পদগুলো রান্না করে দেয়। তবে ওর মনের মধ্যে যে যুদ্ধটা চলছে তার আভাস পায় গৌরীশঙ্কর। কেমন যেন থমথম করে ওর সরল সাধাসিধে মুখটা। সেদিকে তাকিয়ে গৌরী বারবার বলে, আমার পুরনো মাধবীলতা ফেরত চাই, প্লিজ ফিরিয়ে দাও।

মাধবী আনমনে বলে, তোমায় সংসার ছাড়া করলাম নিজের সংসার গোছাতে গিয়ে।

মাধবীকে নিয়ে রায়চৌধুরী বাড়ির সদর দরজা থেকে ফিরে এসেছিল গৌরীশঙ্কর। উমাশঙ্করের নিষেধ ছিল, ওই মেয়েকে নিয়ে যেন তার জীবিত কালে এ বাড়িতে প্রবেশ না করে গৌরী। একা ঢুকতে পারে কিন্তু ওকে নিয়ে নয়।

তারপর অনেক চেষ্টা করেও মাধবীকে স্বাভাবিক করতে পারেনি শঙ্কর।

একে একে ওদের বেশিরভাগ জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছে, দোষারোপ করা হয়েছে অপয়া মাধবীলতা আর চূড়ান্ত অপদার্থ গৌরীশঙ্করকে। উমাশঙ্করের লিভারে পচন ধরেছিল, গৌরীশঙ্কর একাই যাতায়াত করছিল মহেশডাঙায়। বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব নেওয়া সব সামলিয়েছিলো। তবুও মাধবী স্বীকৃতি পায়নি ও বাড়ির বউয়ের। উমাশঙ্করের কড়া নির্দেশ মেনে মাধবীলতাও যায়নি ও বাড়িতে। শুধু মাঝে মাঝে বলতো, শঙ্কর আমি গড়তে গিয়ে ভেঙে ফেললাম, তাই না!

বাবা যে বেশিদিন বাঁচবে না সেটা ডক্টররা বলেই দিয়েছিল। তাই মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল শঙ্কর।

সত্যিই বাবা বেশি দিন বাঁচেন নি। লিভারের পচনেই বাবার মৃত্যু হয়েছিল।

ভেঙে পড়েছিলো রায়চৌধুরী বাড়ির কাঠামো। সবাই চেয়েছিল, গৌরীশঙ্কর ফিরে আসুক মহেশডাঙায়। কিন্তু

গৌরী জানতো, চাকরি ছেড়ে দিলে আর দুদিন পরে ও খেতেও পাবে না।

বাবা মারা যাবার পরের দুর্গাপুজোটা খুব নমনম করেই সারা হয়েছিল রায়চৌধুরী বাড়িতে। কিন্তু এ বছর মায়ের জেদ, সেই আগের মত জমজমাট করে করতে হবে এ বাড়ির পুজো। না, এখনও টাকার সে ভাবে জোগাড় করে উঠতে পারেনি শঙ্কর। ঠাকুর গড়ার সময় আসন্ন বলেই মা ডেকে পাঠিয়েছিল ওকে। সঙ্গে তেতো গেলা গলায় বলেছিল, ওই মেয়েকে এ বাড়িতে আসতে বলো। তোমার বউয়ের জন্য তোমার ঠাকুমা কিছু গয়না রেখে গিয়েছিলেন, সেগুলো ওর হাতে দিতে হবে ভাবিনি কখনো। তবুও তুমি যখন বিয়ে করেই ফেলেছো, তখন এ গয়না আগলে আমিই কেন বসে থাকি?

গিনির হার, টিকলি, বালা এগুলো মাধবীলতার হাতে তুলে দেবার সময়েও মা বলেছিল, না বাছা, আমি তোমায় সাধ করে বরণ করতে পারবো না। শঙ্করের বাবাই যখন তোমায় মেনে নেন নি, তখন ওসব লোকদেখানো বরণে কি লাভ? এসেছো যখন, তখন থাকো, খাও, আবার অতিথির মত চলে যেও।

মাধবীলতা ধীর গলায় বলেছিল, আমি এ পরিবারের সদস্য মা, অতিথি নই। তাই আমায় বরণ করতে হবে না, আমি এমনিই এই পরিবারের সুখে দুঃখে থাকবো।

নন্দিনীদেবী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিলেন, ছলাকলা যে জানো, তা আমি বেশ বুঝেছি।

এই নিয়ে মাধবী দুবার এলো রায়চৌধুরী বাড়িতে।

মাধবীর কোনো আক্ষেপ নেই, কোনো অভিযোগ নেই শঙ্করের কাছে। শুধু ওর নীরব চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে শঙ্করের। কিছুই পারলো না ও। না পারলো নিজের স্ত্রীর অপমান আটকাতে, না রায়চৌধুরীদের জমি অধিগ্রহণ আটকাতে, না বাবাকে বাঁচাতে, না মায়ের প্রিয় সন্তান হতে। একেবারে লুজার হয়েই রয়ে গেল ও।

একমাত্র মাধবীর "কাছের সঙ্গী" খেতাবটাই যা জিতেছে জীবনে। যদিও ওর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান খেতাব ওটাই।

সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেছে। মাধবীলতা এখনো ফিরল না বাড়িতে। কোথায় গেল! ওর বাবা তো ঢুকতে দেয় না ওই বাড়িতে। তবে কি এতদিন পরে মহেশডাঙায় এসে ও কোনো পুরোনো বন্ধুর বাড়িতে গেল? সে যাক, মেয়েটা তো ঘরেই থাকে, কোথাও যেতেই চায় না। বড্ড চুপচাপ হয়ে গেছে মাধবী।

গৌরীশঙ্কর চায়, সেই কোমরে হাত দিয়ে চোখে চোখ রেখে কথা বলা প্রতিবাদী মাধবীলতাকে ফিরে পেতে। সেই কুমারী পুজোর দিনে রুখে দাঁড়ানো মেয়েটাকে, যাকে ও ভালবেসেছিলো, তাকে ফেরত পেতে চায়।

ওর ভাবনার মধ্যেই হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকলো মাধবীলতা। ঠোঁটে একটা আলগা হাসি। তোমাদের বিন্দুপিসি দিলো। আমার তো তোমাদের রান্নাঘরে ঢোকা বারণ তাই আমি ভেবেছি রান্নাঘরে নয়, অন্য দিক দিয়ে ঢুকবো রায়চৌধুরী বাড়ির অন্দরে। এমন ভাবনা বাদ

দিলাম, যে শুধু হেঁসেল দিয়েই মেয়েরা প্রবেশ করে নতুন সংসারে। অন্য অনেক পথও আছে গো।

শঙ্কর একটু ত্রস্ত স্বরে বললো, ছাড়ো না মাধু, আমরা তো দুদিন কাটিয়েই ফিরে যাব আমাদের ফ্ল্যাটে, কি দরকার এসব জটিলতায় ঢোকার!

মাধবীলতা একটু আত্মবিশ্বাসের সাথেই বললো, ফ্ল্যাট? ওটাতো শিকড় ছেঁড়া গাছ। ওকে জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছি ঠিকই, কিন্তু মাটির গভীরে যে শিকড় চলে গেছে, সেই গাছের ডালে ফুল না ফুটিয়ে তো আমি নড়ছি না শঙ্কর। তুমি চলে যাও, কদিন একটু কষ্ট করে হোটেলে খেয়ে নিও। আমি এই বাড়িতে থাকবো পুজো অবধি।

গৌরীশঙ্কর অবাক চোখে তাকালো চিরপরিচিত মেয়েটার দিকে। যার প্রতিটা নিঃশ্বাস ওর চেনা। যার ঠোঁটের ভিজে ভিজে আদ্রতায় ও নিজেকে সিক্ত করে বারবার। স্নানের পরে যার বুকের প্রতিটা জলবিন্দুতে ওর অধিকার, যার বুনো বুনো গন্ধে ও জংলী হয়ে ওঠে মধ্যরাতের বিছানায়, সেই মেয়েটাকেই কেমন অপরিচিত লাগছে ওর! রায়চৌধুরী বাড়ির এ হেন অপমানজনক পরিবেশের মধ্যে সে থাকতে চাইছে ওকে ছেড়ে!

গৌরীশঙ্কর ওর বাঁ হাতটা আলতো করে ধরে বলল, নেলপালিশ পরনি কেন?

মাধবীলতা মুচকি হেসে বললো, আলুথালু মাধুকে তোমার বেশি পছন্দ যে, পরিপাটি মাধবীলতার চেয়ে!

শঙ্কর ইতস্তত করে বললো, দেখো, পুজোর এখনো প্রায় দিন কুড়ি বাকি। আমি এতদিন অফিস কামাই করে

এখানে থাকতে পারবো না। আর তুমি তো জানো এ বাড়ির কেউ তোমায় পছন্দ করে না। আমি সামনে আছি বলে হয়তো সেভাবে অপমান করার সুযোগ পাচ্ছে না। আমি এখান থেকে চলে গেলেই শুরু হবে বাঁকা কথার আক্রমণ। কেন মাধবী, কেন তুমি আমায় ছেড়ে এই মহেশডাঙায় থাকতে চাইছো? তাছাড়া দুর্গাপুজো হবে কিনা তারও ঠিক নেই। আমি একটা লোনের অ্যাপ্লাই করেছি অফিসে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি স্যাংশন হবে কিনা বলতে পারছি না। বুঝতেই তো পারছো, পুজোটা না হলে মা তোমায় আর আমায় কি ভাবে দোষারোপ করবে! ভেবেছিলাম, মাকে বোঝাতে পারব। মা হয়তো বুঝবে, আমার এই চাকরির থেকে দুর্গাপুজোর মত ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান করা জাস্ট অসম্ভব। কিন্তু মা কিছুই শোনার জন্য রেডি নয়। একটাই জেদ ধরে বসে আছে, পুজো করতেই হবে। এই বাজারে ঠাকুরের দামই কত, তারপরে আছে পুরোহিতের খরচ, ঢাকি, পুজোর সরঞ্জাম...না মাধবী এ অসম্ভব। তুমি চলে চল কলকাতা। এই দোলাচলে তুমি এ বাড়িতে থেকো না।

মাধবীলতা গৌরীশঙ্করের ব্যাগটা গুছিয়ে দিতে দিতে বললো, সাবধানে থেকো। কটা দিন একটু কষ্ট করে খেয়ে নিও।

শঙ্কর জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো, তারমানে তুমি আমার কথা শুনবে না সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছ।

মাধবীলতা আবার বললো, আমাদের আলমারির দ্বিতীয় তাকে তোমার অফিসে যাবার সব জামা আমি আয়রন

করে রেখে দিয়েছি, অসুবিধা হবে না।

হালছাড়া গলায় গৌরী বললো, যা ইচ্ছে হয় করো। তবে কষ্ট পাবে সেটাও জেনে রেখো।

মাধবীলতা নিস্তরঙ্গ গলায় বলল, এখনও তো পাচ্ছি। ভিতরে তো ভাঙাগড়া চলছেই।

।। ১৬।।

গৌরীশঙ্কর চলে গেল কলকাতা, ভ্রুর ভাঁজে আশঙ্কা আর অস্বস্তির চিহ্ন নিয়েই রওনা দিলো। মাধবীলতা থেকে গেল রায়চৌধুরী বাড়িতে। নন্দিনীদেবী বিদ্রূপ করে বললেন, তুমি এবার এখানে কি জন্য রয়ে গেলে, শাশুড়ির যত্নআত্তি করবে বলে বুঝি! ঢং দেখে বাঁচি না। মাধবীলতা নিশ্চুপ।

নন্দিনীদেবী বিন্দুপিসিকে কড়া নির্দেশ দিলেন, এই মেয়ে দুপুর হলেই কোথায় বেরোয় আমার খবর চাই। কেন এই মেয়ে আমার ছেলের সাথে কলকাতা গেল না, তার পিছনে বড়সড় কারণ আছে। খুঁজে বের কর বিন্দু। তারপর আমি একে তাড়াবো শঙ্করকে দিয়েই। নষ্ট মেয়েমানুষের লোভের শেষ নেই। শঙ্করের মত সুপুরুষ পেয়েও মন ভরে নি। আবার কার জন্য থেকে গেল মহেশডাঙায় খোঁজ নে। হাতে নাতে ধরবি। তারপর আমায় খবর দিবি। রায়চৌধুরী বাড়ি থেকে আমি কোনদিন পায়ে হেঁটে গ্রামে যাইনি, এবারে যাবো। ওই মেয়ের মুখোশ আমি খুলবই।

বিন্দু তক্কেতক্কে থাকে মাধবীলতার গতিবিধির ওপরে নজর রাখার জন্য। কিন্তু এমন গেছো মেয়ে, যে এ বাড়ি

থেকে বেরিয়েই এ গলি, ও গলি দিয়ে ছুটে পালায়। বিন্দুর বয়েস তো কম হল না। আর দৌড়োতে পারে না। হাঁটুর ব্যথায় কাবু হয়ে যায়। এ বাড়ির গিন্নীর আবার কড়া নির্দেশ আছে পাঁচকান যেন না হয়। হাসিও পায় বিন্দুর, ঘরের কেচ্ছা জানবে, অথচ পাঁচকান হবে না। তাই কাউকে বলতেও পারে না। তবে কদিন ধরেই খেয়াল করলো, মাধবীলতা যখন বাড়িতে থাকে না তখন বিষ্ণুচরণেরও টিকি দেখতে পায় না বাড়িতে। যেহেতু দুপুরে সকলের জিরোনোর সময়, তাই কেউ কারোর খোঁজও রাখে না। কিন্তু পরশুদিন মাঠাকরুন বিষ্ণুচরণকে ডেকে দিতে বলেছিল, বিন্দু ওর ঘর থেকে নায়েবখানা, সব খুঁজেও তাকে পায়নি।

প্রায় দিন দশেক হয়ে গেল এখনো বিন্দু খবর আনতে পারলো না মেয়েটা কোথায় যায়।

নন্দিনীদেবী বিরক্ত হয়েই বললেন, বুঝলি বিন্দু তোকে বসিয়ে বসিয়ে এ বাড়িতে খাওয়ানো দেখি বুড়ো হাতি পোষার সমান। একটা সামান্য খবর জোগাড় করতে পারলি না। ওই মেয়ে বুকের ওপরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাও খবর পেলি না। আবার তো শঙ্কর আসার সময় হয়ে গেল, বোধহয় কালকেই আসবে। পুজোর তো দেরি নেই। এখনো তো ঠাকুর গড়া হলো না। চণ্ডীমণ্ডপ সাজানো হলো না। পুজো বোধহয় এবারে করবে না গৌরীশঙ্কর। আর যে কেন বেঁচে আছি, কে জানে!

বিন্দু একটু বেশি ভাত খায় বলে এত বড় কথাটা বললেন মাঠাকরুন। মনে কষ্ট হলো বিন্দুর, সাথে রাগও

হলো মাধবীলতার ওপরে। ওই মেয়ে যেদিন থেকে এ বাড়িতে ঢুকেছে, বিন্দুর দ্বিপ্রহরিক ঘুমের বারোটা বেজে গেছে। রোজই ওর পিছন পিছন ছুটে বাড়ি ফিরে এসেছে।

আজ নন্দিনীদেবীর অমন একটা কথার পরে আর বসে থাকবে না বিন্দু। বিহীত ওকে করতেই হবে।

আগে ভাগেই রায়চৌধুরী বাড়ির গেটের পাশে দাঁড়িয়েছিল ও।

মাধবীলতা আসছে দেখেই লুকিয়ে পড়লো। তবুও কি করে যেন মাধবীলতা ওর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, বিন্দুপিসি, মাকে গিয়ে বলো, আমি রায়চৌধুরী বাড়ির বউ, এমন কাজ করবো না যাতে এ বাড়ির নিন্দে হয়। যাও, বাড়ির ভিতরে যাও। মায়ের কাছে কাছে থাকো, শরীরটা ভালো নেই মায়ের, খেয়াল রেখো।

বিন্দু কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল মাধবীলতার চাঁচাছোলা কথা শুনে। মেয়েটাকে সেই ছোট্ট থেকে দেখছে, বড্ড স্পষ্ট কথা বলে। ইদানিংকালে এ বাড়িতে ঢুকে একটু যেন মিইয়ে গিয়েছিল, আবার যেন পুরোনো মাধবীকে দেখলো বিন্দু।

সময় নষ্ট না করে গটগট করে ভিতরের বাড়িতে ঢুকে গেলো বিন্দু।

।। ১৭।।

গৌরীশঙ্কর বাড়িতে ঢুকতেই নন্দিনীদেবীর ঘরে ডাক পড়লো। ব্যাগটা রেখে চিন্তাগ্রস্ত মুখে মায়ের ঘরে ঢুকলো ও। ভেবেছিল প্রায় দশদিন পরে বাড়ি ঢুকে প্রথম মাধবীকেই দেখবে। কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়েও তার

নাগাল পেলো না। গৌরী জানে, মা দুর্গাপুজোর বিষয়েই আলোচনা করবে। হাতে তো মাত্র আট দিন বাকি। আগামীকাল মহালয়া। এই সময় রায়চৌধুরীদের দুর্গামণ্ডপে কুমোর ঠাকুর রেডি করে ফেলে। পুজোর বাজার রেডি হয়ে যায়। এবারে সেসব কিছুই হয়নি। এমনকি খুব বেশি টাকাও জোগাড় করতে পারেনি শঙ্কর। কি ভাবে যে মায়ের চোখের দিকে তাকাবে সেটাই ভাবছিলো ও।

পুরুষমানুষ যে কেন চিৎকার করে কাঁদতে পারে না কে জানে! গৌরীশঙ্করের ইচ্ছে হচ্ছিল মায়ের পায়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে বলে, মা ক্ষমা করো। আমি পুজোর জোগাড় করতে পারিনি।

—মায়ের ঘরের দিকে ধীর অবশ পায়ে এগোচ্ছিল ও।

—হঠাৎই বাইরে বেশ চ্যাঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পেল। বেশ কয়েকজন একসাথে কথা বলছে। তার মধ্যে দুটো গলা ওর বেশ পরিচিত বলেই থমকে দাঁড়ালো। এল প্যাটার্নের লম্বা বারান্দার গ্রিল দিয়ে দেখতে পেলো, মাধবীলতা কোমরে শাড়ি গুঁজে বেশ জোর গলায় বলছে, এই এদিক দিয়ে নয়, বিষ্ণুকাকা ওদের বলো, যেন মায়ের হাতে না ধাক্কা লাগে পাঁচিলে। সাবধানে, আস্তে আস্তে আনো। চণ্ডীমণ্ডপে তুলবে সোজা। বিষ্ণুকাকা তুমি মণ্ডপ পরিষ্কার করিয়ে রেখেছো তো? বিষ্ণুচরণ ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ বৌরানী, আপনার কথা মত ছেলেকে বলে রেখেছিলাম।

গৌরীশঙ্কর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখছে নতুন মাধবীকে। রায়চৌধুরী বাড়িতে প্রথম প্রবেশের দিনের

সংকোচ, লজ্জা মাখানো চোখ দুটোতে আজ আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। বেশ নির্দেশের ঢঙেই বললো, একে একে নিয়ে এসো।

ঢাকটা বাজও। জানো না, এবাড়িতে যখন মা প্রবেশ করেন, তখন ঢাক বাজে!

স্থির চোখে তাকিয়ে আছে গৌরীশঙ্কর। খেয়ালও করেনি কখন ওর পাশে মা, বিন্দুপিসি, কাকিমারা এসে দাঁড়িয়েছে। মায়ের কথায় সম্বিৎ ফিরল ওর। ঠাকুর কি কলকাতা থেকে কিনে আনলে?

গৌরীশঙ্কর ঘাড় নেড়ে বললো, আমি কিছু জানি না না মা। আমিও এখন দেখছি ঠাকুর ঢোকাচ্ছে মাধবীলতা।

বিষ্ণুচরণ পায়ে পায়ে এদিকে এগিয়ে আসতেই নন্দিনীদেবী বললেন, বিষ্ণু...প্রতিমা কে গড়লো?

বিষ্ণুচরণ একটু ইতস্তত করে বললো, বৌরানী নিজের হাতে গড়লো কর্তামা। আমি তার নির্দেশ মত সব উপকরণ যোগান দিয়েছি, সে নিজের হাতে গড়েছে একটু একটু করে। ওই যে রায়চৌধুরীদের ঠাকুর গড়ার জন্য দক্ষিণ পাড়ার শেষে যে চালাটা তৈরি করেছিল বড়কর্তা, এখন তো ঝোপ ঝাড় হয়ে গেছে। সেটাই পরিষ্কার করে ওখানেই প্রতিমা গড়লেন বৌরানী। আসুন কর্তামা, দেখে যান। চোখ জুড়ানো রূপ মায়ের।

বহুদিন পরে নন্দিনীদেবী আবার চণ্ডীমণ্ডপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। স্বামী মারা যাবার পরের বছরের পুজোয় উনি ভুলেও আসেন নি পুজোমণ্ডপে।

মায়ের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন নন্দিনীদেবী।

এ কি করেছে মাধবীলতা! এ যে নন্দিনীদেবীর অল্প বয়েসের মুখ। সিঁথিতে একঢালা সিঁদুর, পরনে লাল বেনারসী। মৃন্ময়ী মূর্তির মধ্যে নিজের কম বয়েসের ছবি দেখছেন যেন!

দুচোখে জল, অবাধ্য হয়ে উঠেছে নোনতা জলবাহী শিরাগুলো।

এককালে সবাই বলতো, নন্দিনীকে নাকি মা দুর্গার মত দেখতে। বড় বড় দুটো চোখ, এক ঢাল চুল, বেদানার মত গায়ের রং। এ বাড়িতে অবশ্য রূপের প্রশংসা কোনো কালেই পায়নি সে। নেহাত বড় বাড়ি থেকে এসেছিল বলে, একেবারে দূর ছাই করেনি কেউ। কিন্তু ওর অমন রূপের প্রশংসা বাপের বাড়িতে যত শুনেছে, শ্বশুরঘরে কোনোদিনই শোনে নি। বরং শাশুড়ি ছিলেন জমিদার বাড়ির মেয়ে, তার অহংকারেই আলোকিত ছিল রায়চৌধুরী পরিবারের অন্দর।

নন্দিনীদেবী সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, একি করেছ মাধবীলতা! মায়ের মুখের সাথে মানুষের মুখের মিল কি করে হয়! পাপ লাগবে যে!

মাধবীলতার হাতে, তখনও কাঁচা রঙের দাগ। মুখটা নিচু করে বললো, জানো মা, আমার তখন বছর চারেক বয়েস। বাবার হাত ধরে এ বাড়িতে এসেছিলাম পুজো দেখতে। আমার মায়ের এক মাস ধরে খুব শরীর খারাপ ছিল। তাই পুজো আমার জামাও কেনা হয়নি সে বছর।

আগের বছরের জামা পরেই ষষ্ঠীর দিন রায়চৌধুরী বাড়ির ঠাকুর দেখতে এসেছিলাম। বাবা চোখ আঁকবে, তাও বায়না করে পিছন পিছন এসে হাজির হয়েছিলাম আমি। হঠাৎ এ বাড়ির একজন মানুষ এসে বললো, রমেশদা, এই বুঝি আপনার মেয়ে?

বাবা ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

আমি অবাক হয়ে একবার চণ্ডীমণ্ডপে আরেকবার সেই মানুষটির দিকে তাকাচ্ছিলাম। প্রতিমার মতই তারও পরণে লাল বেনারসী, নাকে বড় নথ, বড় বড় দুটো চোখে হালকা কাজল, পিঠ ময় ছড়িয়ে আছে একঢাল চুল।

বাবা বললো, ইনি হলেন মাঠাকরুন, এ বাড়ির গিন্নীমা।

আমি প্রণাম করতে যেতেই সে চোখ বড় বড় করে বললো, নতুন জামা নেই কেন গায়ে!

আমি বললাম, কিনে দেয়নি মা।

সে হাঁকল, বিষ্ণুচরণ....এই নাও টাকা, যাও পঞ্চাননের দোকান থেকে লাল রঙের একটা জামা এনে দাও, এর সাইজের। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেই নতুন জামা গায়ে মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে এসে বললো, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। তুমিও এ বাড়ির সদস্য, এবাড়িতেই ভোগ খেয়ে যাবে রোজ। তুমি আমাদের পুরোহিতমশাইয়ের মেয়ে বলে কথা।

জানো মা, আমার সেদিনই ওই প্রতিমার মুখটা মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। ছোট থেকে কাঞ্চনদীঘির এঁটেল মাটি তুলে অনেক মূর্তি, পুতুল গড়েছি কিন্তু কখনো ওই প্রতিমার মুখটা গড়ি নি। কারণ ভেবেছিলাম, যেদিন

ওই প্রতিমার মুখটা গড়বো, সেদিন যেন তার পুজো করতে পারি। অবহেলায় না পড়ে থাকে আমার খেলনাবাড়ির পুতুলের মধ্যে।

এবারে তোমার ছেলে বললো, তার কাছে নাকি টাকা নেই ঠাকুর বায়না দেবার। তাই আমি নিজের হাতেই গড়তে শুরু করলাম মায়ের মুখ। সেই ছোটবেলায় দেখা প্রতিমার মুখ। যে বাচ্চামেয়ের চোখ দেখেই বুঝেছিলো, তার নতুন জামা নেই বলে পুজোমণ্ডপে উঠতে সঙ্কোচ বোধ করছে। যে নিজের আঁচলের খুঁটে বাঁধা টাকা দিয়ে আমায় নতুন জামা কিনে দিয়েছিল, সে হোক না চিন্ময়ী মূর্তি, আমার কাছে মণ্ডপের মৃন্ময়ী মূর্তির থেকেও তাকে বেশি জাগ্রত মনে হয়েছিল। গৌরীশঙ্কর হাঁ করে শুনছে তার তিনবছরের বিবাহিত স্ত্রীর কথা, তার আজীবনের সাথীর কথা।

নন্দিনীদেবী ভাঙা গলায় বললেন, তুই মনে রেখেছিস এখনো? আমি যে ভুলেই গিয়েছিলাম।

মাধবীলতা বললো, তুমি তো দাত্রী ছিলে মা, সকলের হাতে পুজোর সময় কিছু না কিছু তুলে দিয়ে তুমি আনন্দ পেতে। দেখো তো মা, প্রতিমার গায়ের বেনারসীর মত তোমারও এমন একটা বেনারসী ছিল কিনা!

নন্দিনীদেবীর চোখে জল গৌরীশঙ্করও তেমন একটা দেখেনি। ঘাড় নেড়ে মা বললো, সাবধানে প্রতিমা মণ্ডপে তোলো। মানুষের মুখের সাথে যেটুকু মিল হয়েছে তার পাপ যেন আমার গায়ে লাগে, শিল্পীর কোনো পাপ নেই মা, ওকে তুমি রক্ষা করো।

মাধবীলতা বললো, মা, আরেকটা আব্দার আছে তোমার কাছে। পুজোয় তোমার কাছে আমার আব্দার।

নন্দিনীদেবী বললেন, রায়চৌধুরীরা সব হারিয়ে আজ নিঃস্ব। কি চাস বল, যদি ক্ষমতায় কুলোয় নিশ্চয়ই দেব।

শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় মাধবীলতা বললো, মা, এবারে দুর্গাপুজো আমি করতে চাই। পুরোহিত লাগবে না। বাবার পাশে বসে থেকে সব মন্ত্র আমার মুখস্ত, আমি পারবো মা।

নন্দিনীদেবী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন, কিন্তু মেয়ে হয়ে দুর্গাপুজো করবি? অনাচার হবে যে!

মাধবীলতা বললো, তোমার ছেলের কাছে যে পুরোহিত বিদায়ের টাকা নেই মা। সে যে অনেক কষ্টে পুজোর সরঞ্জামের ব্যবস্থাটুকু করতে পারবে। রায়চৌধুরী বাড়ির সম্মান, এত দিনের পুজো বন্ধ হয়ে যাবে তবে?

জমির আয় থেকে চারদিনের ভোগের খরচ উঠবে, আমি হিসেব করেছি। বাকি থাকলো ঢাকির খরচ, ওটাও না হয় জুটবে।

নন্দিনীদেবী একটু ভেবে বললেন, যদি নিন্দে হয়। মহিলা তো কখনো পুজো করে নি রে।

মাধবীলতা স্থির কণ্ঠে বললো, মাও যে মেয়ে, তার পুজো একজন মেয়ে করলে দোষ কেন হবে?

গৌরীশঙ্করের দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে নন্দিনীদেবী বললেন, সাত রাত তোমরা আলাদা ঘরে থাকবে। বৌমা যদি পুজো করে, তবে দেবীপক্ষ থেকেই পৃথক থাকা উচিত।

নন্দিনীদেবী নিজের ঘরের দিকে এগোলেন।

মুগ্ধ হয়ে নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে শঙ্কর। এই জন্যই তো মাধবীলতা সবার থেকে আলাদা। সেই ছয় বছরের কুমারী পুজোর দিন থেকেই বুঝেছিলো শঙ্কর, এ মেয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মত সাধারণ নয়।

।। ১৮।।

লাল পাড় গরদের শাড়ি পরে প্রতিমার মুখ আঁকতে যাচ্ছে মাধবীলতা। গৌরীশঙ্কর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, আমার পাঞ্জাবির বোতাম পাচ্ছি না।

মাধবীলতা মুচকি হেসে বললো, বেশ আমি বিন্দুপিসিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গৌরীশঙ্কর ফিসফিস করে বললো, সাতদিন তো হয়ে গেছে, আজ তো ষষ্ঠী, আজ কেন দূরে দূরে আছো?

মাধবীলতা বললো, একাদশীর দিন কাছে আসবো বলে।

এ কেমন অত্যাচার আমার ওপরে মাধবী? তুমি আমার চোখের সামনে ঘুরছো, বেড়াচ্ছ, অথচ আমিই তোমায় ছুঁতে পাচ্ছি না।

মাধবীলতা গাঢ় গলায় বলল, কারণ তুমি আমার সব থেকে কাছের মানুষ, আমার বুকের মধ্যেই আছো সবসময়, তাই আলাদা করে ছুঁয়ে দেখার প্রয়োজন নেই।

গৌরীশঙ্কর মুখ ভেঙচে বললো, যত সব ভুলভাল যুক্তি! আমার বিয়ে করা বউকে নাকি আমি আদর করতে পারবো না?

মাধবীলতা গম্ভীর স্বরে বললো, পুরোহিতকে জিভ ভেঙালে কি হয় জানো? জিভ খসে যায়!

আর পুরোহিতকে জড়িয়ে ধরলে কি হয় গো? পুরোহিতের ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালে কি হয়...

ওর কথা শেষ হবার আগেই মাধবীলতা ছুটে পালালো ঘর থেকে।

।। ১৯।।

গোটা মহেশডাঙার লোক জড়ো হয়েছে রায়চৌধুরী বাড়ির পুজো দেখতে। ফিসফিস কানেও আসছে নন্দিনীদেবীর। অনেকেই বলছে, এসব অনাচার। মহিলা হয়ে দুর্গাপুজো করবে! দুজন উঠতি ব্রাহ্মণও উপস্থিত হয়েছে, মাধবীলতার ভুল ধরার উদ্দেশ্যে। এমনকি রমেশ ঘোষালও এসেছেন মেয়ের এ হেন অনাসৃষ্টি দেখতে।

লালপাড় গরদের শাড়ি পরে, নাকে বড় নথ, কপালে লাল সিঁদুরের টিপ পরে ধীর পায়ে মণ্ডপে উঠলো রায়চৌধুরী বাড়ির ছোট বৌরানী।

সম্ভ্রমে মহেশডাঙ্গার মানুষ চুপ।

পরিষ্কার সংস্কৃত উচ্চারণে শুরু হলো মায়ের পুজো।

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ.........."

রমেশ ঘোষাল আচমকা মেয়ের সাথে গলা মিলিয়ে বলে উঠলেন—

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ, যা দেবী সর্বভূতেষু

নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ, যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা!

গোটা মহেশডাঙার মানুষ নিশ্চুপ হয়ে দেখেছিলো মাধবীলতার নিষ্ঠার সাথে মন্ত্র উচ্চারণ।

রমেশ ঘোষালের দুচোখে জল। কাঁপা গলায় বললেন, আমার রক্তে দোষ ছিল না গো। আমি মেয়ে মানুষ করতে ভুল করিনি।

নন্দিনীদেবী বললেন, রমেশদা, গৌরীশঙ্কর আর মাধবীলতার গাঁটছড়া স্বয়ং মা দুর্গা বেঁধেছিলেন, ওটা খোলার সাধ্য আমাদের নেই।

ঢাকের আওয়াজ, মাধবীলতার নির্ভুল মন্ত্রে আর ধূপের গন্ধে রায়চৌধুরী বাড়ির প্রতিমার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, মা যেন প্রাণ পেয়েছেন। মৃন্ময়ী মূর্তি যেন চিন্ময়ী রূপে ধরা দিয়েছেন। গৌরীশঙ্কর কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে এই মণ্ডপেই মাথায় সিঁথিময়ূর পরে, হাতে পদ্ম নিয়ে বসে আছে ছয় বছরের মাধবীলতা। আজ পূজারিণী মাধবীলতার দিক থেকেও চোখ সরাতে পারছে না ও।

একমনে মাধবীলতা উচ্চারণ করে চলেছে......

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

সমাপ্ত

পরজন্ম চাই

।। ১।।

এখনও রান্না কমপ্লিট করতে পারোনি মা? সারাদিনে ওই একটাই তো কাজ করো তুমি, সেটাও পারছো না? তাহলে পাপাকে বলো একটা রাঁধুনি রেখে দিতে, সে অ্যাটলিস্ট টাইমলি খাবারটা দিতে পারবে।

এই তো রে ঈশা হয়ে গেছে। তুই গরম গরম ভেজ ডাল ভালোবাসিস বলেই তো...

মায়ের কথার মাঝেই ব্যঙ্গাত্মক ভাবে হেসে উঠলো দেবজিত। তুইও যেমন, মায়ের টাইম সেন্স কি করে থাকবে একটু বলবি? দিনরাত বাড়ির মধ্যে থাকে। দুটো অকাজ আগে পরে করলেই কি বুঝতে পারবে তার লাভক্ষতি! অফিসে যদি দশ মিনিট লেটে যাই তাহলে লালকালির দাগটা পড়বে সেটার অর্থ পাপা জানলেও মা তো বুঝবেই না রে পাগলী।

বোনের দিকে তাকিয়েই নিজের ফাইল গোছাতে গোছাতে কথাগুলো বললো দেবজিত। সে এখন সদ্য চাকরি পেয়েছে রেলে। এই বাজারে সরকারি চাকরি পাওয়ার পুরো ক্রেডিট গোজ টু মি বলে মাঝে মাঝেই গলা ফাটাচ্ছে সে। দেবজিত বলে, আমার কোনো গড ফাদার নেই, তাই নিজের যোগ্যতায় নিজেরটুকু ছিনিয়ে নিয়েছি।

ঈশা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, দাদাভাই তোর তো অফিস, আর আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ, কবিতার রেকর্ডিং আছে। সব ইন্সট্রুমেন্ট রেডি করে স্টুডিও ভাড়া করে ভদ্রলোক বসে থাকবেন, দেরি হলেই পরের স্লট শুরু হয়ে যাবে, ভাবতে পারছিস? তুই হয়তো পারছিস, কিন্তু মা তো কোনোদিনই পারলো না বল। এখন আমি কি ডাল খেতে ভালোবাসি সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল।

এগুলোকে আমি ভালোবাসা বলি না বুঝলি দাদাভাই! আমি বলি অশিক্ষা, জাস্ট আনকালচার্ড।

ভাতের থালাটা সামনে ধরে দিতে দিতে কমলিকা নরম গলায় বললেন, একটু দেরি হয়ে গেল।

দেবজিত আবার বললো, এটা তো রোজকার চিত্র মা।

একটা কথা বলতো, বাবার আর আমার মাইনেতে এখন তো একজন রাঁধুনি রাখাই যায়, তাও কেন তুমি গোঁয়ার্তুমি করে সব কিছু নিজের হাতে করার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছ, কে জানে!

দেবজিতের সামনে খাবারটা ধরে দিতে দিতেই রান্নাঘরের সাজানো তাকগুলোর দিকে আড়চোখে তাকালো কমলিকা। না, এখনো কোনো ছায়ার আধিপত্য নেই রান্নাঘরের চৌকাঠে। কাঠের ডাইনিং টেবিলের চারটে চেয়ারের দিকে তাকালো ও। ঈশা, দেবজিত, মনীন্দ্র তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসে আছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আরেকটা চেয়ারে বসতেন মনীন্দ্রর মা, পুষ্পবালা দেবী।

বছর দুয়েক হলো এ সংসারের মায়া ত্যাগ করে তিনি স্বর্গালোকে যাত্রা করেছেন। তারপর থেকে ওই চেয়ারটা

ফাঁকাই পড়ে আছে। কমলিকার চেয়ারে বসে একসাথে সবার সাথে খাবার অভ্যাসটা আর তৈরি হয়নি।

ঈশা হবার আগে অবশ্য শ্বশুরমশাই বসতেন এখন ঈশা যে চেয়ারটায় বসে আছে সেটাতে। তখনও কমলিকা সবাইকার খাওয়া হলে শেষে ওই হাঁড়ি কুড়ি নিয়ে বসে কোনোমতে খাওয়া শেষ করতো।

কাজের মাসি এসেই চেঁচাবে, তাই নিজের খাওয়ার থেকেও সব বাসনগুলো টিউবওয়েলের নীচে ভিজিয়ে রাখাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওর কাছে। তখন এ বাড়িতে সিঙ্ক ছিল না। উঠোনের একপাশে ছিল একটা টিউবওয়েল। ওখানেই বাসন মাজতো ঠিকে ঝি। যেদিন সে কামাই করতো সেদিন বাধ্য হয়ে কমলিকা নিজেই মেজে নিত। বেশ কিছু অভ্যেস তাই ওর এ বাড়িতে তৈরিই হয়নি।

রিনা, এই রিনা, আমার খাবারটা দিয়ে দাও প্লিজ।

মনীন্দ্র খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে বসলো।

ঈশার দিকে তাকিয়ে বলল, আজ তো তোর রেকর্ডিং আছে, তাই না?

কমলিকা ভাত বাড়তে বাড়তে ভাবছিলো, মনীন্দ্র ছেলে মেয়ের বিষয়ে খুঁটি নাটি সব জানতে পারে, অন্ধকারে থাকে শুধু কমলিকা। ওকে ইদানিং ছেলে মেয়েরা আর কিছুই বলে না। যেটুকু ওদের নিজের আলোচনা থেকে কানে আসে আরকি।

কি হলো গো রিনা, তাড়াতাড়ি কর!

রিনা, না কমলিকার ডাক নাম রিনা নয়। বাবা ওকে আদর করে কমল বলে ডাকতো, মা ডাকতো কলি।

রিনা নামটা এ বাড়ির দেওয়া।

বিয়ের প্রথম দিন এ বাড়িতে ঢোকার পরই শাশুড়ি হাসি মুখে সকলকে বলেছিলেন, বৌমার নাম পরিবর্তন করলাম, আমার ভাসুরের মেয়ের নামও কমলিকা, একই বাড়িতে দুটো কমলিকার কি দরকার বাপু, তাই বৌমার নামটা পরিবর্তন করে রিনা রাখলাম। শুনে নাও, সবাই আজ থেকে ওকে রিনা বলে ডাকবে।

এই কমলিকা, তুইও বৌদিকে রিনা বৌদি বলবি বুঝলি!

কমলিকা নামের ননদটি একমুখ হেসে বলেছিল, সেই ভালো, আমার বাবা কত শখ করে আমার এই নাম রেখেছিলো, আমি কখনো আমার নাম চেঞ্জ করবো না বাবা, তার থেকে বরং বৌদিরটাই পরিবর্তন হোক।

কমলিকা দাসগুপ্তর নাম পরিবর্তন করে হয়ে গেল রিনা সেন। তেইশ বছরের পরিচিত বাড়ি, চিরপরিচিত মানুষগুলোকে সদ্য ছেড়ে আসার কষ্টের সাথে আরেকটা কষ্ট যোগ হলো। রীতিমত আইডেনটিটি ক্রাইসিস।

তখনও কলেজের বন্ধুদের ডাক শুনতে পাচ্ছে কানে—কমলিকা চল ক্যান্টিনে।

প্রফেসর ঢুকেই বললেন, কমলিকা দাসগুপ্ত প্লিজ কাম হেয়ার।

আস্তে আস্তে শ্রবণেন্দ্রিয় অভ্যস্ত হচ্ছিল রিনা নামটার সাথে। ভুলছিলো কমলিকাকে। প্রথম প্রথম এ বাড়ির

সবাই যখন রিনা বলে ডাকত, কমলিকার মনে হতো ওকে নয়, অন্য কাউকে ডাকছে।

দুবার তিনবার ডাকার পরে আচমকা নিজের নতুন নাম মনে পড়ে গিয়ে সাড়া দিয়ে উঠতো।

হারিয়ে গেছে কমলিকা। কাগজে কলমে শুধু নয়, নিজের মন থেকেও যেন মুছে দিয়েছে ওর নিজের নামটাকেই। এতবছরের পরিচিতি ভুলে নতুন নামে অভ্যস্ত হতে হলো ওকে।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, বিয়ে তো মনীন্দ্রও করলো, ওর তো সারনেম বদলালো না, পরিবর্তন হলো না তো ওর নামের। কমলিকার এক দূরসম্পর্কের মেসোমশাইয়ের নাম মনীন্দ্র, তার কারণে তো কমলিকার বাড়িতে পাল্টে গেল না মনীন্দ্রর নাম। বিয়ে কি শুধু কমলিকারই হলো!

হাতে শাঁখা, পলা, নোয়া, সিঁথিতে সিঁদুর, নামের পরিবর্তন সব কিছু শুধুই ওর হলো! মেনে নিয়েছিল কমলিকা, ভালোবেসেছিল যে মনীন্দ্রকে। আপন করে পেতে চেয়েছিল ওকে। ওর মনে একাধিপত্য বিস্তার করার জন্য নিজের সবটুকু পরিবর্তন করতেও পিছপা হয় নি কমলিকা।

।। ২।।

আজকেও তুমি লেট করে ফেললে ঈশা! নাও তাড়াতাড়ি করো। প্রবুদ্ধ গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই বললো, এবারে তো আমাদের বিষয়টা বাড়িতে জানিয়ে দিতে পারো, এই তোমার বাড়ি থেকে তিনহাত দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হাপিত্যেস করে বসে থাকতে হয় না তাহলে।

তোমার মায়ের হাতের ডেলিসিয়াস খাবার দাবার সেনবাড়ির উডবি জামাইয়ের পাতেও একটু আধটু পড়ে আর কি!

সিটবেল্টটা লাগাতে লাগাতে ঈশা আদুরে ভঙ্গিমায় বললো, আর কটা দিন ডিয়ার, আমার এম বি এ কমপ্লিট হলেই বলবো, আসলে পাপা আমায় একটু বেশিই প্রশ্রয় দিয়েছে জীবনে। এখন যদি শোনে আমি তাঁর স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে প্রেম করে বসে আছি তাহলে হয়তো একটু অফেন্ডেড হবে, তাই একটু টাইম নিচ্ছি, বাড়িতে বিয়ের কথা উঠলেই টুপ করে বলে দেব।

প্রবুদ্ধ সামনের বাসটার উদ্দেশ্যে জোরে হর্ন দিয়ে বললো, আর তোমার মা? তাকেও তো বলতে পারো।

ঈশার ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি ফুটলো!

মা আবার কি বলবে? পাপার মতটাই আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট, মা কবেই কি বুঝলো, আজকেই মায়ের রান্নার দেরি হলো বলেই আমারও দেরি হলো জানো?

প্রবুদ্ধ হেসে বললো, এটা তো রোজকার ঘটনা ঈশা।

ঈশা বিরক্তিতে মুখটা বেঁকিয়ে বললো, কি বলবো বলো, এই ভদ্রমহিলা বোধহয় কিছুতেই চান না, আমি প্রতিষ্ঠিত হই। তুমি জাস্ট ভাবতে পারবে না প্রবুদ্ধ, গত পরশু আমি ঘরের মধ্যে মোবাইলে আজকের কবিতাগুলো রেকর্ড করছিলাম, বারবার শুনলে ভুলগুলো ঠিক হয়ে জিনিসটা নিখুঁত হয় তাই, মা চা দিতে ঘরে এসে বলে কিনা, ঈশা, পৃথিবী, ধরিত্রী এই কথাগুলো যখন উচ্চারণ করবি তখন দৃঢ় অথচ সম্মানের সাথে উচ্চারণ কর। মা

ছোটবেলায় আমায় কবিতা শিখিয়েছিল। তারপর অবশ্য পাপার জন্যই আমি প্রফেশনাল টিচারের কাছেই শিখেছি। তবুও মা সেই ছোটবেলার মত এখনও আমায় শেখাতে আসে! হাসবে না কাঁদবে তুমি বলো!

আমার নিজস্ব ইউটিউবের চ্যানেলে কত ভিউয়ার মা জানে না, লোকজন জাস্ট পাগল আমার কবিতা আবৃত্তি শোনার জন্য, সেখানে ওই রিনা সেনের কাছ থেকে আমায় শিখতে হবে কেমন করে কবিতা বলবো, কেমন করে শব্দ উচ্চারণ করবো! ক্যান ইউ ইমাজিন প্রবুদ্ধ!

নেহাত মা বলেই আমি অপমান করিনি, জাস্ট ইগনোর করলাম। প্রবুদ্ধ বললো, কুল ডাউন বেবি, আজ তোমার রেকর্ডিং আছে। মনটাকে শান্ত করো প্লিজ। আর এটা কিন্তু তোমার আগের মত শুধু ইউটিউবের জন্য রেকর্ডিং নয়, এই প্রথম কোনো নামি পরিচালকের মুভিতে তোমার গলা ব্যবহার করবে ওরা।

ঈশা আদুরে গলায় বলল, মিস্টার অর্কপ্রভ ব্যানার্জীকে তো আমি চিনতামই না, তুমিই পরিচয় করিয়ে দিলে, ইনফ্যাক্ট এই ইউটিউবে নিজের রিসাইটেশন চ্যানেল খোলার প্ল্যানটাও তো তোমার ছিল, নাহলে হয়তো পাড়ার স্টেজেই প্রশংসা কুড়িয়ে বেড়াতে হতো।

প্রবুদ্ধ বললো, কিন্তু ঈশা ওই পাড়ার স্টেজে তোমার কবিতা শুনেই কিন্তু আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম। সেটা ভুলে গেলে চলবে না কিন্তু।

ঈশা মুচকি হেসে বললো, আমি পিছনের দিকে তাকাতে মোটেই ভালোবাসি না প্রবুদ্ধ, তুমি তো জানো।

আমি সামনে পা বাড়িয়ে সিঁড়ির উঁচু ধাপে উঠতে চাই।

এই, বললে না তো অর্কপ্রভর সাথে তোমার আলাপ কি করে!

প্রবুদ্ধ রাস্তার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে বললো, আমার অফিসে এসেছিলেন ভদ্রলোক, বেশ মিশুকে মানুষ, আমার থেকে বয়েসে হয়তো বছর দুয়েকের বড়ই হবেন, একটা সেট সাজাতে চান, তাই ইনটিরিয়ার ডেকোরেশনের জন্যই এসেছিলেন, তখনই কথায় কথায় বললেন, নতুন মুখ, নতুন সেট, নতুন গলা ব্যবহার করতে চান, ছবির গানগুলো গাওয়াচ্ছেন নাকি কোনো এক অপরিচিত অথচ ট্যালেন্টেড গায়ককে দিয়ে, তখন এটাও বললেন, গোটা তিনেক কবিতা আছে আমার মুভিতে, মেয়েটি একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বালাবে আর নেভাবে... কি ধরনের আলো দেওয়া উচিত বলুন তো আপনি?

তখন আমি বললাম, কবিতার জন্য নতুন গলা যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে একজনের গলা শুনতে পারেন, দিয়ে মোবাইল থেকে তোমার বলা গোটা দুয়েক কবিতা শোনাতেই ভদ্রলোক বললেন, ব্রিলিয়ান্ট, তারপরেই তো অডিশনে ডাকলো তোমায়। আর আজ একেবারে রেকর্ডিং।

ঈশা হালকা করে হাতটা ধরলো প্রবুদ্ধর, নরম গলায় বলল, তুমি ছিলে বলেই এসব সম্ভব হচ্ছে।

প্রবুদ্ধ স্টুডিওর সামনে গাড়িটা পার্ক করিয়ে বললো, লাভ ইউ ঈশা, তুমি আরও এগিয়ে যাবে, বেস্ট অফ লাক,

তোমার হয়ে গেলে আমায় কল করো, আমি যদি নাও আসতে পারি তাহলে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দেব, তোমায় বাড়িতে ড্রপ করে দেবে, আপাতত আমি অফিসে যাচ্ছি।

ঈশা কাঁচুমাচু মুখ করে বললো, নার্ভাস লাগছে যে! প্রবুদ্ধ মুচকি হেসে বললো, লক্ষ্যের দোরগোড়ায় পৌঁছালে এমন একটু আধটু হয়, তাড়াতাড়ি যাও, অলরেডি তুমি লেট আছো টেন মিনিটস।

কুর্তির ওপরে স্কার্ফটা ঠিক করে নিয়ে স্টুডিওর দিকে হাঁটা দিলো ঈশা।

এর আগে যা কিছু রেকর্ড করেছে সবেতেই প্রবুদ্ধ ছিল, তাছাড়া ওগুলো সবই ঈশার নিজের চ্যানেলের জন্য, এই প্রথম ওর কণ্ঠ, ওর আবৃত্তি ব্যবহার করা হবে মুভির নায়িকার গলায়, একদিকে প্রাপ্তি অন্যদিকে টেনশনের একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে ভাসছিল ঈশা, মনে পড়ে যাচ্ছিল প্রবুদ্ধর সাথে প্রথম আলাপের মুহূর্তগুলো।

৩

অফিসে ঢুকতেই বিকাশদা বললো, আরে দেবজিত তোমায় তো একটা কথা বলাই হয়নি ডিয়ার, সামনের সপ্তাহে আমাদের ডিপার্টমেন্টের মুখার্জীদার রিটায়ারমেন্ট উপলক্ষ্যে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে, এমনি কিছুই নয়, আমরা সবাই যে যেরকম পারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব, ওই হেঁড়ে গলায় গান থেকে শুরু করে কবিতা, গল্প পাঠ যা ইচ্ছে। তো তোমরা এবারে একেবারে ফ্রেস ক্যান্ডিডেট, তাই তোমাদের মত ইয়ংদের তো

পার্টিসিপেট করতেই হবে। আমাদের চিফ যেহেতু বাঙালি তাই ওনার এসবে বেশ ইন্টারেস্ট আছে, এর আগেও বড় সাহেবের জন্মদিনে আমরা একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করেছিলাম।

দেবজিত নিজের ব্যাপারে বরাবরই পারফেকশনিস্ট, অফিস ঢোকার সময় পালিশ জুতোয় সামান্য ধুলোর দাগ লেগে থাকলেও ওর মনটা খুঁতখুঁত করে, মাথার চুল থেকে জুতোর লেস পর্যন্ত নিখুঁত চাই ওর, সাজগোজ নয়, এটাকে ও পারফেকশন বলে। যখন দেবজিত বেশ ছোট, ওই ক্লাস সিক্সে পড়ে যখন রাত এগারোটা মানে ওর কাছে মধ্যরাত, তখন একদিন ঘুম চোখে দেখেছিলো মা ওর স্কুলের ড্রেসটা আয়রন করছে। গরম ইস্ত্রি দিয়ে প্রেস করছে ওর ড্রেসের কলারটা। পরেরদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি অত রাতে আমার স্কুলড্রেস আয়রন কেন করছিলে?

মা হেসে বলেছিল, পোশাক-আশাক পুরোনো হোক, কিন্তু পরিষ্কার ঝকঝকে পরবি, তাহলে দেখবি আত্মবিশ্বাস জন্মাবে, সবার সামনে দাঁড়িয়ে যদি নিজের পোশাকের প্রতি চোখ পড়ে মনে হয়, এমা, কি অগোছালো! তাহলে কথা বলার সময় গলার স্বর কেঁপে যাবে! কনফিডেন্স লেভেল যাবে নেমে। তাই নিজেকে সবসময় স্মার্টলি প্রেজেন্ট করবি। ওই ছোট্ট মাথায় কথাগুলো ঢুকে গিয়েছিল দেবজিতের।

বুঝেছিলো কোঁচকানো অপরিস্কার জামায় আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। বাবা অবশ্য বলতো, সবেতেই তোর মায়ের বেশি

বেশি, ছোট ছেলে তার স্কুলড্রেসও নাকি আয়রন করতে হবে। আমরা তো কোনোদিন এসব করে স্কুলে যাইনি। কিন্তু মায়ের আর সব শাসন দেবজিতের খারাপ লাগলেও এটা বেশ ভালো লাগত। বিনা কোঁচের বকের পালকের মত সাদা স্কুলড্রেসটা পরার পরেই ওর মনে হতো, ভালো করে পড়া বলতে হবে, স্যারেরা যেন পড়া করিসনির দলে ওকে না ফেলতে পারেন। সেই থেকেই নিজের সব ব্যাপারে দেবজিত বড্ড নিখুঁত।

এমনকি ওর ঘরটাকেও ও সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করে। ঈশার ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়, এলোমেলো অগোছালো একটা ব্যাচেলর মেয়ের ঘর। কিন্তু দেবজিতের বিছানার চাদর নিভাঁজ, টেবিলের বইপত্র গোছানো, ঘরের কোনো ফার্নিচারের ওপরে জমে নেই রোজকার আলগা ধুলোটুকুও।

বড্ড গোছানো দেবজিত। তাই বিকাশদার এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাত্র পঞ্চাশ জন দর্শকের সামনে হলেও দেবজিতের কাছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। হেঁড়ে গলায় বেতালা গান ও গাইতে পারবে না। এই কদিন নিজেকে তৈরি করতে হবে। আর নাহলে দর্শকাসন অলংকৃত করবে বরং। কিন্তু নিজেকে নিখুঁত ভাবে তৈরি না করে কিছুতেই মাইক ধরবে না ও। ছোটবেলায় মায়ের কাছেই ওরা দুই ভাইবোন কবিতা আবৃত্তি শিখত। দেবজিতের তখন ক্লাস নাইন, দুই ভাই বোনই একটা প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিল। ঈশা হয়েছিল ফার্স্ট আর দেবজিত থার্ড। সেদিনই দেবজিতের মনে হয়েছিল, মা বোধহয় ঈশাকে

একটু বেশিই যত্ন করে শিখিয়ে দিয়েছে। নাহলে ওর থেকে দুবছরের ছোট ঈশা কি করে ফার্স্ট প্রাইজটা ছিনিয়ে নিলো।

তখন থেকে ঈশা কবিতা বলতে গেলেও দেবজিত যায়নি। মা বারবার জিজ্ঞেস করায় একটাই উত্তর দিয়েছিল, আমি তোমার কাছে কবিতা শিখতে চাইনা, তুমি ঈশাকে বেশি যত্ন নিয়ে শেখাও, দুনম্বরি মানুষের কাছে আমি চাইনা শিখতে। স্তম্ভিত মা, ধীর পায়ে পিছু হটেছিল ওর ঘর থেকে। তারপর থেকে ঈশার বলা কবিতা শুনলেও নিজে আর কখনো করেনি। তবে ওটা ওর ভালোলাগার একটা জিনিস।

মনে মনে স্থির করলো দেবজিত, এই অনুষ্ঠানে ও একটা কবিতাই বলবে। কারোর সাহায্য ছাড়াই বলবে।

একা একাই নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে চেয়েছে ও। সেখানে রিনাদেবীর হস্তক্ষেপ ওর মোটেও পছন্দ নয়। তবুও কিছু ব্যাপারে নিতেই হয়েছে সাহায্য। আজও হয়। যেমন অফিসে আসার আগে মায়ের রান্না খাবার খেয়ে আসতে হয়, ওর জামা প্যান্ট ওয়াসিং মেশিনে মা-ই কেচে দেয়। নিঃস্পৃহভাবে রিনাদেবী করে সংসারের সব কাজ। আর তার থেকেও বেশি বিরক্ত হয়ে সেসব উপকার গ্রহণ করে দেবজিত।

মনের মধ্যে হালকাভাবে একটা প্রশ্নের আভাস ভেসে এলো। নিঃস্পৃহ ভাবে? নাকি একটু বেশিই যত্ন করে! কবে থেকে যে মায়ের সাথে দেবজিতের সম্পর্কটা এমন বরফ শীতল হয়ে গেল কে জানে!

ছোটবেলায় স্কুল থেকে ফিরে স্কুলের সব গল্প মাকে না বললে যেন ওর শান্তি হতো না। মা ওকে ভাত মেখে খাইয়ে দিত আর দেবজিত বকবক করে বলে যেত স্কুলের গল্প। দাদু, ঠাকুমা, বাবা, বোন কেউ না শুনতে চাইলেও মা সবটা শুনত চোখ বড় বড় করে, মাঝে মাঝে কৌতূহলের বশে প্রশ্নও করতো, তারপর?

ক্লাস টিচার ওই দুষ্টু ছেলেটাকে কতটা বকলো বল জিত?

দেবজিতও ততোধিক উৎসাহের সাথে বলতো ওর বীরপুরুষ হওয়ার কাহিনী। একমাত্র মায়ের কাছেই পেত সবরকম প্রশ্রয়। আবার দুষ্টুমি করলে বকুনি জুটতো কপালে। কবে যে ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি হলো মায়ের সাথে, কবে যে মাকে মনে মনে রিনাদেবী বলে ডাকতে শুরু করলো কে জানে। স্মৃতির খাতায় অকারণেই মুখ ডুবিয়ে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলো দেবজিত।

বেশ কিছু এলোমেলো ঘটনা প্রবাহ এসে উপস্থিত হলো ওর দৃষ্টিপথে। ছোটবেলায় দেবজিত চাইতো মাকে জড়িয়ে ধরে রাতে ঘুমাতে। মাও তাই চাইতো। সন্ধ্যে থেকেই দুজনের চোখের ইশারায় রাতের গল্পের বুনন তৈরি হতো। ওদের একটা অলিখিত চুক্তি ছিল। যেটা বাড়ির আর কেউ জানতো না। এমনকি পাশে শুয়ে বাবাও বুঝতে পারতো না। ওদের ওই চুক্তিতে বলা ছিল, একদিন মা গল্প বলবে একদিন জিত।

মায়ের তো গল্পের অনেক স্টক। কিন্তু জিতও হারতে চায় না। তাই স্কুলের পড়ার পরে গল্পের বই নিয়ে বসে

যেত। মায়ের চোখের আড়ালে দাদুর ঘরে তাড়াতাড়ি পড়ে নিত ঈশপের কোনো গল্প অথবা আরব্য রজনী। রাতে সেটাই মায়ের কানের কাছে ফিসফিস করে বলতো দেবজিত।

মা অবাক হয়ে শুনত আর বলতো আস্তে বলবি, বাবা সারাদিন খেটে খুটে আসে তো, ঘুম যেন না ভেঙে যায়।

বাবার নাকি নিশ্চিত ঘুমের দরকার। দেবজিতের ছোট্ট মনে প্রশ্ন জাগত, কেন? মা তো সারাদিন বাড়িতে এত কাজ করে তাহলে ঠাকুমা কেন বলে, তোর বাবাকে সেই কোন সকালে উঠে বেরোতে হয়। সারাদিন কত পরিশ্রম করতে হয়। বাবা তাই নটার মধ্যেই খেয়ে নিয়ে বিছানায় চলে যেত। দেবজিত আর ঈশাও বাবা ঘরে ঢুকলেই শান্ত হয়ে যেত। মা তারও ঘন্টা দুয়েক পরে ঘুমাতে পেতো।

সব ঘরে জলের বোতল দিয়ে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে, ঈশা, দেবজিতের স্কুলের ব্যাগ গুছিয়ে, ড্রেস রেডি করে, দাদুর ওষুধ দিয়ে তবে মা এসে শুতো। ঈশা বরাবরই দাদু ঠাকুমার ঘরে ঘুমাতে যেত কিন্তু দেবজিত ঘুমঘুম চোখে অপেক্ষা করতো মায়ের জন্য।

মা ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিত। তখনই দেবজিত বলতো, মা গল্প বলো!

মা ওকে জড়িয়ে ধরে বাবার ঘুম না ভাঙিয়ে অত্যন্ত সচেতন ভাবে বলতো রাজা রানী আর রাজকুমারীর গল্প। বেশির ভাগ দিন গল্প শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে যেত দেবজিত। আবার সকালে মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে দেখতো, বাবা অফিসের জন্য রেডি হচ্ছে। আর মা

রান্নাঘরে ছুটো ছুটি করছে। বাবার ভাত, দুপুরের টিফিন সব করতো। দেবজিত ভাবত মা কি রাতে ঘুমায় না?

দেবজিত ঘুমিয়ে গেলেই কি মা ওর পাশ থেকে উঠে চলে যায় রান্নাঘরে! প্রশ্নগুলো ছোট্ট মাথায় যখন নড়াচড়া করতো তখন ঠাকুমা বলতো, দাদুভাই তুমিও এবার থেকে ঈশার মত আমার কাছে শুয়ে পড়বে। আমাদের ঘরে কত বড় খাট বলতো!

দেবজিত ঘাড় নেড়ে বলতো, কিছুতেই না। পিটপিট করে তাকাত মায়ের দিকে। মা হালকা গলায় বলতো, থাক না মা, আপনার ছেলের ঘুমের ব্যাঘাত তো আমি বা জিত কেউই ঘটাইনি, তাহলে থাক না!

ঠাকুমা বেশ কঠিন স্বরে বলতো, মনি আমায় বলেছে ওর অসুবিধা হয়। মা আর কিছু বলেনি ঠাকুমার মুখের ওপর। দেবজিতের রাতে ঘুমের জায়গা আলাদা হয়েছিল। মা নির্লিপ্ত ভাবে মেনেও নিয়েছিল ঠাকুমার কথাগুলো। মনে মনে একরাশ ঘৃণা জন্মেছিল দেবজিতের যখন স্কুলের বন্ধু রণদেব বলেছিল, আরে বোকা, তোর বাবা মা একসাথে প্রেম করবে বলেই না তোকে সরিয়ে দিল! দেবজিত মৃদু গলায় প্রতিবাদ করে বলেছিল, কিন্তু বাবা তো ঘুমিয়ে পড়ে। মা একাই জেগে থাকে। রণদেব হেসে বলেছিল, তুই হলি বুদ্ধু। ক্লাস সিক্সের দেবজিতের মনে অনেকটা কষ্ট জমেছিল। ঠাকুমার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, আচ্ছা ঠাকুমা, বাবা, মা দুজনেই কি চায় আমি ঐ ঘরে আর না ঘুমাই?

ঠাকুমা জিতের গায়ে ঢাকাটা টেনে দিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ রে পাগল দুজনেই চায়। মুখোশ পরা মাকে সেদিন থেকেই মনে মনে রিনাদেবী বলে ডাকতে শুরু করেছিল জিত।

আড়ালে জিতকে মা বলেছিল, দাঁড়া না দুদিন পরেই ঠাম্মার কাছ থেকে আমি তোকে আমার ঘরে নিয়ে আসবো, আবার শুরু হবে আমাদের গল্পের ঝুলি, জিতও আশায় দিন গুনছিলো, অথচ বাবার সাথে মাও নাকি ঠাম্মাকে বলেছে, জিত ওঘরে থাকলে মায়েরও অসুবিধা হয়, মুহূর্তে বড় হয়ে গিয়েছিল জিত, স্কুলের রণদেবের যুক্তিগুলো আর ঠাম্মার বলা আপাত নিরীহ কথাগুলো নিজের মত করে সাজিয়ে চিনতে পেরেছিল মায়ের আসল মুখোশটা, মা ডাকটাতেই কাঠিন্য এসেছিল।

আচমকা একদিন জিত বলে বসেছিলো, মা আর আমাদের গল্পের ঝুলি খোলার দরকার নেই, তুমি বরং বাবার সাথেই গল্প করো, আমি বোন আর ঠাম্মার সাথেই থাকবো। মায়ের চোখে কি অসহায় একটা নীল কষ্ট দেখেছিলো সেদিন! আক্রোশে সেই কষ্টটুকুকে প্রবল উত্তেজনায় উপভোগ করেছিল জিত।

এমন অনেক টুকরো টুকরো ঘটনার সমাহারই মাকে রিনাদেবী বা ভদ্রমহিলা বলতে বাধ্য করেছিল জিতকে। মাও আর জোর করে মুঠো শক্ত করে ধরে রাখতে চায়নি জিতকে। নিঃস্পৃহ ভাবে ছেড়ে দিয়েছিল সন্তানের প্রতি মায়ের স্বাভাবিক অধিকারটুকুও।

ঠাম্মার মারাত্মক প্রভাবেই বড় হচ্ছিল দেবজিত আর ঈশা। শুধু ওই ভদ্রমহিলা রুটিন মিলিয়ে ওদের স্কুলের

ব্যাগ গুছিয়ে দিত, গরম ভাত বেড়ে দিত। কার কি পছন্দের তরকারি না বলতেও সেটা পাতে পড়তো এসে। মাঝে মাঝে হালছাড়া গলায় জিজ্ঞেস করতো, তোদের তো সামনেই এক্সাম, সন্ধেবেলা টিভির সামনে কেন বসেছিস!

ঈশা আর দেবজিতকে কষ্ট করে কিছু উত্তর দিতে হতো না। ঠাম্মা, দাদু কিংবা বাবা বিরক্ত হয়ে বলতো, একটু টিভি দেখলে কেউ জাহান্নামে যায় না। তোমায় চিন্তা করতে হবে না। মাও চিন্তা বাদ দিয়ে লেগে যেত সংসারের কাজে। দেবজিতের খুব ইচ্ছে হতো মা বকেঝকে আগের মত জোর করে ওকে পড়তে বসাক কিন্তু মা নির্লিপ্ত পায়ে গ্যাসে চায়ের জল বসাত। দূরে সরে যাচ্ছিল ওর চেনা মা টা।

মায়ের গায়ের মা মা গন্ধটা কেমন যেন অপরিচিত হয়ে যাচ্ছিল ওর কাছে। উৎকট হয়ে ধরা পড়ছিল রিনাদেবীর নিঃস্পৃহতা। দেবজিতও নিজের জগতে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। পড়াশোনা, স্কুলের হোমওয়ার্ক, খেলার মাঠ, নতুন পাওয়া বন্ধুত্বের স্বাদে রিনাদেবীর নাক গলানো একেবারেই না পসন্দ হয়ে উঠেছিল ওর। বরং টিফিন বক্সের বেশি যত্নই যেন অসহ্য হয়ে উঠছিল ক্রমে। দু হাত আর একটা ছোট্ট মন দিয়ে যতটা পারছিল দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল ওই মহিলাকে।

রিতেশদা টেবিলে ফাইলটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার দেবজিত, কি এত ভাবছো ভায়া?

স্মৃতির সারণী বেয়ে অনেকটা পথ পিছনে চলে গিয়েছিল দেবজিত। রিতেশদার ডাকে ফিরে এলো বর্তমানে। ধুর, কি সব ভাবছে। দেবজিত আবার কবে থেকে ওই ব্যক্তিত্বহীন মহিলাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলো! ভীষণ ভাবে সাকসেসফুল ও নিজের জীবনে, তাই আত্মবিশ্বাসে কোনোদিন ফাটল ধরতে দেবে না ও। ফাইলটা টেনে নিয়ে কাজে মন দিলো দেবজিত।

।। ৪ ।।

যত দিন যাচ্ছে রিনার সাথে বাস করাটা যেন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। বরফের মত শীতল মুখে অনুভূতিশূন্য চোখে ঘরের কাজ করে চলেছে। এর থেকে যদি দুটো ঝগড়া করতো, যদি দুটো গালমন্দ করতো তবুও বোধহয় মনে হত একটা মানুষের সাথে বাস করছে মনীন্দ্র। বিয়ের পর পর তো প্রায়ই নিজের মতামত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উঠেপড়ে লাগতো রিনা। ঈশা, দেবজিত হওয়ার পরেও প্রায়ই ঝামেলা লাগতো মনীন্দ্রর সাথে। কখনো ছেলেমেয়েদের কেন্দ্র করে, কখনো সংসারের খুঁটিনাটি। ইদানিং তো মনে হয় একটা রোবটের সাথে ঘর শেয়ার করছে ও। না রোবটেরও বোধহয় যান্ত্রিক আওয়াজ হয় একটা, কিন্তু রিনার ঠোঁট দুটো যেন কেউ ফেবিকল দিয়ে এঁটে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে ওকে দেখে অবাক লাগে মনীন্দ্রর। এই সেই কলেজের কমলিকা দাসগুপ্ত, যাকে দেখে মনীন্দ্রর মনে হয়েছিল এক ঝলক উষ্ণ বাতাস। কনকনে শীতে

ভীষণ আরামদায়ক। কিন্তু তীব্র গরমে পুড়িয়ে দেবে নির্ঘাত।

বিজয়বিহারী কলেজের গায়েই মনীন্দ্রর অফিস। মনীন্দ্র তখন সদ্য জয়েন করেছে চাকরিতে। প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি, মাইনে বেশি দিলেও সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত খাটিয়ে নিত। বাড়ি থেকে ভোর ভোর উঠে নাকে মুখে গুঁজেই ছুটতে হত। বাবার ব্যবসায় ভরাডুবি হবার পরেই তড়িঘড়ি চাকরিতে ঢুকেছিলো মনীন্দ্র।

তাই হয়তো সেন পরিবার সামলে নিয়েছিল ব্যবসায় ভরাডুবি হবার ঝড় ঝাপটাটা। মনীন্দ্রর মাইনের টাকাতেই বিয়ে দিয়েছিল বোনের। অল্প বয়েস থেকেই সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে দায়িত্ব ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে জীবনটা শুরু করেছিল মনীন্দ্র। সেখানে কমলিকা যেন এক ঝলক টাটকা বেলফুলের সুবাস।

সত্যি বলতে কি মনীন্দ্র হিংসা করতো কমলিকার মত জীবনযাত্রা করা মেয়েদের। পৃথিবীর কোনো জটিলতা যার জীবনে প্রবেশ করেনি। হালকা পালকের মত অকারণেই উড়ছে, কারণবিহীন কারণে হেসে উঠছে উচ্ছল ঝর্ণার মত। একদল রঙিন প্রজাপতিকে রোজ দেখতো মনীন্দ্র অফিসের চেয়ারে বসে। তারমধ্যে সব থেকে আকর্ষণীয়া ছিল কমলিকা। দীঘল চোখে মায়াবী স্বপ্ন আঁকা, কাজলের টানে উড়ো মেঘের উদাসীনতা। হালকা রঙের চুড়িদার, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। দুই ভ্রুর মাঝে ছোট্ট একটা কালো টিপ। ওই মেয়েকে নজর লাগা থেকে আটকাতে টিপের প্রচেষ্টা জারি থাকতো সব সময়।

কমলিকার দিকে তাকালেই টিপটাতে চোখ আটকে যেত। ভেজা ঠোঁটে হালকা পিঙ্ক লিপস্টিক। অল্প সাজেই বড্ড নিখুঁত। ভগবান একচোখমী করেই গড়েছিলো কমলিকাকে, আরেকটু কম সুন্দর হলেও চলতো। অফিসের হাজার কাজের ফাঁকেও ওর কলেজ আসার সময়টুকু নানা আছিলায় জানালার ধারে দাঁড়াতো মনীন্দ্র। ওই এক পলক দেখার সুখটুকুই ছিল ওর একঘেয়ে জীবনের এক মুঠো বাতাস।

নিঃশ্বাস নেবার জন্য নয় এক্সট্রা অক্সিজেনের জন্যই প্রয়োজন ছিল মুহূর্ত চাউনির। যদিও কমলিকা কখনো দোতলার অফিসের জানালার দিকে তাকিয়েও দেখতো না। জানতই না কেউ তার আসা যাওয়ার সময় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে প্রতিটা পল। যেদিন কোনো কারণে কলেজ ছুটি থাকতো বা কলেজে আসতো না কমলিকা সেদিন হালকা মনখারাপ ছেয়ে রাখতো মনীন্দ্রর মনটাকে। আবার যখনই কমলিকাকে দেখতো মনীন্দ্র, তখনই ওর হাতের মুঠো শক্ত হয়ে যেত। অসহ্য অবুঝ রাগে শিরা উপাশিরার রক্তরা হত দ্রুতগামী। কি সুন্দর মিষ্টি একটা জীবন। বসন্ত বাতাসে ভেসে বেড়ানো রূপকথার পরী যেন। মনীন্দ্রর মনে হত কমলিকার ঘাড় ধরে ওর রোজকার রুটিনটা দেখাতে, বোঝাতে চাইতো জীবন কার নাম। দায়িত্ব শব্দের মানে কি। এক ঝলক হাসি, একটুকরো অহংকারী দৃষ্টি আর রঙিন পোশাকের সমারোহ মানেই জীবন নয়। না পাওয়া শব্দটা বোধহয় কমলিকার নিজস্ব ডিকশনারিতে ছিলই না। নামটা অবশ্য

তখন মনীন্দ্র জানতো না। শুধু হরিণ চোখের মেয়েটাকে দেখতো রাস্তায়, কলেজ যাওয়ার পথে। সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবে ভাবে নি কোনোদিন। ভালোলাগার সাথে মারাত্মক আক্রোশ ছিল কমলিকাদের বন্ধু গ্রুপটার প্রতি। দেখেই বোঝা যেত সবাই বেশ অবস্থাপন্ন বাড়ির আদুরে ছেলেমেয়ে। এদের অন্তত দিনের শেষে মাসকাবারের হিসেব নিয়ে বসতে হয়না। বাবার অসহায় চাউনির দিকে তাকিয়ে বলতে হয়না, সামলে নেব।

ব্যবসায় ভরাডুবি হবার পর থেকেই বাবা একটু খিটখিটে আর অবুঝ হয়ে গিয়েছিল। সকলকেই চিটার মনে করতো। গোটা সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে স্বপ্নবিহীন দুটো চোখে হিসেব কষে কষে এগোচ্ছিল মনীন্দ্র।

তাই কমলিকাদের অকারণ হাসির শব্দ শুনলেই মনে হত, সারাজীবনের জন্য মুছে দিতে হবে ওদের হাসি।

যদিও জানতো ওই মেয়ের সামনে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কোনো দিনই মনীন্দ্র জোগাড় করতে পারবে না। দূর থেকে দেখা ছাড়া বিশেষ কিছু পাবার আশাও করেনি কোনোদিন। তবে মাঝে মাঝে ভিখিরীরও কোটি টাকার লটারি লাগে। ভাগ্যের চাকা আচমকা হিসেব না কষেই ঘুরে যায় বেনিয়মের ঘরে। তেমনই কোনো আয়োজন ছাড়াই কমলিকার সাথে পরিচয় হয়েছিল মনীন্দ্রর। এতটাই আকস্মিকভাবে ঘটেছিল পরিচয় মুহূর্তটা যে মনীন্দ্র সময় পায়নি নিজেকে গোছানোর। ওদের অফিসের বিশাখাদি সাংস্কৃতিকমনস্ক

একজন মানুষ। তার উদ্যোগেই অফিসের জনা পাঁচেক বিজয়বিহারী কলেজের সোশ্যাল ফাংশনে উপস্থিত হয়েছিল। সেখানেই কাছ থেকে দেখেছিলো কমলিকা দাসগুপ্তকে।

একটা নীলচে শাড়িতে গোটা আকাশকে শরীরে জড়িয়ে কালপুরুষকে নিজের শাসনে রেখে মাটিতে পা ফেলে হাঁটছিল মেয়েটা।

চোখের তারায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের রহস্যময়তা। ঠোঁটের হাসিতে নীহারিকার দাম্ভিকতা। ওরা পাঁচজন সামনের সারিতে বসেছিলো। বিশাখাদির সাথে পরিচয় ছিল কলেজের কোনো এক ইউনিয়ন লিডারের। তার দাক্ষিণ্যেই সামনের সারিতে বসতে পেরেছিল ওরা।

ঘোষক একটি হলদে পাঞ্জাবি পরা ছেলে। বছর একুশের ছেলেটা নিজেকে আইনস্টাইনের ভায়রাভাই মনে করেছিল মাইক হাতে। মনীন্দ্রর রাগে মুঠো শক্ত হচ্ছিল। কমলিকা ছেলেটার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে কিছু বলছিলো। ছেলেটিও সমর্থনে ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছিল। এই সব বড়লোকের ছেলেমেয়েগুলো মনে করে গোটা দুনিয়াটা এদের ইশারায় নাচবে। ফাঁকা মঞ্চে ছেলেটার পদসঞ্চলনা বলে দিচ্ছিল, ছেলেটা ভীষণ অহংকারী। জীবনে কোনোদিন না শব্দটা শোনেনি। বেশ কিছুক্ষণ মাইক টেস্ট করার পর অনুষ্ঠান শুরু হলো।

বেশিরভাগই ইচড়ে পক্ক ছেলেমেয়ে। গিটার বাজিয়ে বেসুরো গান গাইছিল মাথা ঝাঁকিয়ে। শ্রোতাদের কেমন লাগছে সেটুকু জানার প্রয়োজনও নেই, নিজেরাই

নিজেদের গানের সম্পর্কে বড্ড বেশি গুনগান করছিল। অসহ্য রকম বিরক্তিতে ভরে গিয়েছিল মনীন্দ্রর মনটা। ধুর, সন্ধেটা নষ্ট হলো বিশাখাদির পাল্লায় পড়ে।

মনটা যখন তিক্ততায় ভরে গিয়েছিল তখনই অ্যানাউন্স হয়েছিল, এবারে আপনাদের সামনে কবিতাবৃত্তি করবে কমলিকা দাসগুপ্ত।

ধীর পায়ে মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা। যাকে অফিসের জানালা থেকে একবার দেখার জন্য আকুল হয়ে তাকিয়ে থাকে মনীন্দ্র। মনে হয় যেন দলছুট রূপকথার রাজকন্যা হাঁটছে রাজপথে।

এতদিনে মেয়েটার নাম জানলো মনীন্দ্র। কমলিকা দাসগুপ্ত।

স্টেজে উঠেই একটু ঝুঁকে নমস্কারের ভঙ্গিমা করে শুরু করলো কবিতা বলা।

মনীন্দ্র গানের ভক্ত, একঘেয়ে কবিতা পাঠ ওর নাপসন্দ। কিন্তু কমলিকা যখন বলছিলো,

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী,
তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম,
আমি ধন্যি!
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন
আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক'রে
দেখা অনুখণ,

আমি চপল মেয়ের ভালবাসা, তা'র কাঁকন
চুড়ির কনকন
আমি চির-শিশু,
চির-কিশোর
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি..
নিচোর..!

তখন মনীন্দ্রর রোমকূপে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। সাধারণত বিদ্রোহী কবিতাটা ছেলেদের কণ্ঠেই শুনেছে মনীন্দ্র। তাই ধারণাই ছিল না, মেয়েদের নরম গলায় এই কবিতার প্রতিটি অক্ষর শ্রোতাদের স্পর্শ করতে পারবে। গোটা হলে পিন ড্রপ সাইলেন্স। কমলিকার দুচোখে জল। গলায় কাঁপন, দৃপ্ত কণ্ঠে বলে চলেছে—

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল,
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না -
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি আমি সেই দিন হব শান্ত!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু,
ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা
খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব-ভিন্ন!

আমি বিদ্রোহী ভৃগু,
ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

বেশ কয়েকটা কবিতা পর পর বলার পরে কমলিকা মঞ্চ ছাড়ল। মন্ত্রমুগ্ধের মত নিজের চেয়ার ছেড়ে গ্রীনরুমের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল মনীন্দ্র।

নিজের অবস্থানের কথা না ভেবেই উপস্থিত হয়েছিল কমলিকার সামনে। আচমকা আবেগতাড়িত হয়ে বলেছিল, ধন্য আপনার কবিতাবৃত্তি। কয়েকটা আবেগহীন শুষ্ক শব্দকে নিজের অনুভূতি দিয়ে বাঁচিয়ে তুললেন আপনি! এখনও ঘোর কাটেনি আমার।

কমলিকা লজ্জিত গলায় বলেছিল, আপনার ভালো লেগেছে? শুনে খুশি হলাম, সকলে বলে কবিতা নাকি আমার রক্তে, আমার মামা, মা সবাই ভালো কবিতা বলে, তাই এই একটা জিনিসই আমি পারি বিনাপরিশ্রমে।

মনীন্দ্র বলেছিল, জানিনা কি করে বোঝাবো আমার ভালোলাগা, তবে শুধু এটুকুই বলবো, জীবনে কখনো কোনো পরিস্থিতিতে কবিতার সাথে আড়ি করবেন না, তাহলে হয়তো থমকে যাবে আপনার জীবনের ছন্দ।

কমলিকা চোখ নিচু করে লাজুক গলায় বলেছিল, আরেকটু অপেক্ষা করুন, আমার একটা শ্রুতি নাটক আছে

মিনিট কুড়ি পরে।

মনীন্দ্র তখনও আপ্লুত গলায় বলেছিল, তার আগে কথা দিন, আপনার যেখানেই প্রোগ্রাম থাকবে একবার অন্তত এই অধমকে খবর দেবেন, আপনাদের কলেজ ক্যাম্পাসের গায়েই এই অর্বাচীনের অফিস।

নাম মনীন্দ্র সেন, ছাপোষা কেরানী, কিন্তু স্বপ্ন দেখে আকাশ ছোঁয়ার। না না, আপনার মত রূপকথার রাজকন্যাদের সে দূর থেকেই দেখতে ভালোবাসে, তাই বদ উদ্দেশ্য আছে ভাববেন না যেন।

কমলিকা একটু অস্বস্তিতে পড়েই বলেছিল, পরিচয় হয়ে ভালো লাগলো। মনীন্দ্র ফিরে এসে বসেছিলো নিজের চেয়ারে, বিশাখাদি বলছিলো, সত্যিই মেয়েটা জাস্ট ফাটিয়ে দিলো, এতক্ষণে বিরক্তিকর অনুষ্ঠানটাকে অন্য মাত্রা দিয়ে দিল, না এলে খুব মিস করতাম বুঝলে মনীন্দ্র।

মনীন্দ্র তখন নিজের রাজ্য থেকে অনেক দূরে, হালকা পালকের সাথে পাল্লা দিয়ে ভাসছিল।

ততক্ষণে শুরু হয়েছিল কমলিকা দাসগুপ্ত পরিচালিত এবং অভিনীত শ্রুতি নাটক। ফিমেল চরিত্র একা কমলিকা। আর তিনজন পুরুষ চরিত্রে ছিল দুজন লেকচারার আর একজন স্টুডেন্ট।

মনীন্দ্র কমলিকার স্বামীর চরিত্রে বসে থাকা সুপুরুষ প্রফেসরকে দেখছিলো। যেন দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের দুজন মানুষ তাদের চাওয়া পাওয়া ভাগ করে নিচ্ছে পুরোনো বন্ধুদের সাথে। সাবলীল কমলিকা, গলায় এতটুকু

জড়তা নেই। প্রফেসরও অদ্ভুত দক্ষতায় পাল্লা দিচ্ছিলেন কমলিকার সাথে।

নাটকের শেষের দিকে মনীন্দ্রর অকারণ ক্রোধটা বেশ জমিয়ে বসেছিলো। পাশাপাশি অনেকের ফিসফিস কথা কানে আসছিল মনীন্দ্রর। কি দারুণ মানিয়েছে দুজনকে।

মনীন্দ্র বুঝতে পারছিল একটু আগের ও ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছিল। খুব ইচ্ছে করছিল স্টেজে উঠে গিয়ে সকলের সামনে দিয়ে কমলিকাকে টেনে হিজড়ে নামিয়ে আনে বাস্তবের মাটিতে। মঞ্চের ওই স্বামী স্ত্রীর আদর আদর অভিমানী নাটকের সমাপ্তি ঘটুক মুহূর্তে।

মাথা চাড়া দিচ্ছিল ওর অদ্ভুত রোগটা। বাধ্য হয়ে নিজেকে কন্ট্রোল করে নাটকের শেষ পথেই ও উঠে পালিয়ে এসেছিল। খোলা হাওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ পায়চারি করেছিল। রগের পাশের দপদপে যন্ত্রণাটা কমে এসেছিল যখন, তখনই আবার শুনতে পেয়েছিলো কমলিকার উচ্ছ্বাস হাসির আওয়াজ। কয়েকটা বন্ধু আর সেই প্রফেসরের সাথে কলেজের গেট দিয়ে বেরোনোর সময় বলছিলো, পরের বার আরেকটু সিরিয়াস নাটক করবো স্যার। প্রফেসর আলগা হাসির ছলে বলছিলেন, তোমরা করো, আমি কেন প্রতিবার!

মনীন্দ্র শুকনো মাটিতে নিজের জুতোটা ঠুকেছিলো অসহায় রাগে। কমলিকার মত মেয়েদের দূর থেকে দেখা যায়, সামনে গিয়ে কবিতার প্রশংসা করা যায়, মনে মনে কল্পনার জাল বোনা যায় কিন্তু এদের ধরা যায়না ওর মত কেরানীর জীবন দিয়ে। তবুও সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করেছিল, ভেঙে দেবে কমলিকার স্বপ্নগুলো। শুধু বুঝতে পারেনি কিভাবে ওই রূপকথার রাজকন্যার কাছাকাছি হবে!

।। ৫ ।।

ইশা একটু ভয়ে ভয়েই ফ্লোরে ঢুকলো, প্রবুদ্ধ বলেছিল মিস্টার অর্কপ্রভ ব্যানার্জী নাকি পরিচালক হিসেবে যতটা সাকসেসফুল মানুষ হিসাবে ততটাই মুডি। ইন্ডাস্ট্রিতে নাকি ওনার আড়ালে লোকজন বলে, আবহাওয়া দপ্তরও দামি দামি রাডার বসিয়েও ধরতে পারবেন না ওনার মনের পরিবর্তন। এই কোনো আর্টিস্টকে জড়িয়ে ধরে উৎসাহ দিচ্ছেন তার ভালো কাজের জন্য আবার কখনো কোনো আর্টিস্টকে দূর দূর করে বের করে দিচ্ছেন ফ্লোর থেকে। এতটাই খুঁতখুঁতে পরিচালক যে হঠাৎ পুরো টিমকে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন কোনো পুরোনো বাড়ির সামনে। তারপর আচমকা সেই বাড়িতে ঢুকে তাদের ফ্যামিলির মেম্বারদের বলেন, মুভিতে অভিনয় করতে হবে। যে যেভাবে আছেন সেই ভাবেই কাজ করতে থাকুন, আমি শ্যুট করে নেব। একবারও ভাববেন না আপনাদের পিছনে ক্যামেরা চলছে। আপনারা স্বাভাবিক ভাবে দৈনন্দিন কাজকর্ম করুন। এভাবেই তিনি শ্যুট করেন মধ্যবিত্ত সংসারের খুঁটিনাটি।

ভরা কলেজের লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন ফিল্মের নায়িকাকে। পাশাপাশি সবাইকে বেশ জোর গলায় বলেন, প্লিজ নরম্যাল বিহেভ করুন। তাই হয়তো ওনার বানানো ফিল্মগুলো পুরস্কৃত হয়।

মেকআপ বিহীন, সাধারণ অভিনয়ের মধ্যেও ফুটিয়ে তোলেন অসাধারণ কিছু। এই সন্ধ্যারাগ মুভিটাতেও ওনার নায়িকা বৃষ্টিমুখর সন্ধেতে একা একা আনমনে বলে যাবে বেশ কিছু কবিতা। হঠাৎই নায়কের প্রবেশ। সেই জন্যই ঈশার বলা কবিতাগুলো রেকর্ড করবেন উনি। ঈশা সবার কথা শুনে বেশ ভয়ে ভয়েই ঢুকেছিলো স্টুডিও ফ্লোরে। অলরেডি ওনার নায়িকা উপস্থিত। বোধহয় লিপ মেলানো অভ্যেস করাবেন বলেই নায়িকাকে নিয়ে এসেছেন।

ঈশাকে দেখেই অর্কপ্রভ বললেন, মিস ঈশা আপনি পাক্কা আটমিনিট লেট। আমার ফ্লোরে কেউ লেটে আসার সাহস পায়না। কারণ আমি তাকে বাতিল করি।

তবে আপনি প্রবুদ্ধবাবুর পরিচিতা বলেই সুযোগটা দিলাম। কেন জানিনা, প্রবুদ্ধবাবু মানুষটাকে আমার বেশ অন্যরকম লেগেছে। ধরা ছোঁয়ার মধ্যে থেকেও ভীষণ রকমের আলাদা।

যাইহোক, শুরু করা যাক।

রেকর্ডিং রুমে নিয়ে যাওয়া হলো ঈশাকে। কাঁচের ঘরের স্বচ্ছ দেওয়াল দিয়ে ঈশা দেখছিল অল্পবয়সী পরিচালককে। ওনার পার্সোনালিটি প্রত্যেকের নজর কেড়ে নিতে বাধ্য। সাথে ব্যারিটন ভয়েসের নির্দেশ না মেনে কারোর উপায় নেই। ঈশা প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ে গেলো। বলতে গেলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। প্রবুদ্ধর সাথে এতদিনের সম্পর্কে কখনো তো এমন অনুভূতি হয়নি। ওর দিকে তো কখনো এমন বিহ্বলের মত তাকিয়ে থাকে নি ঈশা। প্রবুদ্ধ ওকে ভীষণ

ভালোবাসে, ঈশাও হয়তো বাসে কিন্তু অর্কপ্রভর উপস্থিতি ওর শরীরে অন্য একটা অনুভূতির জন্ম দিচ্ছে। এই অদ্ভুত উপলব্ধির সঙ্গে ও পরিচিত হয়নি এর আগে। মনের মধ্যে অজানা একটা সুরের অনুরণন। সেই সুরের তাল লয় হয়তো সঠিক নয়, তবুও সে বেজেই চলছে আপন মনে।

অর্কপ্রভ কাঁচের দেওয়ালের ওপ্রান্ত থেকে ইশারা করলো ঈশাকে, ঈশা যেন যন্ত্রচালিত পুতুল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত বলতে শুরু করলো কবিতার লাইনগুলো। কবিতা দুটো অর্কই সিলেক্ট করে দিয়েছে।

হঠাৎ দেখার মুহূর্তদের
মুঠোবন্দি করে রাখতে চাই।
দিনলিপির খাতায় ওই দিনটাকে
লাল কালিতে চিহ্নিত করে রাখতে চাই।
হারিয়ে যাওয়ার আগে
আবার ফিরে পেতে চাই।
বৃষ্টিভেজা একটা সন্ধে
কাটাতে চাই তোমার সাথে।

ঈশার গালদুটো অকারণেই রক্তাভ হয়ে যাচ্ছিল। অর্কর নায়িকার বলা কবিতার লাইনগুলো যে ওর নিজের মনের কথা সেটা বেশ বুঝতে পারছিল ঈশা। আর সেই কারণেই মনের সবটুকু অনুভূতি নিঃশেষ করে, গলার সবটুকু আবেগে ভাসিয়ে ও বলছিলো অর্কর লেখা কবিতাগুলোর প্রতিটি কালো অক্ষর। ওর চোখের সামনের ওই কালো

অক্ষরগুলো যেন আচমকা বসন্ত বাতাসের স্পর্শে রঙিন হয়ে উঠেছিল।

রেকর্ডিং শেষ হতেই অর্ক এসে ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল, মাইন্ড ব্লোয়িং। ইউ আর জাস্ট গড গিফটেড। অর্কর ছোঁয়ায় আমূল কেঁপে উঠলো ঈশা। থরথর করে কাঁপছিল ওর গোলাপি ঠোঁট দুটো।

সেদিকে অপলক তাকিয়ে অর্ক বললো, হবে আমার নেক্সট ফিল্মের নায়িকা? যে নায়িকা কথাগুলো বলবে কবিতার ঢঙে, প্রতিটা শব্দে মিশিয়ে দেবে এক মুঠো আবেগ? হবে ঈশা আমার নেক্সট ফিল্মের নায়িকা?

ঈশার মনে হচ্ছিল ও বোধহয় স্বপ্ন দেখছে। কি সব বলছে অর্ক! ও নাকি নায়িকা হবে! কিছুতেই সুখী সুখী এই স্বপ্নটা থেকে বেরোতে ইচ্ছে করছিল না ঈশার। মনে হচ্ছিলো আরও কিছুক্ষণ অর্ক ছুঁয়ে থাকুক ওকে। আরো কিছু এলোমেলো কথা বলুক ওর সাথে। নরম উষ্ণতায় পুড়তে চাইছিলো ঈশার মন।

অর্ক বললো, ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশনের শো রুমে গিয়ে দেখছি আমার লাভই হলো, প্রবুদ্ধ খাঁটি হীরা দিলো, এর জন্য অবশ্যই প্রবুদ্ধকে থ্যাংকস জানাতে হবে।

অর্কর মুখে প্রবুদ্ধর নামটা শুনেই সম্বিৎ ফিরল ঈশার, অর্ক ওকে বোধহয় প্রবুদ্ধর বাগদত্তা হিসেবেই জানে। প্রবুদ্ধ তো দেশশুদ্ধু লোকজনকে ঈশার পরিচয় দেয় ওর উডবি বলে। এতদিন পর্যন্ত ঈশার সেটা বেশ ভালোই লাগছিলো। কিন্তু এখন কেমন যেন বিরক্তিতে ভরে গেল

মনটা। অর্কর কাছে ও প্রবুদ্ধর উডবির পরিচয়ে থাকতে চায় না। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে ঈশা বললো, হ্যাঁ প্রবুদ্ধ আমার খুব ভালো বন্ধু, ওর জন্যই আপনার সাথে আমার আলাপ হলো, ইনফ্যাক্ট আপনার মত একজন গুণী মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পারলাম।

অর্কর ভ্রুর মাঝে হালকা ভাঁজ, ঠোঁটের ফাঁকে বিস্ময় নিয়েই বললো, তবে যে প্রবুদ্ধ বলেছিল তুমি ওর উডবি!

ঈশা কাঁধের ব্যাগটা ঠিক করে নিয়ে বললো, সেটা তার ভাবনাচিন্তার দৈন্যতা। বন্ধুত্বটাকে যদি কেউ অন্য সম্পর্কে রূপান্তরিত করতে চায় তবে আমি তো বলবো, সেটা ধ্রুবতারার দোষ নয়, বরং নাবিকের ব্যর্থতা।

অর্ক হালকা হেসে বললো, বেশ বললে তো।

রাস্তায় বেরোতেই প্রবুদ্ধর ফোন। কি গো, এতক্ষণ চললো রেকর্ডিং, ফোনটা অফ ছিল বলে আরও টেনশন করছিলাম আমি, কাজে মন বসছিলো না, ভাবছিলাম, কি জানি পাগলীটা কি করছে?

ঈশা অর্কপ্রভ আর প্রবুদ্ধকে পাশাপাশি দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে তীক্ষ্ন নজরে দেখছিলো। চোখের সামনে দেখতে পেলো প্রবুদ্ধর পাল্লাটা নেমে গেছে বেশ কিছুটা নীচে। অর্ক কোনো চেষ্টা না করেই শুধু ওর পার্সোনালিটির জোরে ঈশার মনের গোপন কুঠুরির দরজায় করাঘাত করতে শুরু করেছে প্রথম দর্শনেই।

প্রবুদ্ধ বললো, আমি আসছি গাড়ি নিয়ে, তুমি একটু ওয়েট করো।

ঈশার একেবারেই ইচ্ছে করছিল না এখন প্রবুদ্ধর সাথে ফিরতে। বারবার মনে হচ্ছিল একটু একা থাকতে, একটু একটু করে উপভোগ করতে অর্কর সাথে দেখা হওয়ার মুহূর্তগুলোকে। তাই কোনোমতে নিজেকে সামলে ঈশা বললো, না না প্রবুদ্ধ, আমি আলরেডি উবের বুক করে ফেলেছি, একবার ইউনিভার্সিটি হয়ে ফিরবো।

ঈশার গলার স্বরে হয়তো উষ্ণতার ঘাটতি ছিল। তাই প্রবুদ্ধ বলে উঠল, কোনো প্রবলেম হয়েছে ঈশা?

তোমার গলাটা এরকম কেন লাগছে? অর্কপ্রভ কি কিছু বলেছে, শুনছিলাম নাকি মানুষটা ভীষণ মুডি?

তোমার কবিতা কি ওনার পছন্দ হয়নি?

এই ঈশা, প্লিজ টক টু মি!

না, ইচ্ছে করছে না ঈশার এই মুহূর্তে প্রবুদ্ধর অতিরিক্ত কেয়ারিং অ্যাটিটিউড। মনে হচ্ছে সব বন্ধন ছিঁড়ে অর্কর চোখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা না বলে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে।

সামলে নিয়ে ঈশা বললো, আরে না না সেসব নয় প্রবুদ্ধ। উনি ভীষণ ভালো বিহেভ করেছেন। আমার কাজও ওনার পছন্দ হয়েছে। তুমি টেনশন করো না। আমি পরে কল করবো।

উবের বুক করে ফেললো ঈশা। কয়েকঘন্টা আগের ঈশাকে আর চিনতে পারছে না ও। এই কয়েকঘন্টায় কি যে ঘটে গেল নিজেও বুঝতে পারছে না। সব কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন করে গড়তে ইচ্ছে করছে ওর। গাড়ির আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো ও। এই কি

সেই ঈশা, যে প্রবুদ্ধ ফোন করতে দেরি করলে মনখারাপ করে বসে থাকতো! এই কি সেই ঈশা, যে প্রবুদ্ধর একটা ফোনের জন্য এক সময় উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতো!

কি এমন ঘটলো, যে নিজেকেই নিজের কাছে অপরিচিত লাগছিলো ওর।

।। ৬।।

কি যে হলো ঈশাটার, যেন অপরিচিত কেউ। প্রবুদ্ধ ঈশার গলা শুনেই বুঝতে পারে ওর এখন রাগ হয়েছে নাকি অভিমান। নাকি কেউ ওকে অপমানজনক কিছু বলেছে! এই প্রথম ঈশার গলার স্বরের সঙ্গে ওর কথার সামঞ্জস্য পেল না ও। মুখে তো বললো, সব ঠিক আছে, ওর কাজ নাকি দারুণ পছন্দ হয়েছে অর্কপ্রভর, তাহলে গলায় সেই উচ্ছ্বাস নেই কেন! ঈশার সাথে প্রথম আলাপের মুহূর্তের কথা মনে পড়ে গেলো প্রবুদ্ধর। সেদিনও ঈশার গলায় এমন দ্বিধার আনাগোনা ছিল।

প্রবুদ্ধ সেদিন ওর পিসির ছেলে অনিমেষের সাথে গিয়েছিল পিসির বাড়ির পাশের একটা ক্লাবে।

অনিমেষ ওই ক্লাবের সক্রিয় সদস্য। তাই ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয় ওকে। ক্লাবটা প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরোনো। তাই রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা থেকে শুরু করে যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাবেকিয়ানা বজায় রাখার একটা আপ্রাণ চেষ্টা ছিল ক্লাবের সেক্রেটারি থেকে ভলান্টিয়ারদের। বড়পিসির বাড়িতে ছুটির দিনে দুপুরে মাংস ভাত খেয়ে আরাম করছিল প্রবুদ্ধ। অনিমেষ পাঞ্জাবি পরে বেশ ধোপদুরস্ত

হয়ে প্রবুদ্ধর সামনে এসে বলছিলো, চল যাবি? প্রবুদ্ধ পাশ ফিরে শুয়ে বলেছিল, মুভি?

অনিমেষ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেছিল, না রে মুভি নয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আসলে বকলমে আমি হচ্ছি কিরণ সংঘ ক্লাবের কালচারাল সেক্রেটারি, তাই কিছু দায়িত্ব তো আমাকেও নিতে হয়, আজকের অনুষ্ঠানটার অনেকটা দায়িত্বও তাই আমার ওপরে, যাবি তো চল, তোরা তো নাকউঁচু পাবলিক, দেখবি চল এখনো কেমন গোছানো প্রোগ্রাম করি আমরা, গান, নাচ থেকে কবিতাবৃত্তি, নাটক থেকে মুকাভিনয় সব পাবি।

প্রবুদ্ধ সোজা হয়ে বসে বলছিলো, কবিতা বলতে, কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি টাইপ? সেদিন বাড়ি ফিরছিলাম কোনো একটা ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হচ্ছিল, রাস্তায় জ্যাম হয়ে গিয়েছিল, স্বাভাবিক ভাবেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিতে হয়েছিল, তখনই কানে এলো একটা আধবুড়ো পাবলিক স্টেজে উঠে নমস্কার টমস্কার করে কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি আবৃত্তি করতে লাগলো। লোকজন তো রবীন্দ্রনাথ মানেই ভগবান তুমি যুগে যুগে আর কুমোর পাড়া বোঝে রে। মানুষটা যে এত এত লিখে গেল, কেউ সাহস পেলো না সেসব বলতে।

অনিমেষ তুই কালচারাল সেক্রেটারি কি করে হলি ভাই, ছোটবেলায় তোর তবলার স্যার আসতেন আর তুই পিছনের দরজা দিয়ে দে ছুট দিতিস। পিসিমনি তোর তবলিয়া আসার দিনে পিছনের দরজায় রীতিমত পাহারা

বসাত রে, সেই তুই কিনা কালচারাল সেক্রেটারি। কি দিনকাল এলো রে।

বড়পিসি মাঝ পথে বলে উঠলো, একি রে প্রবুদ্ধ তুই এখনও রেডি হোসনি? যাবি না অনুষ্ঠান দেখতে?

পিসির শাড়ি দেখেই প্রবুদ্ধ বুঝেছিলো, রীতিমত রেডি হয়ে হাতে বাড়ির গেটের চাবি নিয়ে বেরোবার জন্য তৈরি।

বাধ্য হয়েই প্রবুদ্ধ বলেছিল, তোমরা যখন সবাই যাচ্ছ, তখন আমি আর বাড়িতে বসে থেকে কি করবো?

চল, আয় তবে সহচরী, হাতে পায়ে ধরি ধরি শুনেই আসি।

তবে শোন অনিমেষ, কবিগুরুর গানকে কেউ বিকৃত করলে কিন্তু আমার সাথে হাতাহাতি লেগে যাবে। আমি গান না গাইতে পারি, কিন্তু শুনতে ভালোবাসি মারাত্মক। তাই বেসুরো বেতালা পাবলিক স্টেজে উঠে কেত মারছে দেখলেই ব্রহ্মতালু গরম হয়ে যায়। অনিমেষ হাসি মুখে বলেছিল, আর যদি আমাদের অনুষ্ঠান দেখে মনে শীতল বাতাস বয়ে যায়, তাহলে রাতে ট্রিট দিচ্ছিস তুই।

অনিমেষের সাথে কিছুটা চ্যালেঞ্জ করেই ও উপস্থিত হয়েছিল ওদের কিরণ সংঘের বিশাল হলঘরে।

ক্লাবের পরিপাটি ব্যাপারটা আকর্ষণ করছিল ওকে। বড়পিসি আর প্রবুদ্ধ বসেছিলো পাশাপাশি।

অনিমেষ চলে গেছে স্টেজের ব্যাকে। কালচারাল সেক্রেটারির নাকি কিছু দায়িত্ব থাকে বলে বেশ লেকচার দিয়েই গেছে। ক্লাবের বিশাল হলঘরটা ফুল দিয়ে নিখুঁত

করে সাজানো। মঞ্চের দুপাশে মনীষীদের ছবি। কাঠের বার্নিশ করা টেবিলে সঞ্চিতা আর সঞ্চয়িতা, পাশে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা নিজস্ব মহিমায় বিরাজমান। হাজার অর্কিডের ভিড়ে পুরাতনী গন্ধ বহন করতে সচেষ্ট হচ্ছে যেন।

পরিবেশটা বেশ ভালো লেগে গেলো প্রবুদ্ধর। প্রবুদ্ধর মা বলে, ছেলে আমার ভীষণ খুঁতখুঁতে, তবে কোনো কিছু যদি ভালো লেগে যায় তাহলে আর সেদিক থেকে মন সরে না।

প্রবুদ্ধ ছোট থেকেই নিজের পছন্দের ভালোবাসার মানুষগুলোকে আগলে রাখতে পছন্দ করে। সেই ছোট্ট বেলার পছন্দের পেন্সিলবক্স ওর আলমারিতে খুঁজলে এখনো পাওয়া যাবে। কিরণ সংঘের অনুষ্ঠানের পরিবেশ যখন পছন্দ হয়েই গেছে তখন আর না নড়ে চড়ে স্থির হয়ে বসে মনোযোগ দিলো মঞ্চের দিকে।

একটা বছর দশকের ছোট মেয়ে উদ্বোধনী সংগীত গাইল, বেশ তৈরি গলা। না, সন্ধেটা নষ্ট হলো না প্রবুদ্ধর। মনে মনে অনিমেষকে থ্যাংকস জানালো। ইদানিং কাজের চাপে এসব অনুষ্ঠানে আসাই হয় না ওর।

এমনিতেই ওদের ফ্যামিলির সকলেই ওকে দেখে নাক কুঁচকে বলে, ছি প্রবুদ্ধ, তুই আর্কিটেক্ট পাশ করে, এত ভালো রেজাল্ট করেও জব না করে বিজনেস করছিস! আমাদের ফ্যামিলির সকলে নিশ্চিন্ত চাকরি করে এসেছে এতকাল। তুই যেন কেমন দলছুট।

দলছুট হতেই ভালো লাগে প্রবুদ্ধর। তাই তো গোটা দুয়েক জব জয়েন করার পরেও নিস্কৃতি চেয়েছিল ছকে

বাঁধা জীবন থেকে। ওই দশটা পাঁচটার জীবনে না আছে উত্থান না পতন। একটা কোম্পানির হয়ে চাকরগিরি করা। নিজের মতামতের কোনো মূল্য নেই যেখানে সেখানে ও সাচ্ছন্দ বোধ করে না কোনোদিনই। তাই মোটা মাইনের জবগুলো ছেড়ে দিয়ে নিজেই খুলে বসেছে ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশনের অফিস প্লাস শো রুম। বাবার কাছে হাত পাতে নি। পুরোটাই লোন নিয়েছিল প্রবুদ্ধ। যে লোনের প্রায় আশি শতাংশ ও শোধ করে দিতে পেরেছে মাত্র তিন বছরে।

এখন অবশ্য ওদের ফ্যামিলির অনেকেই স্বীকার করে, জেদ আছে বটে ছেলেটার। গত তিনবছরে ওর স্নান খাওয়ার সময় ছিল না। নিজের সঙ্গে নিজের চ্যালেঞ্জ বিষয়টা বেশ গোলমেলে। চব্বিশ ঘন্টাই বিবেক নামক বস্তুটি ওকে ছুটিয়ে বেড়াত। জিততে না পারলেই আবার সেই ছকে বাঁধা জীবনে ফিরতে হবে ওকে। ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে। মাত্র তিনবছরেই ওর কোম্পানি বেশ নাম করে ফেলেছে। অনেকেই আড়ালে বলে, ইউনিক ভাবনা চিন্তায় নাকি প্রবুদ্ধ সকলকে টেক্কা দিয়েছে। এতদিনে ও নিজের দিকে তাকাতে সময় পেয়েছে। তাই তো ছুটির দিনে বড় পিসির বাড়িতে আড্ডা দিতে আসতে পেরেছে। গত তিনবছর আত্মীয়স্বজনদের সাথেও একপ্রকার বিচ্ছেদ ঘটেছিল ওর।

এবারে আপনাদের সামনে কবিতাবৃত্তি করবেন ঈশা সেন।

ভাবনার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মঞ্চের দিকে মন দিয়েছিল প্রবুদ্ধ। তখনই দেখেছিলো, চা পাতা আর মেঘলা আকাশ রঙের মিশেলে একটা চুড়িদার পরে স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছিল ঈশা।

শুরু করেছিল কবিগুরুর কবিতা। প্রচলিত কবিতাগুলোর বাইরে কবিতা বেছেছিলো ঈশা। যেগুলো প্রায়ই রিসাইট করতে শোনা যায় সেগুলো নয়। অদ্ভুত মিষ্টি কণ্ঠস্বর ঈশার। তেমনি সুন্দর বাচনভঙ্গিমা।

রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা বলেই দুটো নজরুল দুটো রবীন্দ্র কবিতা বলে ঈশা যখন নামলো স্টেজ থেকে, তখন প্রবুদ্ধ আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেনি চেয়ারে। মন্ত্রমুগ্ধের মত ছুটে গেছে স্টেজের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা অনিমেষের কাছে। প্রায় আকুতি গলায় বলেছিল, অনি, প্লিজ একবার মেয়েটার সাথে কথা বলিয়ে দে।

অনিমেষ চোখের ইশারায় বলেছিল, রাতে ট্রিট দিবি তো।

নিজের ওয়ালেটটা অনির হাতে ধরিয়ে দিয়ে প্রবুদ্ধ বলেছিল, এই যে কার্ড, ক্যাশ সব আছে।

অনিমেষ মুচকি হেসে এগিয়ে গিয়েছিল ঈশার দিকে।

প্রবুদ্ধর হৃৎপিণ্ড দ্রুতগামী হয়েছিল। ঈশা সামনে এসে নমস্কারের ভঙ্গিমায় বলেছিল, আপনি অনিমেষদার দাদা? অনিমেষদা একদিন ক্লাবের লাইব্রেরিতে আপনার গল্পই করছিল। আপনি নাকি জেদ করে ভালো ভালো সব জব

ছেড়ে দিয়ে বিজনেস করছেন এবং মারাত্মক সাকসেসফুলও হয়েছেন!

প্রবুদ্ধ মনে মনে অনিমেষকে অনেকটা আদর করে ঈশার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কবিতা কি ছোট থেকেই শেখেন? বড্ড ভালো বলেন আপনি।

ঈশা মুচকি হেসে বলেছিল, আমায় তুমি বলুন প্লিজ, আমি অনিমেষদার পরের ব্যাচ ছিলাম।

প্রবুদ্ধ আবার বলেছিল, বহুদিন পরে এত সুন্দর কবিতা শুনলাম।

ঈশা হেসে বলেছিল, এটা আমার প্যাশন, অনেকে অবশ্য দাবি করে ব্লাড, আমার মা, দিদাও নাকি ভালো কবিতা বলতো, হয়তো ওখান থেকেই জন্মেছে ভালোবাসাটা, আমি অবশ্য এসবে বিশ্বাসী নই, আমি মনে করি এটা আমার প্যাশন বলেই আমি নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছি। প্রবুদ্ধ অপলক তাকিয়ে ছিল ঈশার দিকে।

কি সুন্দর সাবলীল কথাবার্তা মেয়েটার। অপরিচিত একজনের সাথে কথা বলার সময়েও কোনো জড়তা নেই।

ছোট থেকে স্টেজ পারফর্ম করছে বলেই হয়তো এতটা স্মার্ট।

প্রবুদ্ধ হাসি মুখে বলেছিল, ফেসবুকে আছো? পাঠাতে পারি রিকোয়েস্ট?

ঈশা স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, নিশ্চয়ই পারেন।

আমি অপরিচিত মানুষের রিকোয়েস্ট নিই না, মেসেঞ্জারে খেজুরে আলাপে আগ্রহী নই মোটেই।

একটু অস্বস্তির গলায় প্রবুদ্ধ বলেছিল, তবে থাক, তোমার কবিতা শুনলাম, এমন কণ্ঠের অধিকারীর সাথে পরিচয় হলো, এই তো ঢের প্রাপ্তি। আর বিরক্ত করাটা বোধহয় অন্যায় হবে।

ঈশা কিছু না বলে মুচকি হেসে চলে গিয়েছিল ওর পরিচিত কারোর ডাকে।

নির্নিমেষ তাকিয়ে ছিল প্রবুদ্ধ ওর চলে যাওয়ার দিকে।

পরক্ষণেই মনে হয়েছিল মেয়েটা বোধহয় এনগেজড। সেটাই স্বাভাবিক, এত সুন্দরী, শিক্ষিতা, দুর্দান্ত কণ্ঠের মালকিন এখনো সিঙ্গেল এটা তো ভাবাই দুস্কর।

তবে ওই প্রবুদ্ধর মায়ের কথায় ছেলে বড্ড খুঁতখুঁতে কিন্তু কোনো কিছু পছন্দ হয়ে গেলে সেটা আর মন থেকে সরে না সহজে।

রাতে বাড়ি ফিরে অনিমেষের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল ঈশার খুঁটিনাটি। অনিমেষ অবশ্য বলেছিল, ঈশার ক্লাস ইলেভেনে একটা পাড়াতুতো প্রেম ছিল বলে খবর আছে। তবে সে সম্পর্কের ব্রেকআপ হয়ে গেছে বহুদিন। এই মুহূর্তে ও নাকি সিঙ্গেল আছে।

সবটা শোনার পরেও প্রবুদ্ধর মনে হয়েছিল, ঈশার সাথে হ্যাংলার মত কথা বলতে যাওয়াটা নিজের পারসোনালিটির অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই ফেসবুকে ঈশা সেনের প্রোফাইলটা বারবার চেক করার পরেও ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারেনি প্রবুদ্ধ।

ঈশার সাথে পরিচয় হবার পরে কেটে গিয়েছিলো বেশ কয়েকটা সপ্তাহ। নিজের কাজের জগতে প্রবেশ করেছিল প্রবুদ্ধ। যেখানে একবার ঢুকে গেলে সব কিছু ভুলে যায় ও। নিজেকে বারবার প্রমাণ করার লড়াইয়ে মেতে উঠেছিলো ও। প্রায় ভুলে গিয়েছিল সুকণ্ঠী ঈশাকে।

তখনই কাকতলীয় ভাবে ঈশা এসে উপস্থিত হয়েছিল ওর সামনে। ঈশা আর ওর বান্ধবী একসাথে ওর অফিসে প্রবেশ করেছিল। ঈশার বান্ধবী রচনা বলেছিল, আমাদের নতুন ফ্ল্যাটটা ডেকোরেট করতে চাই। আপনার কোম্পানির গুড উইলের কথা শুনেই এলাম।

প্রবুদ্ধ লক্ষ্য করেছিল, ঈশার ঠোঁটে আলগা হাসির ছোঁয়া।

রচনার সাথে কথাবার্তা ফাইনাল হবার পরে ঈশা নরম গলায় বলেছিল, দুবার দেখা হওয়ার পরে বোধহয় একটা মানুষ পরিচিত হয়ে যায়, তাই না? আমি কিন্তু পরিচিত মানুষদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট নিয়ে থাকি। আর দ্বিধা না করেই ফেসবুকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিল প্রবুদ্ধ।

ঈশার সাথে ওর সম্পর্ক প্রায় বছর আড়াই হয়ে গেল। ওরা জানে ওরা দুজন দুজনকে ভীষণ ভালোবাসে। বলতে গেলে একে অপরের পরিপূরক। ঈশার সমস্ত ভালমন্দের দায় নিজের কাঁধে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিল প্রবুদ্ধ। এতদিনের সুরে বাঁধা ছন্দে চলা জীবনটায় একটু বেসুরো তাল বাজলেই বড্ড কানে লাগে। আজ তাই ঈশার গলার স্বরের ওঠানামাটাও কান এড়ালো না প্রবুদ্ধর।

যেন ভীষণ পরিচিত গীটারের তারটা হঠাৎই বেসুরো বেজেও বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, সে ঠিকই আছে। প্রবুদ্ধর মনের মধ্যে একটা ছোট্ট জিজ্ঞাসা চিহ্ন তীরের মত বিঁধে রইলো। ভালোবাসার মানুষটাকে যে সবটুকু দিয়ে আগলে রাখতে চায় প্রবুদ্ধ।

।। ৭।।

ভালোবাসার মানুষটা যে ওকে ঘৃণা করে সেটা ঠিক কবে বুঝেছিলো আজ আর মনে নেই কমলিকার। ফাঁকা বাড়িতে যখন নিজের সাথে একান্তে চলে তার আলাপচারিতা তখন আপনমনে নিজের নামটুকুকে স্মরণে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে ও। রিনা সেনের ভিতরের কমলিকা দাশগুপ্তের সাথে রোজই একটু আধটু কথা হয় ওর।

মনীন্দ্রর বাবা, মা বেঁচে থাকতে বাথরুমে শাওয়ারের জলের নীচে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কথা বলতো কমলিকার সাথে। বেশির ভাগটাই ছিল অভিযোগ। কেন সে বুঝতে পারেনি মনীন্দ্রকে! মুখোশের ভিতরের মানুষটাকে কেন দেখতে পেল না কমলিকার কাজল কালো স্বপ্নীল চোখ দুটো! নিজের ওপরেই একরাশ অভিমান জমে জমে ক্রমে শুকিয়ে এসেছিল চোখের জল। আর ইদানিং তো হাজার চেষ্টা করেও নোনতা জলের দেখা মেলে না কমলিকার চোখে। চোখের ভিতরের সূক্ষ্ম শিরা উপশিরারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বহুকাল আগে থেকেই। তারাও ক্লান্ত, তারাও বিষণ্ণ হয়ে মানিয়ে নিয়েছে রিনা সেনের জীবনটা। বিরক্ত হয়ে কমলিকা দাসগুপ্তকে

ভুলে গেছে তারা। সবাই ভুলে গেছে কমলিকাকে। এমনকি আয়নায় থাকা পারদরা পর্যন্ত সেদিন ওর ঝুলপির পাশের রুপালি রেখার দিকে তাকিয়ে বলল, সেন বাড়ির বউ তো মধ্যবয়স্কা হয়েই গেলে, আর কটা দিন কাটিয়ে দাও এভাবেই।

সবাই মেনে নিয়েছে কমলিকার রিনা সেন হওয়াটাকে। শুধু একজনই কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, সে হলো কমলিকার মনের একটা গোপন কুঠুরি। যেখানে এককালে বাস করতো কবিতার আবেগময় কালো অক্ষররা। যে অক্ষরগুলোকে ও বুকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলতো, ভালোবাসি তোদের, তোরা থাকিস আমার সাথে।

মাঝে মাঝেই একলা বাড়িতে সেই অক্ষরগুলো ফিরে আসে ওর গলায়। তখন ও আচমকা রিনা সেন থেকে হয়ে যায় কমলিকা দাসগুপ্ত। এই এখন যেমন ওয়াসিং মেশিনে জামা কাপড় কাচতে দিয়ে আচমকা বলে উঠলো....

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী,
তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম,
আমি ধন্যি!
চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন
আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর....

হাজার বারণ, নিষেধ সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই অবাধ্য হয়ে ওর কণ্ঠে বেরিয়ে আসতে চায় কবিতার শব্দগুলো।

যাদের ও প্রায় ত্রিশ বছর সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে। লুকিয়ে নয়, বলতে গেলে পায়ে বেড়ি পরিয়ে বেঁধে রেখেছে।

কেন যে তারা আকস্মিক ভাবে এত বছর পরেও এসে ভিড় করে কমলিকার সামনে, কে জানে!

কমলিকার ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গাত্মক একটা হাসির রেখা এসেই মিলিয়ে গেল। কলেজ সোশ্যালে এই কবিতাটাই বলেছিল না কমলিকা! কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী শুনেই মনীন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছিল ওর কাছে। কমলিকার কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল মনীন্দ্র। বলেছিল, বাঁচিয়ে রেখো এদের, এরা অমূল্য সম্পদ। মনীন্দ্রকে প্রথম দেখেই ভাল লেগেছিলো ওর। সত্যি বলতে কি ওর কলেজের চটকদার ছেলেদের তুলনায় মনীন্দ্র বড্ড বেশি সাদামাটা ছিল। তবে কথা বলতো খুব সুন্দর করে। রোজ কলেজ আসার সময় কমলিকা দেখতে পেত দুটো চোখ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ওর আসার পথের দিকে তাকিয়ে। মনীন্দ্রর সাথে কলেজ সোশ্যালে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই ওদের অফিসের ওই বিশেষ জানালাটার দিকে রোজ তাকিয়ে ফেলতো কমলিকা। কিছুতেই অবাধ্য চোখের দৃষ্টিকে শাসন করতে পারতো না। প্রতিদিন দৃষ্টি বিনিময় হতো ওর আর মনীন্দ্রর। কোনো কথা নয়, শুধুই অপলক কয়েক সেকেন্ড। তাতেই যেন ভালোলাগার আবেশ ছড়িয়ে যেত ওর গোটা শরীরে। না ছুঁয়েও যে এভাবে স্পর্শ করা যায় সেটা অনুভব করেছিল কমলিকা সেই প্রথম। কলেজ ছুটির দিন মনীন্দ্রর ওই অনুভূতি

মাখানো কিছু বলতে চাওয়া চোখ দুটোকে খুব মিস করতো কমলিকা। সব কিছুর মাঝেও যেন কিছু না পাওয়া। গত একমাসে মনীন্দ্রকে ওই একই জানালায় একই ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে কমলিকা বুঝেছিলো, ছেলেটা ওকে চায়, ভীষণ ভাবে চায়, কিন্তু কিছুতেই বলতে পারছে না। হয়তো ভাবছে কমলিকা রিজেক্ট করে দেবে, তাই বোধহয় সাহস করে এগিয়ে আসেনি কথা বলতে।

তবুও কথা হয়েছিল ওদের। একটা ঘু ঘু ডাকা গরমের দুপুরে, তীব্র রোদের মধ্যে কলেজ থেকে একলা ফিরছিল কমলিকা। কি একটা কারণে যেন ছুটি হয়ে গিয়েছিল সেদিন। বন্ধুরা ক্যান্টিনে আড্ডা দেবে বলে থেকে গিয়েছিল ক্যাম্পাসের ভিতরে। কমলিকার শরীরটা খারাপ লাগছিল গরমে, তাই ও বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি ফিরবে বলে।

বাস ধরবে বলেই হাঁটছিল ছাতা মাথায় দিয়ে, আচমকা কেউ একজন পাশ থেকে বলেছিল, রূপকথার রাজকন্যা আজ একা কেন? সৈন্য সামন্তরা কোথায়?

কমলিকা পিছন ঘুরে দেখেছিলো, ফুটপাথের একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে মনীন্দ্র।

ও দাঁড়াতেই মাটির ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে এগিয়ে এসেছিল ওর সামনে। মুচকি হেসে বলেছিল, কি ব্যাপার, মিস কমলিকা দাসগুপ্ত আজ একা একা রাজপথে? তার সৈন্য সামন্তরা সব কই? কমলিকা একটু লজ্জা পেয়ে বলেছিল, তাই তো আজ অফিসের জানালাটা ফাঁকা

দেখলাম, অতন্দ্রপ্রহরীর নজর এড়িয়েই চলে এলাম এদিকে।

মনীন্দ্র একটু লজ্জা পেয়ে বলেছিল, প্রহরী আজ বেসামাল, হিসেবে চূড়ান্ত গণ্ডগোল, বিকেল পাঁচটার বদলে দুপুর দুটো হবে সে কি করে জানবে!

কমলিকা হেসে বলেছিল, সে তো না হয় বুঝলাম, কিন্তু এমন প্রখর রোদে গরম চা খেয়ে তৃপ্ত হওয়ার বিষয়টা পরিষ্কার হলো না, লস্যি কিংবা শরবত খেলে বরং শরীর মাথা দুই ঠাণ্ডা হবে এমন উষ্ণতায়।

মনীন্দ্র আড়চোখে চায়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে বলল, সেটা নির্ভর করছে তার পছন্দের ওপরে। এই যে বিজয়বিহারী কলেজের এত শান্ত গাছতলা পছন্দ না করে আমি খুজেঁ খুঁজে ইউক্যালিপটাস গাছের মত দামি সুখী একটা গাছকে পছন্দ করলাম, এটারও তো যুৎসই ব্যাখ্যা নেই আমার কাছে। কেউ কেউ বরফ শীতল শান্তি পছন্দ করে, আবার কেউ কেউ উষ্ণতম দিনের তীব্র পারদে পুড়তে চায় একটু একটু করে, এরও কি কোনো ব্যাখ্যা আছে!

কমলিকার গাল চিবুক রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। সেদিকে তাকিয়ে মনীন্দ্র বলেছিল, গাল দুটো এই যে আবির রাঙা হয়ে উঠেছে এ বোধহয় শহরের উষ্ণতম দিনের উষ্ণতার এফেক্ট, চলুন আপনাকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। কমলিকা ঘামছিলো, ভিজছিলো, ছটফট করছিল নতুন এক অনুভূতিতে। মনীন্দ্রর দিকে ছাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে কমলিকা বলেছিল, ছাতার ভিতরে আসুন।

মনীন্দ্র নিজের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, রং পুড়ে যাবার ভয় আছে বলছেন? বরং তাত লাগলে যে মোম গলে যাবার ভয় আছে তাকেই ভালো করে ঢাকুন। একই ছাতায় হাঁটিতে হাঁটতে দুজনের আঙুলে আঙুলে ছোঁয়া লাগছিলো, অদ্ভুত অনুভূতির অনুভবে কমলিকা বিহ্বল হয়ে বলেছিল, আর কিছু বলবেন না আমায়?

মনীন্দ্র কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছিল, কবিতার অক্ষরদের বাঁচিয়ে রেখো, একদিন একা বসে শুনবো, দর্শকাশনে সেদিন শুধু আমি, একাধিপত্য অধিকার করবো তোমার কবিতার প্রতিটা অক্ষরে।

কমলিকা বলেছিল, আর বক্তার ওপরে একাধিপত্য বজায় রাখার কোনো ইচ্ছেই নেই বুঝি?

মনীন্দ্র একটু করুণ হেসে বলেছিল, বক্তা যে আমার নাগালের বাইরের মানুষ, দূরের নীহারিকা।

তাই দু চোখ দিয়ে চেয়ে থাকি তার দিকে। কখনো মনে হয় ভোরের সদ্য ফোটা শিউলি, কখনো তীব্র গ্রীষ্মের উগ্র দাম্ভিক পলাশ, কখনো আনমনা বেলফুল, যে পথচলতি মানুষকে না জেনেই তার গন্ধ বিতরণ করে।

আবার কখনো মনে হয়, ধ্যানগম্ভীর পদ্ম, নিজের আসনে স্থির হয়ে বসে আছে, আশেপাশের সমস্ত কিছু সম্পর্কে সে মারাত্মক উদাসীন। তাই মালি নিজেই ভীষণ কনফিউজড। একবার ভাবে ওই আনমনা বেলফুলের সামনে দাঁড়িয়ে দু হাত জোড় করে বলা যায়, একটু সুবাস কি আমিও পেতে পারি?

মালি যখনই যাবার তোড়জোড় করে তখনই দেখে দাম্ভিক পলাশ চোখ রাঙিয়ে বলছে, সাহস তো বড় কম নয়! বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো। বাড়িয়ে দেওয়া হাত মুহূর্তে ঢুকে যায় চোরা পকেটে। নিজের মনকে ধিক্কার দিয়ে বলে, এ তো দূরের চন্দ্রমল্লিকা, একে স্পর্শ করতে যেও না, বড্ড নাজুক, ভীষণ রাগী আর একটু খামখেয়ালি।

কমলিকা মনীন্দ্রর কথার স্রোতে ভাসতে ভাসতেই চলে এসেছিল বাসস্ট্যান্ডে। ভালোলাগা আর অজানা শিহরণ বুকে নিয়েই আলতো করে বলেছিল, যদি বেলফুল, পদ্ম আর রাগী পলাশ একসাথে রাজি হয় বন্ধুত্ব করতে তাহলেও কি ভয় থাকবে?

মনীন্দ্র বড় বড় চোখ করে বলেছিল, ঘুঘু ডাকা নিস্তব্ধ দুপুরের স্বপ্ন নয় তো? প্লিজ একটা চিমটি কাটো।

কমলিকা দুষ্টুমি করে বেশ জোরেই চিমটি কেটেছিল মনীন্দ্রর হাতে। তারপর ছুটে উঠে গিয়েছিল বাসে।

মনীন্দ্র জোরে বলেছিল, ফর্সা নই বলে কি দাগ হয়না? চামড়ায় দাগ সুস্পষ্ট নয় বলে কি মনের দাগও মুছে যাবে। কাল দেখো, এই চিমটির দাগ নিজের মহিমায় বর্তমান থাকবে।

ইস, লজ্জায় বাসের জানালা দিয়ে আরেকবার তাকিয়ে ছিল কমলিকা।

তারপর প্রতিদিনই কিভাবে যেন কমলিকা বন্ধুদের ছাড়াই দলছুট হয়ে বাড়ি ফিরতো, আর দুপুর দুটোর পরিবর্তে মনীন্দ্রর চা খাওয়ার সময় বদলে হয়েছিল বিকেল

পাঁচটা। কয়েক পা একসাথে হাঁটা, রূপকথার রাজকন্যাও মনীন্দ্রর সাথে মাটির ভাঁড়ে চা খেয়েছিল দেখেই মনীন্দ্র বলেছিল, পারবে কমলিকা আমাদের সাদামাটা মধ্যবিত্ত জীবনটাকে মেনে নিতে? আমাদের গোটা সংসারটা আমার মাইনের ভরসায় দিন কাটায়, আমাদের ঘরের কোণে গ্রামফোনে বিসমিল্লাহ খানের সানাই বাজে নি কখনো, ছোট থেকেই দেখেছি সকাল শুরু হয়েছে মেরি বিস্কুট আর গুঁড়ো দুধের অপ্রতুলতা দিয়ে।

কমলিকা বলেছিল, প্রাচুর্যে আমার আসক্তি নেই মনীন্দ্র, শুধু একজন খাঁটি মনের মানুষ চাই, যার সাথে কাটাবো সুখ দুঃখের মুহূর্তগুলো! মনীন্দ্র আলতো করে ধরেছিল কমলিকার হাতটা। ফিসফিস করে বলেছিল, একটা কথা দিতে পারি কমলিকা, তোমার কবিতার অক্ষরদের নিজের বুক দিয়ে আগলে রাখবো, তোমার অনুভূতিগুলো রক্ষা করবো নিজের জীবন দিয়ে। কিছুতেই সেগুলোকে হারিয়ে যেতে দেব না কেজো জীবনের বাসন কোষণের শব্দে। তোমার সব কোমল অনুভূতিরা আমার মনের আঙিনায় টুংটাং শব্দে বাজবে আজীবন। কমলিকা বলেছিল, আমি এমন একজন মানুষকেই চাই মনীন্দ্র, যে আমার সাথে সাথে আমার কবিতাদের ভালোবাসবে, শ্রুতি নাটকের পাল্টে যাওয়া চরিত্রদের মধ্যেও খুঁজে পাবে কমলিকার শিল্পী সত্ত্বাকে। বাদ বাকি সবকিছু আমি মানিয়ে নিতে পারবো, কিন্তু এদের অবমাননা আমি সহ্য করতে পারবো না।

মনীন্দ্র মুচকি হেসে বলেছিল, বুঝেছি বুঝেছি, আমার থেকেও তোমার বেশি প্রিয় হলো মঞ্চ। তাই তো?

কমলিকাও উত্তর দিয়েছিল, তিনবছর থেকে যে মঞ্চটাকে আপন করে নিয়েছিলাম মনীন্দ্র, তাই একটু হলেও ওর প্রতি আমার ভালোবাসা বেশিই। মাইকটা হাতে ধরলেই গোটা শরীরটা শিহরিত হয় আমার, সামনের দর্শকের সারিতে কারা বসে আছে আর দেখতেই পাই না আমি। তখন আমি এক অন্য কমলিকা।

মনীন্দ্র একটু গম্ভীর স্বরে বলেছিল, কিন্তু তোমার বাবা ডক্টর কমলেশ দাসগুপ্ত কি মানবেন আমার মত অত্যন্ত সাধারণ একজন কেরানী জামাইকে?

কমলিকা ঘাড় নেড়ে বলেছিল, না মানবে না। বাবার অনেক স্বপ্ন আমায় ঘিরে, তাই হয়তো বাবার সেই স্বপ্ন ভেঙে গেলে আর কখনো মুখদর্শনই করবে না আমার। হয়তো সকলের কাছেই বলবে তার একটাই মেয়ে, বড় মেয়ে মারা গেছে কার দুর্ঘটনায়। হয়তো শুধু মালবিকাকে নিয়েই বাঁচবে দাসগুপ্ত ফ্যামিলি। কিন্তু মনীন্দ্র তোমায় ছাড়া যে আমি ভালো থাকবো না কিছুতেই।

আয়নার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেন বাড়ির মধ্যবয়স্ক বউ রিনা সেন। ঝুলপির চুলে সিলভার লাইন, চোখের নিচে ডার্ক সার্কেলে এত বছরের গ্লানি সুস্পষ্ট। সিঁথির সিঁদুরের জায়গাটা চুল ফাঁকা হয়ে নিজের পথ চিরস্থায়ী করে রেখেছে। অনেক চেষ্টা করেও এই মুখে সেই কলেজ পড়ুয়া কমলিকাকে খুঁজে পেল না ও। অবশ্য

কমলিকা যেন আর কখনোই রিনার মধ্যে ফিরে না আসে সে ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছিল ঈশার যখন বয়েস মাত্র নয় বছর। যখন ও বুঝেছিলো ভালোবাসা, প্রতিশ্রুতি শব্দগুলো গল্প, উপন্যাসের একচেটিয়া রোম্যান্টিজিম। বাস্তব জীবনে একটাই শব্দের আধিপত্য, সেটা হলো কর্তব্য আর ভালো থাকার অভিনয়। যেটা একমনে অতগুলো বছর ধরে করে আসছে কমলিকা।

মনীন্দ্রকে মুখোশহীনভাবে প্রথম দেখেছিলো সেদিন। তার আগে পর্যন্ত তবুও ঝগড়া, অভিমান, দ্বন্দ্ব, মিলনে কাটছিল জীবন। কিন্তু যেদিন ভালোবাসা নামের সূক্ষ্ম পর্দাটা উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল কমলিকার সামনে সেদিন থেকেই জোর করে গলা টিপে নিজের হাতে খুন করেছিল ওই নামের মেয়েটাকে। ধীরে ধীরে বাঁচিয়ে তুলেছিল রিনাকে। যার নিজস্ব কোনো মতামত নেই। নাম, ধাম বদলে, এতবছরের পরিচয় বদলে যে একটা যন্ত্রে পরিণত হচ্ছিল ক্রমশ। কমলিকা বড্ড স্বাধীনচেতা, ভীষণ রোম্যান্টিক, রিনার সাথে তার বড়ই অমিল। এ বাড়ির সকলে রিনাকে পছন্দ করতো, এমন কি মনীন্দ্র পর্যন্ত বলেছিল, রিনা, থাক না ওসব কবিতা, নাটক। তুমি তো তিনবছর থেকে তেইশ বছর বয়েস পর্যন্ত মঞ্চ দাপালে, এবারে না হয় মন দিয়ে সংসার করো। আমারও কিন্তু বাড়ির এই সকলের মত ঘরোয়া সংসারী রিনাকেই বেশি পছন্দ, কমলিকাকে না হয় ত্যাগ করলে আমার জন্য! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়েছিলো কমলিকা। মনে মনে

একটাই কথা ভেবেছিল, মানুষটা কি এমনই ছিল, নাকি বদলে গেল এই কয়েকবছরে!

এলোমেলো প্রশ্ন এসে ওলটপালট করে দিচ্ছিল চার অক্ষরের শব্দটার মানে! ভালোবাসার অর্থ কি শুধুই এক তরফা স্যাক্রিফাইস? অ্যাডজাস্টমেন্ট শব্দের অর্থ কি কমলিকার সমস্ত ভালোলাগার জলাঞ্জলি দেওয়া? এমনকি নাম, পদবি পর্যন্ত। মনীন্দ্র তো কমলিকাকে ভালোবেসে এ বাড়ি ছাড়েনি, ছাড়েনি পরিবার, নিজের পরিচয়, নিজের ভালোলাগা কিছুই, তাহলে কমলিকাকে কেন বিসর্জন দিতে হচ্ছে ওর সব টুকু। কেন বদলে ফেলতে হচ্ছে আসল মানুষটাকে। তবে কি এই কমলিকাকে কোনোদিনই ভালোবাসেনি মনীন্দ্র? ভেবেছিল বিয়ের পর খোলনলচে পাল্টে ফেলে তৈরি করবে সম্পূর্ণ অন্য একটা মানুষ? ওর মনমত কথা বলা, যন্ত্রচালিত পুতুলের সৃষ্টি করবে ভেবেছিল কি! তাই কি কমলিকার নাম, পদবি, স্বভাব সব পরিবর্তন করতে উঠে পড়ে লেগেছে এ বাড়ির সকলে!

উঠে পড়ে তো কমলিকাও লেগেছিল, চূড়ান্ত অভিমানে স্থবির হয়ে গিয়েছিল ওর ভালোলাগা, চাওয়া পাওয়ার অনুভূতিগুলো। তাই নিজেকে যন্ত্রে পরিণত করেছিল ক্রমশ। বহুবছরের সাধনায় সেটা পেরেওছিল। কিছুতেই উঁকি মারতে দেয়নি কমলিকাকে, রিনার কর্তব্যে কখনো ত্রুটি হয়নি। মনীন্দ্র অবশ্য ইদানিং মাঝে মাঝেই বলে, তোমার সাথে দিনদিন থাকা জাস্ট অসহ্য হয়ে উঠছে। কেন এতটা বদলে গেলে তুমি! মনেহয় একটা রোবট দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িতে!

জয়, এটাই কমলিকার জয়, ও জিতে গেছে। নিজেকে তিলতিল করে নিঃশেষ করেও ও জিতেছে।

রান্নাঘরটা অবশ্য ওকে খুব সাহায্য করেছে সব কিছু ভুলে থাকতে। নিজের পরিচয়টা ভুলতে সাহায্য করেছে নুন, হলুদের কৌটোগুলো। পেঁয়াজের রসে বেরোনো চোখের নোনতা জলের কষ্টগুলোর তফাৎ করতে পারেনি কেউ! গ্যাসের দপ করে জ্বলে ওঠা আগুনে ও নিজের রাগকে প্রশমিত করেছে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার মানসিকতাকে একসময় নিয়ন্ত্রণ করেছে ওই আগুনের লেলিহান নীল শিখার দিকে তাকিয়েই।

একলা দুপুরে পুরোনো মনীন্দ্রকে মাঝে মাঝেই দেখতে পায় কমলিকা। মুচকি হেসে ওর দিকে তাকিয়ে যেন বলে, কি মিস কমলিকা দাসগুপ্ত? কেমন লাগছে সেন বাড়ির সংসার, পেরেছি না, তোমার স্বপ্নগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিতে? দেখো দেখো একজন সাধারণ কেরানীও পেরেছে রাজকন্যাকে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে আনতে।

কমলিকার বুকের বাঁদিকে হালকা যন্ত্রণা হয় তখন। আবার ও ভারী পাথরটা জোর করে চাপিয়ে দেয় ওই যন্ত্রণার জায়গাটায়। উঠে পড়ে রিনা সেন, ওয়াইফ অফ মনীন্দ্র সেন...উঠে পড়ে ঈশা আর দেবজিতের মা, অনেক কাজ বাকি তার। সবাই ফিরবে, তার জন্য টিফিন রেডি করতে হবে। আবার ওর কেজো, কষ্ট ভোলানো রান্নাঘরের দিকে ছুটে যায় রিনা। বিদায় দেয় মুহূর্তের জন্য ওর মধ্যে ভর করা কমলিকাকে। আলতো করে বলে,

তুমি ভালোবেসেছিলে কমলিকা, তাই এটুকু শাস্তি তো তোমায় পেতেই হবে। বিশ্বাসের মাশুল যে তোমায় গুনতেই হবে।

।। ৮ ।।

বাড়িতে ঢুকেই বাড়ির এক চিলতে লাইব্রেরির দিকে এগোলো দেবজিত। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথেই ভাবছিলো কি কবিতা বলা যায়। এখনো কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। আসলে দীর্ঘ বছরের অনভ্যাসের ফলে কবিতার সাথে ওর আর সখ্যতা নেই। ঈশা যখন বলে, মাঝে মাঝে শুনতে পায় দেবজিত।

তবে ঈশা নিজের বোন হলেও বড্ড হিংসুটে টাইপ। ছোটবেলায় বার দুই দেবজিত কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিল। সেজন্য ঈশা দুদিন কারোর সাথে কথা অবধি বলেনি। মোটামুটি বেশির ভাগ আবৃত্তি প্রতিযোগিতাতেই প্রথম হতে হতে ও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই দ্বিতীয় স্থানটা ছিল ঈশার খুব অপছন্দের। বিশেষ করে দাদা ফার্স্ট ও সেকেন্ড হলে তো কথাই নেই। বাড়ি ফিরেই শুরু করত কান্না। তারপর দুদিন পুরো চুপচাপ। শেষে ওর পাওয়া সেকেন্ড প্রাইজটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে তবেই শান্ত হতো।

এমনকি একবার সুকুমার রায়ের বইটা অবধি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ছিল। মা ঈশাকে খুব বকেছিলো। যদিও বাবা মাকে রীতিমত অপমান করে বলেছিলো, এতে খারাপ কি

দেখলে? ওর ফার্স্ট হবার মানসিকতাই ওকে একদিন অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে।

দেবজিত আর ঈশাকে মা যখনই কোনো অন্যায়ের জন্য শাসন করতে আসতো তখনই বাবা কোনো এক অদৃশ্য কারণে ওদের পক্ষ নিয়ে কথা বলতো। তাই খুব ছোট থেকেই ওরা বুঝেছিলো, মা এ সংসারের নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় মানুষ। এমনকি ঠাম্মাও বলতো, তোর মায়ের ভুলভাল কথা শোনার দরকার নেই, বাবা যেটা বলবে শুনবি। বাবা অফিসে চাকরি করে, কত পড়াশোনা করেছে বলতো, বাবা সব জানে, মা তো রান্নাঘরে রান্না করে, মা কি করে এত বুঝবে!

দেবজিতও কথায় কথায় মাকে বলতো, তুমি নিজে কতদূর পড়েছো, যে আমাদের পড়াতে আসছ?

খুব ছোট থেকেই ও লক্ষ্য করেছিল, কোনো কারণে মাকে ওরা দুই ভাইবোন অপমান করলে সেদিন বাবার কাছে বেশি আদর পাওয়া যেত। বাবা সেদিন অফিস ফেরত চকলেট বা খেলনা কিনে আনতো। দেবজিত আর ঈশার কাছে ব্যাপারটা বেশ মজার ছিল। কথায় কথায় মাকে অপমান করলেই চকলেট পাওয়া যাবে গোছের একটা খেলা।

মাও ধীরে ধীরে কেমন যেন হয়ে গেল। ভীষণ অন্যমনস্ক, একটু উদাসীন, শুধু যন্ত্রের মত সংসারের কাজগুলো করতো। কর্তব্যে ত্রুটি করতো না ঠিকই কিন্তু মনে হত যেন একটা রোবট। ঈশা বলেছিল, ভালোই

হয়েছে, ওই অশিক্ষিত মহিলার বকুনি খেতে আমার ভালো লাগে না। আমায় কবিতার ম্যাম বলেছেন, তোমার মা বেশিটাই ভুল শিখিয়েছেন। ভাগ্যিস সময় মত আমার কাছে এসেছো।

যদিও ঈশার কবিতা বলার স্টাইলে নতুন কিছু পার্থক্য বুঝতে পারেনি দেবজিত। মা যেমন করে বলতো, ঈশার দিদিমণিও তেমনই শেখান বলে মনে হয়েছে দেবজিতের। তবে বাবা ঈশাকে দিদিমণির কাছে পাঠিয়ে দেবার পরে মা আর কখনো কবিতা শেখাতে আসেনি ওদের কাউকে।

দেবজিত নিজেই বলেছিল, তুমি তো ঈশাকে বেশি ভালো করে শিখিয়ে দাও, ডুবলিসিটি করো, তাই তোমার কাছে আমি শিখবো না। ওই কথাটা শোনার পর মা খুব শান্ত গলায় বলেছিল, সে শিখিস না, তবে কবিতা বলা ছেড়ে দিস না। তোর হবে রে জিত।

মায়ের কথা শুনেও রাগে ফুসেছিলো ও। ছেড়ে দিয়েছিল প্রিয় জিনিসটাও।

আজ বহু বছর পরে আবার খোঁজ পড়লো কবিতার। ঈশার কাছে জিজ্ঞেস করতেই পারে কোন কবিতাটা এই রিটায়ারমেন্টের অনুষ্ঠানে করা উচিত, কিন্তু ও জানে ঈশা এমন একটা মুখ করে তাকাবে যেন ও পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য ভিসা অ্যাপ্লাই করতে চাইছে! তারপর শুরু হবে ওর ব্যঙ্গাত্মক হাসি। তার থেকে থাক, নিজে যা বুঝবে তাই করবে। কিন্তু অফিসের ব্যাপার, মান সম্মান যাবে সেরকম পারফরমেন্স ও করতে পারবে না। জীবনে ছোট ছোট বিষয়েও দেবজিত ভীষণ সিরিয়াস। পারফেকশন শব্দটা

ওর বড্ড পছন্দের শব্দ। একটু বেশি পরিশ্রম করতে হয় ঠিকই ওই শব্দটাকে আপন করতে হলে, কিন্তু পারফেকশনিস্টরা যে আলাদা রকমের তৃপ্তি পায় সেটার স্বাদ অগোছালো মানুষরা বুঝবে না।

এই আলমারির সামনে আগে মা এসে দাঁড়িয়ে থাকতো, অকারণে বইগুলোর গায়ে হাত বুলাত। দেবজিত অবাক হয়ে দেখতো তখন মাকে। দুটো গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে আর রবিঠাকুরের সঞ্চয়িতা হাতে নিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে রিনা সেন। মাকে তখন যেন কেমন অন্য গ্রহের বাসিন্দা মনে হতো। কাছে যেতে কেমন ভয় ভয় করতো দেবজিতের। আসলে ওদের মা টা যেন কেমন একটা। অন্যের মায়েদের মত হাসে না, গল্প করে না, অদ্ভুত রকমের চুপচাপ। মাকে বড্ড দূরের লাগতো জিতের। ছোটবেলায় তবুও মা গল্প বলতো, আদর করতো, কিন্তু যবে থেকে বাবার মত দেবজিতও কথায় কথায় মাকে অপমান করতে শুরু করলো তবে থেকেই মা আরও নিশ্চুপ হয়ে গেল। সঞ্চয়িতা আর সঞ্চিতার ওপরে যে মায়ের একটা আলাদা টান আছে সেটা জিত লক্ষ্য করেছিল আগেই। আজ আলমারি থেকে বই বের করতে গিয়ে দেখলো, দুটো বইয়ের ওপরেই ধুলোর স্তর। আগে তো দেখতো মা নিজের আঁচল দিয়ে পরম আদরে মুছছে এসব বই, এখন দেখছে ধুলো। বইগুলো যে বহু বছর কেউ হাত দেয়নি সেটা বেশ বুঝতে পারলো দেবজিত। সঞ্চয়িতাটা বের করে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোলো ও।

ঘরে ঢোকার মুখেই বাবার সাথে দেখা। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে এগোচ্ছিল। হাতে সঞ্চয়িতা দেখে বললো, কি ব্যাপার, হঠাৎই কবিগুরুর স্মরণে!

দেবজিত একটু দায়সারা ভাবেই বললো, ওই অফিসে একজনের ফেয়ারওয়েল পার্টি আছে তাই ভাবছি একটা কিছু পাঠ করবো।

বাবা হেসে বললো, বেশ বেশ, ঈশাকে বলিস একটু দেখিয়ে দেবে।

বিরক্তিতে মুখটা তেতো হয়ে গেল দেবজিতের। বাবার এরকম কেন মনে হয় যে ঈশাই একমাত্র মেয়ে যে কবিতা বলে। ইউটিউবে সার্চ করলে হাজারটা চ্যানেল পাবে যেখানে কবিতা শুনতে পারবে।

সন্ধেবেলা বিতর্কে যাবে না ঠিক করেই কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোলো দেবজিত।

একটুখানি পরেই মা একটা ট্রে করে চা দিয়ে গেল টেবিলে। চা-টা খেয়েই দেবজিত বুঝলো মা চায়ে আদা দিয়েছে।

আগেও কোনো প্রোগ্রাম থাকলে মা আদা কুচি আর লবঙ্গ দিয়ে দিতো মুখে। বলতো মুখে রেখে দিবি, রসটা যেন গলা অবধি যায়। এতে গলা শার্প হয়। আজও চায়ে চুমুক দিয়েই জিত বুঝলো আদার টেস্টটা। জাস্ট বিরক্ত লাগছিলো ওর। সব ব্যাপারে নিঃস্পৃহ হয়েও নিখুঁত কর্তব্য পালন করার স্টাইলটা ভীষণ রকমের অস্বস্তিকর।

ওদের কারোর কাছে কিছুই চাহিদা নেই মহিলার, শুধু নিজেকে একটু একটু করে বিলিয়ে দিয়েই যেন শান্তি পায়

রিনা সেন।

অসহ্য রকম রাগে প্রায় চিৎকার করে দেবজিত বললো, তোমায় বলেছিলাম চায়ে আদা দিতে? তাহলে কেন দিলে?

মা একটাও কথা না বলে আরেক কাপ আদা ছাড়া চা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে গেল নিস্তব্ধে। দেবজিত ভীষণ ভাবে চায় মা চিৎকার করুক, ঝগড়া করুক, অশান্তি হোক তোলপাড়। এমন শীতল ব্যবহারটা আর সহ্য করতে পারে না ও। সকলের মায়েরা কত স্বাভাবিক, ওর মা টা যেন কেমন! এই তো সেদিন প্রীতম চায়ের দোকানে বসে বলছিলো, না ভাই রবিবার বলেই আড্ডা দিতে পারবো না। মাংস, মাছ নিয়ে দেরি করে বাড়ি ঢুকলে মা পেটাবে। এত বড় হয়ে গেলাম, চাকরি বাকরি করছি, দুদিন পরে হয়তো বিয়েও করবো, এখনো মায়ের হাতের কানমোলা খাই জানিস। চললাম রে, বলেই চায়ের ভাঁড়টা রেখে দিয়ে বাজারের ব্যাগ হাতে ছুটছিলো প্রীতম।

দেবজিতও এসেছিল বাজার করতে। রবিবারের মাংস কেনার দায়িত্বটা ও অনেকদিনই নিজের কাঁধে নিয়েছে। বাবা অন্য দিনে বাজার করলেও রবিবারের স্পেশাল বাজারটা দেবজিত নিজের হাতে করে।

প্রীতমের কথা শুনে মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা বুদ্ধি ভর করেছিল ওর। ইচ্ছে করে চারকাপ চা খেয়ে, এর ওর সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাচ্ছিলো জিত। আজ দেরি করে ফিরবে মাংস নিয়ে। দেখা যাক ওদের বাড়ির রোবটরূপী মানুষটার মধ্যে কোনো হেলদোল হয় কিনা! রান্নাঘরটুকুর

মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখা চূড়ান্ত আনকালচার্ড মানসিকতার মানুষটার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় কিনা পরীক্ষা করবে বলেই ইচ্ছে করে দেরি করছিল জিত।

বাজার সেরে যখন বাড়ি ঢুকলো ঘড়ির দুটো কাঁটা তখন তেঁতুল পাতায় নয়জন ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে অত্যন্ত সুজনের মত বারোর ঘরে এসে একে অপরের গায়ের ওপরে উঠে লুটোপুটি খাচ্ছে।

বাবা পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে বলেছিল, এত দেরী? কখন রান্না হবে, আর কখন খাওয়া হবে।

ছুটির দিনেও সেন বাড়িতে লাঞ্চ টাইম দুপুর একটা থেকে দেড়টা। ঠাকুমা বলেছিল, করছিলিস কি বাজারে এত বেলা পর্যন্ত। জানিস তো বাবা ছুটির দিনে তাড়াতাড়ি দুপুরে খায়!

একটা মানুষই শুধু কোনো কথা বলেনি। দেবজিত অপলক তাকিয়ে দেখেছিলো রিনা সেনের দিকে। না, তার চোখের দৃষ্টিতে কোনো রাগ, বিদ্বেষ কিছুই ছিল না। মাংসের প্যাকেটটা নিয়ে গিয়ে তড়িঘড়ি রান্নার আয়োজন শুরু করেছিল। দেবজিতকে আশ্বস্ত করে বলেছিল, খাওয়ার আগেই রান্না হয়ে যাবে।

আরও আরেকবার হেরে গিয়েছিল দেবজিত। ওই মহিলার অনন্ত ধৈর্য্যের পরীক্ষার কাছে হার স্বীকার করে নিয়েছিল ও। মনে স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল মহিলার মন বা আবেগ বলে কোনো বস্তুই নেই, সেজন্যই এমন রাগ দ্বেষহীন জীবন কাটাতে পারে।

মা নামক মানুষটাকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করে নিতো বাড়ি শুদ্ধু লোক, কিন্তু কখনো ওরা কেউ জিজ্ঞেস করেনি, মায়ের কি প্রয়োজন। দেবজিত ছোট বেলায় বলতো, মা তুমি কিছু চাও না কেন পুজোর সময়?

মা হেসে বলতো, তুই বড় হয়ে চাকরি করে আমায় অনেক কিছু দিবি। বড় হওয়ার আগেই কি ভাবে যেন মা আর দেবজিতের মধ্যে সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেল। মা যেন বহুদূরের কয়েক আলোকবর্ষ দূরের বাসিন্দা হয়ে গেল, আর দেবজিত নিজের জগৎ নিয়ে মেতে উঠলো। সেখানে বাবার সামান্য জায়গা থাকলেও রিনা সেনের প্রবেশাধিকার নেই। মায়ের এই পাথর কঠিন মুখ, নির্লিপ্ত চাহনি অসহ্য লাগে দেবজিতের। ও যতটা পারে ওই মহিলার থেকে দূরেই থাকে। প্রথম যেদিন কলেজে গিয়ে ড্রিংক করেছিল বন্ধুদের সাথে, সেদিনও বাড়ি ফেরার পরে ওই মহিলা নির্নিমেষ তাকিয়েছিল জিতের দিকে। যেন এক্সরে মেশিন দিয়ে ভিতর অবধি দেখে নিচ্ছে। অন্যদিন কিন্তু মা এভাবে তাকাত না ওর দিকে। সেদিনের চাউনি ছিল অন্যরকম। দেবজিত বুঝেছিলো, ও ধরা পড়ে গেছে মায়ের কাছে। চূড়ান্ত তিরস্কারের জন্য ও যখন মনে মনে রেডি হয়ে গেছে তখন মা ধীর গলায় বলেছিল, ভেজিটেবল চপ বানিয়েছি সন্ধের টিফিন, তুই কি খাবি? কি অদ্ভুত ঠাণ্ডা সে গলার স্বর। মেরুদণ্ডে কাঁপন ধরে গিয়েছিল দেবজিতের। কোনোমতে মায়ের চোখের আড়ালে পালিয়ে বেঁচেছিলো ও।

অমন নিঃস্পৃহ হিমশীতল চাউনির আড়ালে গিয়ে জোরে শ্বাস নিয়েছিল ও। এই মহিলাকে কথায় কথায় অপদস্ত করেও কি ভাবে যেন হেরে যায় ওরা। শুধু দেবজিত নয়, ঈশা থেকে বাবা পর্যন্ত আড়ালে বলে, ইগনোর করে বুঝলি, আমাদের রাগ আক্রোশগুলোকে রিনা সেন জাস্ট ইগনোর করে। নিজের খোলসের বাইরে বেরিয়ে কিছুতেই রিয়্যাক্ট করে না ঐজন্যই। ঈশা রেগে গিয়ে বলে ওই যন্ত্র মানবের পাথুরে শীতলতার কাছে বারবার হেরে যাই, প্লিজ বাবা কিছু একটা করো। বাবাও হালছাড়া গলায় বলে, একপেশে জব্দ করতে চেয়েছিলাম, অহংকারটুকুকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এ ভাবে হেরে যেতে চাইনি। ব্যর্থ আক্রোশে দেওয়ালে ঘুষি মেরেছে বাবা। ঈশা নাকের পাটা ফুলিয়ে রাগ দেখিয়েছে, মুখে বলেছে, কিসের অহংকার ওই আনকালচার্ড মহিলার? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা তিনজনেই পরাস্ত হয়েছে ওই প্রস্তর মূর্তির কাছে। কোনো কিছুতেই তার ধৈর্য্যের বাঁধে সামান্য চিড় ধরেনি।

ওদের তিনজনের শূন্যে আস্ফালনকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে দিয়ে রিনা সেন খুব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করেছে, ডিনারে কি খাবে তোমরা?

বিস্মিত হয়েছে দেবজিত বারবার, বিরক্ত হয়েছে তার থেকেও বেশি। এখনও যেমন আদা চায়ের পরিবর্তে একটাও কথা না বলে আদা ছাড়া চা-টা রেখে গেল মা।

সঞ্চয়িতা তোলপাড় করে কোনো কবিতা খুঁজে পাচ্ছিলো না দেবজিত। ধুর, অফিসে বলেই দেবে ও

পার্টিসিপেট করতে পারবে না।

বিরক্ত হয়েই ডাইনিংয়ে গিয়ে টিভির রিমোর্টটা হাতে নিলো ও।

মনটা অস্থির লাগছিল ওর। হেরে যাবে ও, অফিসে গিয়ে বলে দিতে হবে ও মাস্টার অফ নান। পড়াশোনা করে চাকরিটা জুটিয়েছে ঠিকই কিন্তু এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিতে জিরো। অফিসের কণিকাদি আর দেবিকা আবার ঈশার পরিচয় জানে। ঈশা যে ওর বোন সেটাও জানে। ওর ইউটিউব চ্যানেলে প্রায়ই কবিতা শুনে অফিসে গিয়ে বলে, তোমার বোন কিন্তু সত্যিই দারুণ রিসাইট করে। আমরা তো তোমার বোন ঈশা সেনের রীতিমত ফ্যান বলতে পারো।

এত কিছুর পরে দেবজিত নিজে একটা বিগ জিরো এটাই জানাতে হবে ওদের! ধুত্তোর বলে টিভিটা বন্ধ করে আবার নিজের ঘরে গেল ও।

টেবিলে খোলা সঞ্চয়িতা।

একটা পেপার ওয়েট চাপানো রয়েছে একটা খোলা পৃষ্ঠার ওপরে।

জিত দেখলো কবিতার নাম 'বিদায়'।

কে এটা খুলে পেপার ওয়েট চাপা দিলো, তাহলে কি ওই অসতর্ক মুহূর্তে খুলেছিল পাতাটা? পাশে রাখা পেপারওয়েটটা কি তবে নিজেই চাপিয়ে রেখেছিলো! একটু সংশয় নিয়েই পড়তে শুরু করলো কবিতাটা।

"ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো,
হউক সুন্দরতর বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয়—
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হতে স্মৃতি, শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর।"

চমকে উঠলো দেবজিত, এটা তো বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য দুর্দান্ত কবিতা। মনের মধ্যে একবার উঁকি দিলো ভাবনাটা, মা নয় তো!

মুহূর্তে ভাবনাটাকে উড়িয়ে দিয়ে পড়তে শুরু করলো কবিতাটা। কি সুন্দর শব্দবন্ধ। ছোটবেলায় মা বলতো, সব অনুষ্ঠান, সব মনখারাপের ওষুধ আছে কবিগুরুর বইয়ে। শুধু খুঁজে নেওয়ার চোখ চাই বুঝলি জিত। সত্যিই তাই, সব পরিস্থিতির কথা ভেবেই যেন উনি লিখে গেছেন। যাক অবশেষে পাওয়া গেলো একটা কবিতা। এবারে শুধু প্র্যাকটিস করে নিখুঁত করার পালা।

দরজার দিকে আরেকবার তাকালো ও, পর্দার ফাঁকে কেউ দাঁড়িয়ে নেই তো? কেন যে বারবার মনে হচ্ছে আদা দেওয়া চা, কবিতা নির্বাচন এসবই ওই একজনকেই ইঙ্গিত করছে, যে অলক্ষ্যে থেকেও চাইছে ও আবার পারফর্ম করুক।

ধীর গলায় বলতে শুরু করলো দেবজিত। বহু বছরের অনভ্যাসের পরে, দীর্ঘ বিরতির পর আবার কালো

অক্ষরের আবেগের কাছে ধরা দিতে চাইছে ওর কেজো মন। মনে মনে বললো, পারবো নিশ্চয়ই পারবো।

পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর বহু বছর আগে বলেছিল, পারবি না কেন, তুই যে আমার বীরপুরুষ।

।। ৯।।

রান্নাঘরে কাজ করছিল রিনা, চায়ের কাপ হাতে সেদিকে অপলক তাকিয়ে আছে মনীন্দ্র। এই মেয়েটাকে একদিন ভালোবাসার অভিনয় করে জয় করেছিল মনীন্দ্র। প্রায় ত্রিশ বছর একসাথে কাটিয়ে দিলো দুজনে। মধ্যরাতের বিছানায় বারবার পিষে দিয়েছে ওই নরম কোমল শরীরটাকে। জান্তব শক্তিতে সঙ্গমের সমস্ত মাধুর্যকে নষ্ট করে দিয়েছে বারবার। রাগে উন্মাদ হয় গিয়ে আদরের নামে রীতিমত অত্যাচার করেছে ওই শরীরটার ওপরে, তবুও একটুকু টুঁ শব্দ বের করেনি মেয়েটা। দুই সন্তানের মা হয়েছে, ছেলে মেয়েদের জন্য মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হয়েছে মনীন্দ্রর সাথে, তারপর আচমকা নিজেই থেমে গেছে রিনা। আস্তে আস্তে একে বারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে সেই প্রাণচঞ্চল মেয়েটা।

এরকম তো চায়নি মনীন্দ্র। চেয়েছিল মেয়েটা ওর সামনে বশ্যতা স্বীকার করুক। রূপ গুণের অহংকার ত্যাগ করে মনীন্দ্রর সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াক। মনীন্দ্র ছাড়া যেন ওর জীবনে আর কিছুই না থাকে। এত কিছু করেও কিছুতেই ওই মহিলাকে নিজের করতে পারলো না মনীন্দ্র। ওর ধীর পদক্ষেপে নিজের চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখতে পায়, ওর স্থির চাউনিটা ব্যঙ্গ করে মনীন্দ্রকে বলে, পারোনি তুমি

আমায় হাতের মুঠোয় ভরতে। মেয়েটা যেন নিজের সব পুরোনো বিসর্জন দিয়েও অনন্যা।

ওর শরীরে নিজের পুরুষত্বের অধিকার স্থাপন করেছিল মনীন্দ্র, ওর মনে একাধিপত্য চেয়েছিল, এত কিছুর পরেও কমলিকা দাসগুপ্ত ওর অধরাই রয়ে গেল। সেই কমলিকা যার পাতলা শিফনের মত ওড়নার কোণটা ধরে মনীন্দ্র বলেছিলো, তুমি অনন্যা। কখনো ভাবিনি তোমার আঙুল ছোঁবার সৌভাগ্য আমার হবে। তোমায় ভালোবাসার, স্পর্শ করার সাহস তুমিই আমায় জুগিয়েছো কমলিকা, যদি কখনো আমার থেকে অনেক দূরে চলে যাও, যদি কখনো আর নাগাল না পাই তোমার সুখী সুখী সংসারের তবুও আজকের কমলা বিকেলটা কোনোদিন ফিকে হবে না আমার কাছে। কমলিকা আলতো স্বরে বলেছিল, আর যদি তোমাকে নিয়েই গড়ি একটা সুখী সুখী সংসার, যেখানে একদিকে থাকবে আমার চাকরি, অন্যদিকে কবিতা আর মাঝখানে তুমি, তাহলে কেমন হয়?

মনীন্দ্র মুচকি হেসে বলেছিল, কিসের চাকরি কমলিকা?

কমলিকা আকাশের দিকে দুহাত তুলে বলেছিল, আমার ড্রিম জব, শিক্ষকতা। ইংলিশে অনার্স কমপ্লিট করেই ট্রাই করবো, তারপর বি এড করবো বুঝলে। দূরের অস্তগামী সূর্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, দেখো ওই দিকে তাকাও, আমার স্বপ্নেরা উড়ছে ঘুড়ির মত নানা রঙে সেজে। মনীন্দ্র ওই স্বপ্নগুলো পূরণ করতে তুমি আমায় সাহায্য করবে তো।

শেষ বিকেলের আলোয় কমলিকার সরল বিশ্বাসে উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা কেঁপে উঠেছিলো। মনীন্দ্র কমলিকাকে ভালোবাসে না, অথচ ওর সবটুকু ভালোবাসা চায়। আসলে ও কমলিকার মত সুখস্বপ্ন দেখা ছেলেমেয়েদের হিংসা করে। যাদের অভাবের সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়নি, যারা নিজেদের রামধনুর মত স্বপ্নগুলোকে সফল করতে পারে অনায়াসেই, তাদের সব ইচ্ছেগুলোকে গলা টিপে মেরে দিতে ইচ্ছে করে মনীন্দ্রর।

ওর নিজেরও খুব শখ ছিল ক্রিকেট ট্রেনিং-এ ভর্তি হবার। বাবাকে বারবার বলেও ছিল। প্রতি মাসে চারশো টাকা করে লাগবে শুনেই বাবা বলেছিল, গরিবের ঘোড়া রোগ না ধরাই ভালো। ক্রিকেটার তুমি হতে পারবে না মনীন্দ্র, তাই পড়াশোনাটা করো, যাতে ভাতের জন্য কারোর কাছে হাত না পাততে হয়।

মনীন্দ্র অবাক হয়ে দেখে, কমলিকা কি অবলীলায় চারশো টাকার ব্যাগ কিনে নেয়, পাঁচশো টাকার জুতো কিনে নেয়। মনীন্দ্রকে ওই পাঁচশো টাকা বাঁচাতে হয় বাবার ওষুধের জন্য। দামি জুতো, দামি বেল্ট, সানগ্লাস এসব জিনিস ওর অধরাই রয়ে যায়।

তাই কমলিকার গালের আবির রাঙা সুখ দেখে মনে মনে হিংসায় আক্রোশে জ্বলে ওঠে ও।

বন্ধুরা বলে, কেরানির চাকরি করিস, আর স্বপ্ন দেখিস সুন্দরী বউ হবে? কমলিকাকে ওর সাথে দেখে অফিসের দুজন কলিগ মুচকি হেসে বলেছিলো, ভায়া টাইম পাস বোঝো? তুমি হলে ওই সুন্দরী শিক্ষিতার টাইম পাস,

হালকা আবেগ, দুদিন পরেই যখন বাবা বিয়ের জন্য পাত্র দেখবে তখন কিন্তু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের গলায় মালা দেবে, তুমি রয়ে যাবে কবিতার খাতায় ব্যর্থ প্রেম হয়ে। কব্জি ডুবিয়ে প্রাক্তনীর বিয়েতে খাসির মাংস খেয়ে এসো ভায়া। প্রেমের মেয়াদ আঙুলে গুণে রাখো।

ভিতরে ভিতরে মনটা বিদ্রোহ করে উঠেছিলো মনীন্দ্রর। ও জানে কমলিকার পাশে ও বড্ড বেমানান, ভীষণ বেরঙীন, বলতে গেলে আনফোকাসড। মনীন্দ্র যখন কমলিকার সাথে পথ হাঁটে তখন ও খেয়াল করেছে লোকজন মনীন্দ্রর দিকে কেমন একটা অবিশ্বাসের চাউনিতে তাকায়। তাদের চোখে থাকে অবিশ্বাসী দৃষ্টি। মুখে যেন বলতে চায়, এই মেয়েটার বয়ফ্রেন্ড এটা?

প্রথম প্রথম মনীন্দ্রর রাগ হতো, লোকজনের প্রতি বিরক্তি উৎপাদন হতো, এখন অবশ্য গর্ব হয়। মনে মনে ভাবে, সবাই দেখুক ওর মত মধ্যমানের ছেলের গার্লফ্রেন্ড আরব্য রজনীর রাজকন্যা। দেখুক পথচলতি লোকজন, দেখুক পরিচিতরা, এতদিন যারা মনীন্দ্রর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাত তাদের চোখে ও ঈর্ষা দেখতে চায়, তবেই ও তৃপ্তি পাবে।

কমলিকার সুন্দর সরল মুখটার দিকে তাকিয়ে কখনো মনে হত বলে দিক নিজের আসল সত্যিটা। ও খুব নিডি ফ্যামিলির ছেলে। বাবার ব্যবসায় অনেক লোকসান, দিদির বিয়ের চাপে নিজের স্বপ্নগুলোর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা বাড়ির ছেলে। যারা স্ত্রীর স্বপ্নপূরণের সঙ্গী হয়না, যারা বিয়ে

করার সময় ভাবতে থাকে কাল থেকে বিজয়ার মা কামাই করলেও আর অসুবিধা হবে না। যারা গার্লস কলেজের সামনে দিয়ে পেরোনোর সময় আড়চোখে দেখে নেয় বিলাসী মেয়েগুলোর মুখগুলো। তারপর ভাবে, এমন স্মার্ট সুন্দরী বউ চাই, কিন্তু তার যেন নিজস্ব জগৎ না থাকে। সে যেন দিনরাত সংসারের জন্য পরিশ্রম করতে করতে চুল আঁচড়ানো, মুখে ক্রিম মাখার মত বিলাসিতার সময় না পায়। আবার বিছানায় শুয়ে উফঃ কোমরে ব্যথা লাগছে বলে কঁকিয়ে না উঠে, সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে স্বামীকে। মধ্যবিত্ত সুখ বলতে ওই মাঝে সাজে পুরী দিঘা, আর কখনো সখনো সিনেমা হলের অন্ধকারে পর্দায় কিছু কাল্পনিক চরিত্র দেখে আনন্দ পাওয়া। এমন একজন পারফেক্ট স্ত্রী চায় মনীন্দ্র। যার নিজস্ব কোনো মতামত থাকবে না, যে স্বামী শব্দের আগে পরে শ্রদ্ধা শব্দটা জুড়ে রাখবে।

মনীন্দ্র জানে কমলিকা এই গোত্রে পড়ে না। প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে কমলিকার একটা আলাদা সত্ত্বা আছে। ও আর পাঁচটা ঘরোয়া মেয়ের মত পরাধীনতা স্বীকার করার মেয়ে নয়। আর সেই জন্যই ওকে কব্জা করার নেশাটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলো মনীন্দ্রর মধ্যে।

কমলিকার চাঁপাকলির মত আঙুলগুলোর ওপরে হালকা চাপ দিয়ে মনীন্দ্র ফিসফিস করে বলেছিল, ওই যে দূরের দেবদারু গাছটা দেখছো, ওটাকে সাক্ষী করে কথা দিই তোমায়। নাকি ডুবন্ত সূর্যকে সাক্ষী করবো?

কমলিকার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এসেছিল, বলেছিল কাউকে সাক্ষী করতে হবে না মনীন্দ্র, আমি জানি যে আমার কবিতাকে আপন করে নিয়েছে, সে আমার স্বপ্নকেও আপন করে নেবে। তোমাদের বাড়ির ছাদে আমরা একদিন মাদুর বিছিয়ে বসবো, সেদিন আবৃত্তি করবো তোমার লেখা কবিতাগুলো।

মনীন্দ্র লজ্জা পেয়ে বলেছিল, ধুর, ওগুলো তো এলোমেলো শব্দবন্ধ, ওদের কবিতা বলো না প্লিজ।

কমলিকা আবেগী স্বরে উত্তর দিয়েছিল, বেশ করবো কবিতা বলবো। তোমার লেখা যে চারটে কবিতা তুমি আমায় উপহার দিয়েছো সেগুলো আমিও তোমায় উপহার দেব অন্যরকম করে। যেদিন আমি সম্পূর্ণ ভাবে তোমার হয়ে যাবো সেদিন তোমার কানে মুখ রেখে মুক্তি দেব তোমার আবেগদের।

মনীন্দ্র শিহরিত হয়েছিল, একটা অপরাধবোধ ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গিয়েছিল নিশ্চুপ ভাবে। কমলিকার চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টি যেন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল ওর বিবেককে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের বিবেকের সাথে লড়াই করে জিতে গিয়েছিল মনীন্দ্র। তাই কমলিকার সাথে ভালোবাসার অভিনয় করতে আর ভাবতে হয়নি ওকে। পাক্কা অভিনেতার মতই কমলিকার প্রেমিক হয়ে উঠেছিল মনীন্দ্র। যত দিন যাচ্ছিল কমলিকা একটু একটু করে আকৃষ্ট হচ্ছিল মনীন্দ্রর লিবারাল মানসিকতার প্রতি। মাঝে মাঝেই গঙ্গার পাড়ে ওর কাঁধে মাথা রেখে কমলিকা বলতো, জানো মনীন্দ্র, আমার কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয়,

মনে হয় এমন মানুষও আছে পৃথিবীতে যে আমার সব ইচ্ছেগুলোর মূল্য দেবে! মা বলে, মেয়েরা নাকি পরের বাড়ির সম্পদ, সেখানে গেলে অনেক কিছুই নিজের মনমত হয়না, অ্যাডজাস্ট করতে হয়। আমি তাতে রাজি আছি, অ্যাডজাস্ট তো করতেই হবে, ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন মানুষ, সব কিছু কি মনের মত হবে নাকি! কিন্তু জানতো আমার দুজন বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে, তারা এখন টিপিক্যাল হাউজ ওয়াইফ। পড়াশোনা বিসর্জন দিয়ে, গান, কবিতা ছেড়ে নিজেদের ইচ্ছেগুলোর মৃতদেহের ওপরে দাঁড়িয়ে ঘর সংসার করছে, স্বামীর কথায় ওঠে আর বসে, অদ্ভুত তাই না মনীন্দ্র! একজন মানুষ তার সমস্ত সত্ত্বাকে বিসর্জন দিয়ে হয়ে গেল অন্য একটা মানুষ, তার চাওয়া পাওয়াগুলো অবধি অর্থহীন হয়ে গেল ওই সংসারে। এর নাম আর যাইহোক ভালোবাসা নয়, অ্যাডজাস্টমেন্ট তো নয়ই, এর নাম স্যাক্রিফাইস।

একতরফা তিলে তিলে নিজেকে শেষ করার নাম কখনোই ভালোবাসা হতে পারে না। এদের কথা শুনে আর এদের পাল্টে যাওয়া দেখে আমার তো বিয়ে নামক বিষয়ে রীতিমত ভয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যবে থেকে তুমি এসেছো আমার জীবনে তবে থেকে বদলে গেছে আমার দৃষ্টিভঙ্গি। আমি বুঝেছি, এমন কেউও পৃথিবীতে আছে যে অন্যের ইচ্ছেগুলোর গুরুত্ব দিতে জানে। জানো মনীন্দ্র, আমি শুধু এই জন্যই তোমাকে এত ভালোবাসি। তুমি সাধারণ চাকরি করো, হ্যান্ডসাম নও, মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে হবার পরেও তুমি আমার কাছে একশোতে একশো

পেয়ে বসে আছো, বুঝলে। কারণ একটাই, তোমার উদার মানসিকতা, এমন বড় মন যে আকাশও লজ্জা পাবে। আর এমন উদার মনের অধিকারীকেই আমি পেতে চলেছি জীবনসঙ্গী হিসাবে, আমার বোধহয় আর কিছুই চাওয়ার নেই ভগবানের কাছে। তিনি তোমায় দিয়েছেন আমায়, আমার সব স্বপ্নপূরণ করার মানুষটাকে পেয়ে গেছি আমি, আর কি চাইবার আছে বলো!

মনীন্দ্র হাসিমুখে নিখুঁত ভাবে বলেছিল, ধুর পাগলী, তোমায় বদলাতে হবে না কিচ্ছু। গোটা কমলিকাটাকেই তো আমি ভালোবেসেছি। তার একটা অংশ যদি বদলে যায়, তাহলে আমার কমলিকার মিষ্টতা কমে যাবে একটু হলেও, এটা আমি আমার প্রাণ থাকতে হতে দেবো না। আমার গোটা কমলিকাকেই চাই, চাই তার উষ্ণতায় আমূল পুড়তে, চাই তার আদ্রতায় ভিজতে।

তাই কমলিকার সব ইচ্ছের, সব বেয়ারা আব্দারের দাবি মানার দায়িত্ব আজ থেকেই আমি নিলাম। অর্থ হয়তো আমার কম কিন্তু দুটো হাত দিয়ে আগলে রাখার ইচ্ছেটা রইলো অফুরান। মনীন্দ্রর কথার আবেশে ভেসে গিয়েছিল কমলিকা। নিজের দুই হাত আর একটা নিষ্পাপ মন দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল মনীন্দ্রকে। আর মনীন্দ্র তখন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল, হাই ক্লাস একটা মেয়ের অবুঝ ভালোবাসা। তৃপ্তি ..তৃপ্তিতে ভরে যাচ্ছিল ওর সব না পাওয়ার কষ্টগুলো। জয়ের আনন্দে ও তখন পরিপূর্ণ। প্রাপ্তির ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছিল ওর।

কমলিকার মনের রাজ্যে একাধিপত্য বিস্তার করার পর মনে হয়েছিল, ও ময়ূর সিংহাসনের অধিকারী হয়ে গেছে। কমলিকার বাবার অঢেল সম্পত্তি, আর ভাগিদার মাত্র দুজন, কমলিকা আর মালবিকা। তারমানে একটা অংশের মালিক মনীন্দ্র। তাই দিনরাত নিজেকে গরিব ভাবার আর কোনো কারণ ও খুঁজে পায়নি। অফিসের কলিগরা বলতো, তুমি গত এক বছরে বেশ বদলে গেছো মনীন্দ্র। ঝকঝকে স্মার্ট হয়েছ। মনীন্দ্র হেসে বলেছে, আচমকা লটারি প্রাপ্তি হয়েছে যে। হ্যাঁ, কমলিকাকে মনে মনে মনীন্দ্র কোটি টাকার লটারিই ভাবত। যাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলে ক্যাশে বসে থাকা মালিক অবধি বেশ তৎপর হয়ে বলে, ওরে কে আছিস, ম্যাডামদের অর্ডারটা নিয়ে আয় জলদি। ভিড় রেস্টুরেন্টে কমলিকার পাশে থাকার জন্যই এক্সট্রা মনযোগ পেত মনীন্দ্র। কমলিকা না বুঝলেও এগুলো ছিল মনীন্দ্রর জয়। ভীষণভাবে এনজয় করতো সারাজীবন লাইনের শেষে কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটা।

কমলিকার নীল রঙের শিফনের ওড়নায় লুকিয়ে থাকতো ওর নিখুঁত উদ্ধত শরীর। ওর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকতো নরম অথচ সাবধানী হাসি, দুই ভ্রুর তিলের মাঝে দৃঢ় আত্মমর্যাদা। এসবের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনীন্দ্র উত্তেজিত হয়ে পড়তো। মনে মনে ভাবত এই সবের মালিক ও। কমলিকার অহংকারের উষ্ণতা তখন ছুঁয়ে যেত মনীন্দ্রর মত অত্যন্ত সাধারণ মানুষকেও।

যবে থেকে মনীন্দ্র নিজের পজিশন ভুলে কমলিকার সাথে মিশে যেতে শুরু করেছিল তবে থেকেই পাল্টে যাচ্ছিল ওর বাহ্যিক আচার আচরণগুলো।

কমলিকা কলেজ শেষ করে ভর্তি হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে। ইংলিশ অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া মেয়ে ও, তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রফেসরদের কাছে পরিচিত নাম। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে এমন মুড়ি মুরকির মত ফার্স্ট ক্লাস পেত না স্টুডেন্টরা। তাই ব্যতিক্রমী ছাত্র ছাত্রীরা অবশ্যই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতো।

বি এড নয় মাস্টার্স ভর্তি হয়েছিল কমলিকা। রোজকার দেখা সাক্ষাৎ একটু কমেই গিয়েছিল। মনীন্দ্রর তখন ভয় ভয় করতো, যদি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে কোনো ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র বা প্রফেসরের প্রেমে পড়ে যায় কমলিকা, তাহলে তো চূড়ান্তভাবে হেরে যাবে ও। বারবার জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হওয়া মনীন্দ্র আর হারতে রাজি নয়। তাই আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলো কিছুতেই যেন কমলিকার পলকা আবেগী মন থেকে ওর অস্তিত্ব ফিকে না হয়ে যায়। সপ্তাহে একদিন করে একটা কবিতা লিখে উপহার দিতো কমলিকাকে। কবিতার অক্ষরগুলোতে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে কমলিকা বলতো, ইউ আর রিয়েলি ট্যালেন্টেড, কিন্তু ভাগ্যটা বড্ড বিরূপ তোমার, তাই এমন প্রতিভা থাকতেও কাজে লাগলো না। কমলিকা একবার উঠে পড়ে লেগেছিল ওর কবিতাগুলো ম্যাগাজিনে ছাপাবে বলে। কিন্তু অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে মনীন্দ্র বলেছিল, এসব আমার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি কমলিকা, শুধু তোমার জন্যই

এসব অনুভূতিরা ভাষা পেয়েছে। প্লিজ এদের পাবলিক করো না, এগুলো রেখে দাও তোমার মনের গোপন কুঠুরীতে। কমলিকা লালচে আলোয় স্নান করতে করতে নিচু গলায় বলেছিল, বেশ, আগলে রাখলাম এদের আমার হৃদয়ের সিন্দুকে, কোনো একদিন কানে কানে বলবো তোমায়।

রোজকার দেখা হওয়ার বদলে সপ্তাহে একদিনে দাঁড়িয়ে ছিল ওদের সাক্ষাৎটা। ওই একটা দিন খুব যত্ন করে সাজিয়ে রাখতো মনীন্দ্র ঠিক কমলিকার পছন্দ মত। কমলিকা রাগ করে বলতো, একদিনও কি একটু খুঁত ধরার ঝগড়া করার সুযোগ দেবে না আমায়। একদিন অন্তত এলোমেলো প্ল্যানে ভেস্তে যাক আমাদের এই সময়টুকু, তারপর গভীর অভিমানে মুখ দেখা দেখি বন্ধ! আমিও দেখতে চাই মনীন্দ্র, তুমি কি ভাবে আমার মান ভাঙাও।

মনীন্দ্র হেসে বলতো, উঁহু অভিমান করার সুযোগই দেব না তোমায়, অভিমানদের দূরে তাড়িয়ে দেব, তারা যেন কিছুতেই স্পর্শ করতে না পারে আমার কমলিকাকে।

কমলিকা ফিসফিস করে বলতো, মনীন্দ্র এত ভালোবেসো না আমায়। অপূর্ণতা শব্দটাকে এভাবে বঞ্চিত করো না তুমি, ওকেও রাখতে দাও আমার মনের কোণে। মনীন্দ্র বলতো, পাল্টে দেব ডিকশনারির কিছু শব্দ শুধু তোমার জন্য।

মাস্টার্স তখনও কমপ্লিট হয়নি কমলিকার, পার্ট টু-এর পরীক্ষা বাকি। হঠাৎই একদিন মধ্য দুপুরে ওর অফিসে

এসে দাঁড়িয়েছিল কমলিকা। থরথর করে কাঁপছিল ও। মনীন্দ্র দেখেছিলো অফিসের জোড়া জোড়া চোখ কৌতূহলে তাকিয়ে আছে কমলিকার দিকে। এমন সুন্দরী, বড়লোকের মেয়ে হঠাৎ ওর কাছে কেন! এই প্রশ্নটাই বেশির ভাগ মানুষের চোখে। চ্যাটার্জিদার ওপরে নিজের কাজের দায়িত্বটা দিয়ে কমলিকাকে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিল মনীন্দ্র। এলোমেলো পা ফেলছিলো কমলিকা। চোখে কেমন একটা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। এই দশদিনের মধ্যে কি এমন ঘটে গেল যে অসময়ে ওর অফিসে চলে এলো ও।

মনীন্দ্রর দুই ভ্রুর মাঝে দুশ্চিন্তার রেখারা প্রকোপ হলেও কোনো প্রশ্ন করছিল না ও কমলিকাকে। বরং ওর সাথে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটছিল। কমলিকার বোধহয় আরেকটু সময় দরকার নিজেকে প্রস্তুত করতে। সেটুকু সময় বিনা প্রশ্ন বাণেই হাঁটছিল মনীন্দ্র। একবার শুধু বলেছিল, জল খাবে? চোখের নিচে এই কয়েকদিনেই এমন গাঢ় ক্লান্তির চিহ্ন কেন? শরীর ঠিক আছে তো তোমার?

কমলিকা উত্তর দেয়নি, শুধু উদ্ভ্রান্তের মত একবার তাকিয়েছিল মনীন্দ্রর দিকে। আর যেন চলতে পারছে না, এমন ভাবেই ভারাক্রান্ত পা দুটোকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা পুরোনো বটের নিচের বাঁধানো বেদিতে বসে পড়েছিলো কমলিকা। মনীন্দ্রও বসেছিলো ওর পাশে।

মনের মধ্যে যতই দুশ্চিন্তারা এলোমেলো ঝড় তুলুক, কমলিকার সামনে মুখে কিছুতেই ওই উদ্বেগের প্রকাশ করেনি ও। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে কমলিকা

বলেছিলো, মনীন্দ্র তুমি আমায় সত্যিই ভালোবাসো? অদ্ভুত হেসেছিল মনীন্দ্র। কমলিকা নিশ্চয়ই রাতারাতি মনপড়ার যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেনি। ওর নিখুঁত অভিনয়ের ওপরে মনীন্দ্রর নিজেরই মারাত্মক আস্থা আছে। কোনো কোনো সময় তো নিজেই বুঝতে পারে না কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে। মুখোশ আর মনের মধ্যে পার্থক্য খুঁজতে হিমশিম খেতে হয় ওকেই। সেখানে কমলিকা রাতারাতি সব জেনে গেল এটা অবিশ্বাস্য। তাই অবলীলায় আরও একবার মিথ্যের আশ্রয় নিতেই পারে ও। বিশ্বাসে ভর করেই মনীন্দ্র বলেছিল, সন্দেহ হচ্ছে বুঝি আমার ভালোবাসার ওপরে! গত দুবছর আড়াই বছর হলো না, আজ হঠাৎ সন্দেহের কারণটা জানতে পারি কি? কমলিকা হঠাৎ মনীন্দ্রর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

কমলিকার মত সাহসী প্রতিবাদী মেয়েরাও কাঁদে? এমন মেয়েরাও পুরুষের বুকে নিরাপত্তা খোঁজে তাহলে, ভেবেই মনের মধ্যে আনন্দের বুদবুদ উঠেছিলো মনীন্দ্রর। কমলিকার পিঠে আলতো হাত রেখে বলেছিল, আগে বলো সমস্যাটা কি হয়েছে?

কমলিকা ভাঙা গলায় বলেছিল, বাবার বন্ধু সুশোভন আঙ্কেলের ছেলে তমাল সেও ডক্টর, এই সপ্তাহেই আসছে আমাদের বাড়িতে। বাবা আমার সাথে তমালের বিয়ের কথা পাকা করতে চায়।

বেশ জোরেই দীর্ঘশ্বাসটা বেরিয়ে এলো মনীন্দ্রর বুক থেকে। এত কিছু করেও শেষ রক্ষা করতে পারলো না ও।

হেরোর ট্যাগটা সেই কপালে চিপকেই গেল। কমলিকাকে ওদের সেন বাড়ির বারান্দায় কাপড় মেলতে, রান্নাঘরে সুক্ত রাঁধতে দেখার বড় শখ ছিল ওর। না সে শখ ওর মিটলো না। ভাগ্য কোনোদিনই মনীন্দ্রর সহায় হয়নি, আজও যে হবে না সে ব্যাপারে ও প্রায় নিশ্চিত ছিল। তবুও ভরসা ছিল কমলিকার নিঃস্বার্থ সরল ভালোবাসার ওপরে।

হারতে হারতেও শেষ চেষ্টা করলো মনীন্দ্র। কমলিকার হাতটা ধরে বলল, তুমি বাবার কথা মেনে নাও কমলিকা, আমি তোমায় সত্যিই অতটা সুখে রাখতে পারবো না যতটা তমাল রাখবে। ভিতরে ভিতরে হেরে যাওয়ার যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিল মনীন্দ্র। খুব মনে হচ্ছিল কমলিকার সুন্দর মুখটা আগুনে পুড়িয়ে দিতে। ওর গোলাপি ঠোঁটটা ফালা ফালা করে দিতে। কমলিকা যদি ওর না হয় তাহলে যেন কারোর না হয়! অদ্ভুত ভাবে সেইসময় নিজের হারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মনীন্দ্রর চোখ থেকে ঝরেছিলো দুফোঁটা জল। সেদিকে অপলক তাকিয়ে কমলিকা বলেছিল, তুমি কাঁদছো? পারবে আমায় অন্যের হয়ে যেতে দেখতে! আমরা যে একসাথে এত এত স্বপ্ন সাজিয়েছিলাম সেগুলোরই বা কি হবে! আর আমার ওই আকাশে দক্ষিণ কোণের উড়ন্ত ইচ্ছেগুলো যেগুলো শুধু তুমিই পারো পূরণ করতে তারাই বা কি বলবে! বলবে মনীন্দ্র সেন ভীষণ ভীতু, কমলিকার স্বপ্নপূরণ করতে হবে বলেই তাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিল। ইস, এ কথা তোমার সহ্য হলেও আমার হবে না গো।

কমলিকার ঝাপসা চোখে একটুকরো আলোর লুকোচুরির দিকে তাকিয়ে আবার জেতার আশায় বুক বেঁধেছিল মনীন্দ্র।

স্খলিত গলায় বলেছিল, কিন্তু তোমার বাবা যে কিছুতেই আমায় মেনে নেবেন না। কমলিকা ওর একটা হাতকে দৃঢ় ভাবে চেপে ধরে বলেছিল, বাবা যেমন তোমায় মেনে নেবেন না, তেমনি আমিও যে তমালকে মেনে নেব না মনীন্দ্র। আমি গত দুবছর প্রতি রাতে তোমায় ভেবেছি আমার জীবনসঙ্গী হিসাবে, আজ একটা ঝড় এসে সব এলোমেলো করে দিয়ে যাবে এটা কি করে হতে দিই বলো। তুমি শুধু একটাই কথা দাও মনীন্দ্র, এমন সমস্যার সময় আমায় একলা করে দেবে না। চলো আমাদের বাড়িতে চল, বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের সম্পর্কের কথা বলে আসবে।

কমলিকার কথাটা শুনেই বুকটা কেঁপে উঠেছিলো মনীন্দ্রর। অমন একটা হাই স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলিতে গিয়ে দাঁড়ানোটাই যথেষ্ট সাহসসাধ্য কাজ। তারপর তাদের বাড়ির মেয়েকেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আসার মত দুঃসাহসিক কাজ তো আর হয়না। কমলিকা নির্নিমেষ তাকিয়ে ছিল ওর দিকে, একটু আগের নোনতা জলের ধারা এখনও গালে শুকিয়ে দাগ হয়ে রয়েছে। এই কোমল মুহূর্তে যদি মনীন্দ্র কমলিকার প্রস্তাবে রাজি না হয়, তাহলে হয়তো ও ফিরে যাবে, আর হয়তো কখনোই ভরসা করে আসবে না ওর কাছে। বাধ্য হয়েই সাহসে ভর করে ও বলেছিল চলো তোমার বাড়িতে। কিন্তু

কমলিকা তোমার বাবা যদি মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দেন তখন তুমি কি করবে?

ও মনীন্দ্রর হাতের ওপরে নরম হাতটা রেখে বলেছিল, তখন আমি ঐ বন্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে আসবো।

মনীন্দ্রর হিসেব মতই এগোচ্ছে সব কিছু। ও নিজেও চায়না কমলিকা আরও পড়াশোনা করে এস্টাবলিসড হোক।

স্বাধীনচেতা মেয়েটা যদি নিজে রোজগার করতে শুরু করে, তাহলে হয়তো মনীন্দ্র আর ওকে মুঠোবন্ধ করে উঠতে পারবে না। সেন ফ্যামিলিকে দূর ছাই করতে ওর খুব বেশি দেরি হবে না।

সন্ধেবেলা যখন দাসগুপ্তদের বিশাল বাড়ির গেটের সামনে মনীন্দ্র পৌঁছেছিল তখন ওর সত্যিই নার্ভাস লাগছিলো। এই প্রথম ও কমলিকাদের বাড়িতে এলো। কমলিকার সাজপোশাক দেখে আন্দাজ করেছিল ওরা অবস্থাপন্ন ফ্যামিলি। কিন্তু সেটার পরিমাণটা যে এতটা মনীন্দ্র কোনোদিন আন্দাজ করতে পারেনি।

বিশাল গেটের প্রান্তে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সামনে বাহারি গাছের লন পেরিয়ে সাদা তিনতলা বাড়িটা যেন অহংকারের প্রতীক হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মনীন্দ্রর মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে, বেশ শীত শীত করছিল ওর।

ভাঙা গলায় বলেছিল, কমলিকা এটা তোমাদের বাড়ি? তুমি তো সত্যিই বাস্তবের রাজকন্যা। মনে মনে হিসেব করছিল মনীন্দ্র, এই সম্পত্তির অর্ধেকের বাজার মূল্য কত!

সারাজীবন কেরানির চাকরির বেতন জমালেও এই রকম আরেকটা বাড়ি করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। চোখের সামনে ভেসে উঠলো ওদের একতলা চারটে ঘরের বাড়িটা। ছাদে ওঠার সিঁড়ির কাজটা পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারেনি ও। এখনো ট্যাঙ্কির পরিবর্তে বড় একটা নীল রঙের ড্রাম বসানো আছে ওদের জলের ব্যবস্থায়।

আপাতত হয়তো কমলিকার বাবা ওদের বিয়েটা মেনে নেবেন না, কিন্তু আদরের মেয়ে কষ্টে আছে দেখলে নিশ্চয়ই জামাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াবেন। পালিয়ে বিয়ের ইতিহাস অন্তত তাই বলছে, প্রথমে অভিমানে দূরে সরিয়ে রাখা আর পরবর্তী সময়ে কাছে টেনে নেওয়া। সেই ভরসাতেই কমলিকাদের বিরাট ড্রয়িংরুমে পা দিয়েছিল মনীন্দ্র।

কিন্তু মনীন্দ্রর সব প্ল্যান ভেস্তে দিয়েছিলেন কমলিকার বাবা ডক্টর কমলেশ দাসগুপ্ত। তিনি মনীন্দ্রকে আর বাড়ির মালিকে সমতুল্য ভেবে সেরকমই ট্রিট করেছিলেন। মেহগনি কাঠের বার্নিশ করা সোফার নরম কুশনে শরীর ডুবিয়ে কমলেশ দাসগুপ্ত বলেছিলেন, বেরিয়ে যাও, ভবিষ্যতে যেন কখনো তোমায় এ বাড়ির আর কমলিকার ধারে কাছেও না দেখি। পুরোনো বাংলা সিনেমার ছবি বিশ্বাসকেও এতটা নিষ্ঠুর মনে হয়নি মনীন্দ্রর, কমলেশ দাসগুপ্তকে যেমন মনে হয়েছিল। এই ভদ্রলোক নাকি কার্ডিওলজিস্ট! নিজেরই হৃদয় বলতে কিছু নেই সে করে মানুষের হার্টের চিকিৎসা।

মনীন্দ্র বেশি কথা না বলে বেরিয়ে এসেছিল। সত্যি বলতে কি কমলিকার বাড়ির ড্রয়িংরুমে ও বড্ড বেমানান, সেটা বুঝেই ধীর পায়ে বেরিয়ে এসেছিল ওদের বাড়ি থেকে। গেটটা পেরোনোর আগেই কমলিকা ছুটে এসে হাতটা ধরেছিল মনীন্দ্রর। ফিসফিস করে বলেছিল, বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করো, আমি আসছি।

কিছুই মাথায় ঢুকেছিলো না মনীন্দ্রর। ওর মত ঠাণ্ডা মাথার ছেলেরও সব গুলিয়ে গিয়েছিল। চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা লাগছিলো শীতের কুয়াশা ঢাকা সকালের মত। ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলো মাথার মধ্যে। সন্ধেতারার দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে মনীন্দ্র ভাবছিলো, কমলিকারা দূরের মেঘমালা, ওদের ছুঁতে নেই, হাত পুড়ে যায়। ব্যর্থতার একরাশ গ্লানি এসে ঘিরে ধরেছিল মনীন্দ্রকে। কাল থেকে ওর জীবনে কমলিকা নেই, আবার সেই একঘেয়ে ছাপোষা জীবনের চরকা কাটা। তবুও কমলিকা অপেক্ষা করতে বলেছিল বলেই রাস্তার ধারে পথ চলতি লোকজনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মনীন্দ্র। এক একটা সেকেন্ড যেন কত দীর্ঘ প্রতীক্ষার কাল মনে হচ্ছিল মনীন্দ্রর।

।। ১০।।

আর কতকাল প্রতীক্ষা করবো বলতো ঈশা? আমার বাড়িতেও তো এবারে জানাতে হবে নাকি? অলরেডি খুড়তুতো দিদিরা আমার বিয়ের কথা বলছিল, আরে প্রবলেমটা কোথায়? তুমি যদি না বলতে পারো আমি গিয়ে তোমার বাড়িতে জানাচ্ছি। প্রবুদ্ধর গলায় অসহিষ্ণু ভাব

স্পষ্ট। বিরক্ত লাগছে ঈশার, দিন দুই প্রবুদ্ধর সাথে খুব দায়সারা ভাবে কথা বলেছে ও। এমনকি ওর সাথে মিট করার ব্যাপারেও গড়িমসি করে শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছে ঈশা। অর্কপ্রভর সাথে যেদিন থেকে ওর সামনা সামনি পরিচয় হয়েছে সেদিন থেকে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে ওর। প্রবুদ্ধর ফোন কলস, ওর সাথে গল্প করার ইচ্ছেটা যেন একেবারেই মরে গেছে।

আজকেও অর্কর সাথে মিটিং আছে ঈশার। না, স্টুডিওতে নয় অর্কর ফ্ল্যাটে। ওর পরের মুভিতে ঈশাকে কি ভাবে ব্রেক দেওয়া যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করবে বিশিষ্ট ক্যামেরাম্যানের সাথে। সেই জন্যই অর্কর ফ্ল্যাটে যেতে বলেছে, বিষয়টা আপাতত সিক্রেট রাখতে বলেছে অর্ক। ইন্ডাস্ট্রিতে নাকি সারাবছর রেষারেষি চলে। কখন কে কাকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাবে কেউ জানে না। তাই নতুন মুখকে আনার সময় ভীষণ ভাবে গোপন রাখতে হয় পরিচালকদের। ঈশা সকাল থেকেই কোন পোশাকটা পরবে তাই নিয়ে মারাত্মক কনফিউজড, এর মধ্যে এবার বাড়তি ঝামেলা প্রবুদ্ধর ফোন। এই ছেলেটা এতটাই ইন্টিলিজেন্ট যে ওর গলার স্বর শুনেই বুঝে যায় সামথিং ইজ রং। এর আগে অবশ্য প্রবুদ্ধর এই গুণটার জন্যই ওকে এত ভালোলাগত ঈশার। ঈশার চোখের দৃষ্টি দেখে প্রবুদ্ধ বলে দিত ঈশা আনন্দে আছে না দুঃখে। কিন্তু এই মুহূর্তে এসব গুণ জাস্ট বিরক্তিকর লাগছে। তার মধ্যে প্রবুদ্ধর আরেকটা চূড়ান্ত বাজে স্বভাব আছে, ছেলেটা বেশ পজেসিভ টাইপ। ঈশা যেন শুধু ওর, এমন একটা ভাব

করে প্রবুদ্ধ। এতদিন এসবকে ঈশার ভালোবাসার লক্ষণ বলে মনে হতো, এখন মনে হয় অত্যন্ত ব্যাকডেটেড একটা ছেলে। প্রেমিকাকে আগলে রাখার প্রচেষ্টা। আরে প্রেমিকা কি খেলনা নাকি যে নিজের আয়ত্তে রাখবে! এতদিন ভাল লেগেছে, ঈশা থেকেছে প্রবুদ্ধর সাথে। এখন ওকে ভালো লাগছে না তবুও বাকি জীবনটা ওর সাথেই চালাতে হবে এমন কোনো যুক্তি আছে নাকি!

প্রবুদ্ধর সাথে যখন ঈশার প্রেম হয়েছিল তখন ওর থেকে কোনো ভালো অপশন ছিল না ঈশার হাতে। অবস্থাপন্ন বাড়ির একমাত্র ছেলে, নিজের বিশাল বিজনেস। চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে ব্যবসার বিশালতার জন্য।

কথায় কথায় দামি গিফট, যেগুলো ঈশা কোনোদিনই ওর বাবার কাছ থেকে আশা করেনি, নামি রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া, দামি গাড়ি করে ঘোরার সময় মনে হয়েছিল প্রবুদ্ধই ওর জ্যাকপট। কিন্তু যবে থেকে অর্কপ্রভর সাথে ওর সাক্ষাৎ হয়েছে তবে থেকে মনে হচ্ছে, অর্থের সাথে সাথে এমন কিছু দরকার যাতে ঈশাও নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রবুদ্ধকে বিয়ে করলে ও কোনোদিনই ঈশা সেন বলে পরিচিত হতে পারবে না। কিন্তু যদি অর্কর সাথে ওর সম্পর্কটা হয়ে যায় তাহলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ও হয়ে যাবে পরিচিত নাম। অস্বীকার করার জায়গা নেই যে প্রবুদ্ধ ওর জন্য অনেক করেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে বিয়ে ঈশা ওকে করতে পারবে না। ইনফ্যাক্ট ওর আজকের এই পরিচিতির পিছনেও প্রবুদ্ধর অবদান আছে। ওই প্রথম বলেছিল, একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলে দিই, আমিই সব

ব্যবস্থা করবো, তুমি শুধু মন দিয়ে কবিতাটা বলবে। স্টুডিও ভাড়া করে রেকর্ডিং করানোর দায়িত্বও আমার।

ঈশা বলেছিল, কিন্তু এটা তো ব্যয় সাপেক্ষ প্রবুদ্ধ!

প্রবুদ্ধ হেসে বলেছিল, আমার হৃৎপিণ্ডের বুঝি মূল্য নেই? তার প্রতিটা শ্বাস প্রশ্বাস, তার প্রতিটা রক্তবাহী নালি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বুঝলে ঈশা। আমার সেই হৃৎপিণ্ডকে আনন্দে রাখতে এইটুকু খরচ আমি করতে পারবো না বুঝি?

ঈশা লজ্জায় আরক্ত হয়ে বলেছিল, তোমার সেই মূল্যবান হার্টটা বুঝি আমি?

প্রবুদ্ধ ঘাড় নেড়ে জোর গলায় বলেছিল অফকোর্স তুমি, তুমি ছাড়া আমি তো নিঃশ্বাস নিতেই পারি না এখন, তাই ভেবে ভেবে বার করলাম আসল সমস্যাটা কোথায়! বুঝলাম, আমার হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাবে তোমায় ছাড়া। তাহলে এবারে বলো, আমার হৃৎপিণ্ডটা কে!

পোষা বেড়ালের মত আদুরে গলায় ঈশা বলেছিল, এত ভালোবাসো তুমি আমায়?

প্রবুদ্ধ এক নিঃশ্বাসে বলেছিল, তোমায় নয় নিজেকে বাসি, তুমি আমি কি আলাদা নাকি!

ঈশা জানে, শুধু জানে নয় অনুভব করে প্রবুদ্ধ ওকে ভীষণ রকমের ভালোবাসে, বড্ড বেশি খেয়াল রাখে, তবুও মনের ওপরে তো কারোর হাত নেই, তাই হয়তো প্রবুদ্ধর এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকেও পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ঈশার। মোট কথা ও বেশ বুঝতে পারছে, অর্কর সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে

ভালোবাসা নামক ফোর ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ডের মানে পরিবর্তিত হয়ে গেছে ওর কাছে।

আবারও একরাশ বিরক্তি উগলে দিয়ে ঈশা বললো, প্লিজ প্রবুদ্ধ বিরক্ত করো না, আমি অসুস্থ, প্রচণ্ড জ্বর, মাথা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি আমি, আর তুমি এখন নানা রকম আর্গুমেন্ট শুরু কোরো না।

ঈশা বুঝতে পারলো ওর কথায় কাজ হয়েছে, থেমে গেলো প্রবুদ্ধ। তারপর চিন্তিত স্বরে বললো, ডক্টর দেখিয়েছো? এটা কিন্তু ভাইরাল ফিভার, খুব হচ্ছে এই সিজন চেঞ্জের সময়।

ঈশা একটু থেমে বললো, ডক্টর রেস্টে থাকতে বলেছেন, এখন রাখছি প্রবুদ্ধ, বাই...

প্রবুদ্ধকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ফোনটা কেটে দিলো ঈশা। উফ, ইরিটেটিং। আবার নিজের আলমারির দিকে তাকালো ঈশা। কেমন পোশাক পছন্দ করে অর্কপ্রভ, সাহসী নাকি সনাতনী?

কোনো এক সাক্ষাৎকারে পড়েছিলো অর্কর পছন্দের রং চেরি রেড। রেড কালার নাকি স্পর্ধার প্রতীক। মেরুদণ্ড সোজা করে নিজেকে প্রমাণ করার লড়াইয়ে মায়াবী নীল বা আদুরে গোলাপিকে পিছনে ফেলে অবশ্যই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে দুঃসাহসী লাল। এমনকি সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতেও তার জুড়ি মেলা ভার। তাই ব্লাডরেড বা চেরি রেড অর্কর পছন্দের রং।

আর সময় না নিয়েই রেড টপ আর ব্ল্যাক রেডের কম্বিনেশনে শর্ট স্কার্ট বেছে নিলো ঈশা।

বাথরুমের দিকে যাবার পথেই মায়ের শীতল দৃষ্টির সম্মুখীন হলো ও। মা খুব ধীর অথচ দৃঢ় গলায় বলল, প্রবুদ্ধকে মিথ্যে বললে কেন? কে প্রবুদ্ধ?

ঈশা ছিটকে চড়া গলায় বলল, আড়ি পাতছিলে তুমি আমার রুমে? আমার ফোনের কথা শুনছিলে?

লজ্জা করে না তোমার? আমি বলছি পাপাকে যে তুমি আমার পারসোনাল বিষয়ে মন্তব্য করছ! আর শোনো মা, তুমি আমার গর্ভধারিণী হলেও আমি সেটা স্বীকার করতে লজ্জা পাই। একজন অশিক্ষিত আনকলাচার্ড মহিলাকে মা ভাবতেই জাস্ট ঘৃণা হয় আমার। ভাবতেও লজ্জা করে একদিন তোমার কাছে আমার কবিতার হাতেখড়ি হয়েছিল। যে মানুষটা কবিতার ক বোঝে না সেও নাকি কবিতা শেখাচ্ছে, ভাবা যায়! পিওর জেলাস বুঝলেন মিসেস রিনা সেন! নিজের মেয়েকে তুমি হিংসা করো। এই যে আমার এখন চারিদিকে এত পরিচিত অথচ আমায় কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি কাউকেই বলি না যে আমার মায়ের কাছেই আমার কবিতার হাতেখড়ি, তাই বোধহয় হিংসেটা জ্বলুনিতে পরিণত হয়েছে তাই না! শোনো মা, আমি সারাজীবন আমার কবিতার এই সাফল্যের জন্য বাবার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। কারণ বাবা যদি সেদিন জেদ করে তোমার নাগাল থেকে আমায় সরিয়ে আম্রপালি রায়ের কাছে না নিয়ে যেত, তাহলে আজকের ঈশা সেনের পরিচয়টা তোমার ঐ সাজানো রান্নাঘরের মধ্যেই

রয়ে যেত। তাই এই ক্রেডিটটা আমি বাবা আর আমার টিচার আম্রপালি রায়কেই দেব। নিজেকে ওনার ছাত্রী বলার সময় গর্বে আমার বুকটা ভরে যায়। হিংসা হয় তাই না মা! হিংসে না করে তাড়াতাড়ি যাও আমার খাবার রেডি করো, ওই দেখ রান্নাঘরটা তোমার বিরহে কাঁদছে তো। দাদাভাই বলছিলো, একটা রাঁধুনি রাখবে বাড়িতে, বুঝতেই পারছো রান্নাঘরের অধিকারটাও হারাবে তুমি। যাও সাবধানে নিজের জায়গায় ফিরে যাও। ঈশা সেনের অভিভাবক হবার চেষ্টা করো না।

কমলিকা আরও কঠিন গলায় বলল, প্রবুদ্ধ কে আমি জানি না, তবে তাকে ঠকিও না। ঠকানোটা তো তোমার ব্লাডে আছে তাই বললাম।

ঈশা ওই মহিলার আবোলতাবোল কথায় গুরুত্ব না দিয়ে চলে গেল বাথরুমে।

ওর হাতে সময় নেই, সকাল সাড়ে এগারোটায় অর্কর সম্মুখীন হবে ও। সব দিক থেকেই নিজের বেস্টটা দিতে চায় ঈশা অর্ককে। মাথায় শ্যাম্পু করতে করতে বাথরুমের আয়নায় নিজের দিকে একবার তাকালো ও। লোকে বলে ও নাকি মায়ের মত দেখতে হয়েছে। হয়তো তাই, বাবার মত শ্যামলা নয়, ঈশা বেশ ফর্সা, মায়ের মতো লম্বা হয়েছে ও। মায়ের অল্পবয়েসের কোনো ছবিই নেই এবাড়িতে। তবুও অ্যালবামে বিয়ের গোটা দুয়েক ছবি দেখেই ঈশা বুঝেছিলো মা এককালে রীতিমত সুন্দরী

ছিল। দীর্ঘদিনের চূড়ান্ত অযত্নই আজ মাকে এমন করে দিয়েছে।

ঈশা জানে ও মনে মনে ওই মহিলাকে হিংসে করে। রিনা সেনের ধৈর্য, ওর হাতের নিখুঁত সব কাজ, এমন কি কবিতাটাও মা ওর থেকে ভালোই বলে। জানে বলেই দিনরাত অপমান করে করে মায়ের মেরুদণ্ডটা দুর্বল করে দিয়েছে ঈশা। যাতে কোনোদিন প্রিয় রান্নাঘরে দাঁড়িয়েও দুলাইন কবিতা বেরিয়ে না আসে রিনা সেনের মুখ থেকে।

বাবাই বলেছিল, খেয়াল রাখিস তোর মা যেন আবার কবিতা বলতে শুরু না করে, তাহলে কিন্তু তোকে প্রথম ঘরের কম্পিটিটরকে হারাতে হবে।

ঈশা ক্লাস এইট থেকেই বুঝেছিলো সব বিষয়ে ওই মহিলার বেশ দখল আছে। যদিও বাবা বলেছিল, তোর মা তেমন পাশটাশ করা নয়, ওই আরকি। তবুও ঈশা বুঝতো, মা প্রায় সবই পারে। তাই মাকে দমিয়ে রাখার জন্যই ও আর দাদাভাই ক্রমাগত আক্রমণ করে যেত ওই মহিলাকে। বাবা আর ঠাম্মার প্রশ্রয়ে এই কাজটা করতে বেশ মজাই লাগতো। কাজও হয়েছিল বেশ দ্রুতই। ধীরে ধীরে রিনা সেন নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। আর আগ বাড়িয়ে শাসন করতে আসতো না ওদের দুজনকেই। কিন্তু মাঝে মায়ের এই নিঃশব্দ কর্তব্যবোধ চুড়ান্ত বিরক্ত লাগতো ঈশার। খুব চাইতো, ঈশার কথায় প্রতিবাদ করে উঠুক ওই পাথর মূর্তি। তাহলে আরও অপমান করবে ঈশা। কিন্তু কিছুতেই জিততে পারতো না ঈশা, ওর হাজার ঝাঁজালো

কথার উত্তরে রিনা সেন বলতো, তুই কি আজ টিফিনে পরোটা নিবি?

অপমানে কালো হয়ে যেত ঈশার মুখ। ওর কথাগুলোকে জাস্ট ইগনোর করতো মা, তাই রাগে গজগজ করতো ঈশা। নিউটনের তৃতীয় সূত্রও বোধহয় ওই মহিলার ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। এত আঘাতের পরেও নিশ্চুপ হয়ে থাকে কি করে মানুষ! ঈশা জানে দাদাভাই আর বাবারও একই প্রশ্ন, এবং ওরাও কোনো না কোনো ভাবে হেরে গেছে মায়ের কাছে।

এসব এলোমেলো ভাবনা ছেড়ে ওর মাথায় এলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, প্রবুদ্ধকে ওর চারপাশ থেকে সম্পূর্ণ মুছে কি ভাবে ফেলবে সেটা ভাবতে ভাবতেই ভিজে চুলে পিঙ্ক কালারের টাওয়েলটা জড়িয়ে নিলো ঈশা। যেভাবেই হোক প্রবুদ্ধর অস্তিত্ব মুছে ফেলতে হবে নিজের জীবন থেকে। অর্কর ঘনিষ্ঠ হবার জন্য প্রথম কাজ হলো, প্রবুদ্ধর গার্লফ্রেন্ডের পরিচয় থেকে নিজেকে বের করে আনা। ব্লাড রেড টপটা পরে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতেই ফোনটা বেজে উঠলো। অর্কর ফোন। একটা আনন্দের ঢেউ এসে ঈশার শরীরে ঝাপটা দিয়ে গেল যেন।

ফোনটা রিসিভ করেই ঈশা বললো, রেডি হচ্ছি, পাংচুয়ালিটি আমিও জানি মশাই। ওপ্রান্তে অর্কর হাসির শব্দে শিহরিত হলো ঈশা। গুন গুন করতে করতে খাবার টেবিলে এসে বসলো,

"প্রথমত আমি তোমাকে চাই
দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই
তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই
শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই।

।। ১১।।

শেষ পর্যন্ত মনীন্দ্রকেই চাই ভেবেই বয়েসের প্রমাণ পত্র, নিজের রেজাল্টের ফাইল, বইপত্র, আর অল্প কিছু পোশাক নিয়ে বাবা মা বোনের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল কমলিকা। বাবা বলতো, দাসগুপ্ত ফ্যামিলির অহংকার নাকি কমলিকা। সেই অহংকারের বেড়াজাল ডিঙিয়ে ও সেদিন পা রেখেছিলো রাজপথে। বাবা স্থবিরের মত দেখছিল কমলিকার ঔদ্ধত্য, মা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, ভুল করছিস কলি, তুই পারবি না অমন মধ্যবিত্ত পরিবারের বউ হয়ে বাঁচতে।

বোন ছুটে এসে সঞ্চয়িতাটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুই না এর দিব্বি করে বলেছিলিস, তুই কখনো কবিতা বলা ছাড়বি না, কবিতার কালো অক্ষরগুলো যত দিন না তোকে ছেড়ে চলে যায় ততদিন পর্যন্ত। সব কেন মিথ্যে করে দিতে চাইছিস দিদিভাই!

কমলিকা দৃঢ় গলায় বলেছিল, মনীন্দ্র আমার স্বপ্নপূরণের দায়িত্ব নিয়েছে রে।

বাবা নির্বিকার গলায় বলেছিল, আর কখনো যেন এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙবে না, আমার এক সন্তান আজ থেকে মৃত। আমাদের মৃত্যু সংবাদেও এ বাড়িতে ফিরবে না তুমি, কথাটা মনে রেখো। আজ এবাড়ির সবটুকু সম্মান

নিয়ে তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ, কখনো যেন তোমার মুখ দেখতে না হয় আমায়। কমলিকা বলেছিল, তোমার দাম্ভিকতা আগলে তুমি থাকো বাবা। ভালোবাসা, স্বপ্ন দেখা, ইচ্ছে ঘুড়ির নানা রং তুমি দেখতে পাবে না ওই অহংকারী দৃষ্টি দিয়ে।

রাজপথে মনীন্দ্র দাঁড়িয়ে ছিল একা। ওর চোখে হতাশার চিহ্ন স্পষ্ট। দৃঢ় পায়ে দাসগুপ্ত পরিবারের গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল কমলিকা। ওকে দেখে মনীন্দ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, কি গো রাজি করাতে পারলে বাবা, মাকে?

কমলিকার দুটো চোখ ছাপিয়ে জল নেমেছিল সেদিন। ওর চোখে যে এত নোনতা জলের উৎস আছে কোনোদিন জানতেই পারেনি ও। মা বলতো, কমলিকা নাকি কোনোদিন তেমন কাঁদুনে ছিল না। যেমন ছিল মালবিকা। কমলিকা নাকি ছোট থেকেই কেউ বকলে চুপ করে থাকতো। দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থাকতো স্থির হয়ে। মুখ চোখ লাল হয়ে যেত কিন্তু কিছুতেই নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতো না কারোর কাছে।

চিরকালই ও নিজের অবাধ্য কষ্টগুলোকে দমন করেছে কঠিন হাতে। কিছুতেই তাদের বাইরে আসতে দেয়নি। তাই নিজের নিশ্চিন্ত গৃহকোণ, পছন্দের ঘর, বিছানা ছেড়ে আসার সময় যন্ত্রণা হচ্ছিল কমলিকার বুকের বাম দিকে। তবুও ওই দুঃসহ যন্ত্রণাটার গলা টিপে কঠিন হাতে দমন

করেছিল ও। মুখের রেখায় ফুটে উঠতে দেয়নি সব হারানোর দুঃখগুলোকে।

দাসগুপ্ত বাড়ির গেটের বাইরে পা দিতেই গেটটা বন্ধ করে দিলো বাসু জেঠু। এটাই নিয়ম এ বাড়ির। কেউ বেরোনোর আগে গেট খুলে দাঁড়ায় বাসু জেঠু, আবার বেরিয়ে গেলেও গেটটা বন্ধ করে দেয়। বাসু জেঠুকে জন্মে থেকে ওদের সিকিউরিটির কাজ করতে দেখছে কমলিকা। যেন ওদের পরিবারেরই একজন। আজ যখন বাসু জেঠু জিজ্ঞেস করলো, এখন আবার কোথায় বেরোচ্ছেন? ফিরবে কখন? গাড়ি নেবে না মামনি? তখনই বুকের ভিতরের জমা বরফটা উষ্ণতা পেয়ে গলতে শুরু করেছিল। অস্ফুট একটা কথাই বলেছিল কমলিকা, ভালো থেকো জেঠু।

বাসু জেঠু অবুঝের মত তাকিয়েছিল ওর দিকে। মালিকের মেয়ে বলেই হয়তো আর প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি শুধু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কমলিকার দিকে। পিছন ফিরে তিনতলার দক্ষিণের ঘরটা দেখেছিলো আরেকবার। ঘরে এখনো লাইট জ্বলছে। তাড়াহুড়োয় ও নেভাতে ভুলে গেছে। ওর নিজের ঘর ছিল এতদিন পর্যন্ত ওই ঘরটা। ওই ঘরের প্রতিটা আনাচকানাচ কমলিকাকে চেনে। ডিভানের পিঙ্ক আর স্কাইব্লু মিকি মাউসের বেড কভারটা ও কিনেছিল পছন্দ করে। টেবিলের গোল্ডেন ল্যাম্পটা, যেটা জ্বালিয়ে ও পড়তো রাত পর্যন্ত সেটাও তো পড়ে রইলো ওই ঘরে। আর কাঠের আলমারি জোড়া ওর

যত প্রাইজ সব ওর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলছিলো, আমাদেরও নিয়ে যাবে না তোমার সঙ্গে! বই, মেডেল, শোপিসগুলো জিতে এসে যখন বাবার হাতে দিত কমলিকা তখন বাবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলতো, তুই হলি ডঃ কমলেশ দাসগুপ্তর অহংকার, সেই রাজার মুকুটে কোহিনুর হীরের মত।

সেই বাবাই আজ অভিমানে ওকে এতটা পর করে দিতে পারলো!

মনীন্দ্র আবারও উচ্ছসিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কি গো, ভিতরে যাবে না? যাক, শেষ পর্যন্ত তাহলে তোমাদের এই বিশাল লনেই আমাদের রিসেপশন হচ্ছে তাই তো?

কমলিকা ক্লান্ত অবসন্ন গলায় বলেছিল, মনীন্দ্র চল, এই বাড়ির গেট আমাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

মনীন্দ্র এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছিল, মানে? কোথায় যাবে তুমি? ওই একটা ব্যাগে কিছুই তো নিতে পারো নি, চলবে কি করে তোমার? তুমি থাকবে কোথায়?

কমলিকা ছলছল চোখে তাকিয়ে বলেছিল, কেন তোমার কাছে থাকবো। এখন থেকে তুমিই তো আমার সবটুকু।

মনীন্দ্র একটু সামলে নিয়ে বলেছিল, এক কাজ করো, তুমি আজ রাতটুকু কোনো বান্ধবীর বাড়িতে থেকে যাও, কাল ভেবে চিন্তে একটা কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। তাছাড়া আমি তো বাড়িতে কিছুই বলিনি সেভাবে, হঠাৎ বিয়ে করবো বললেই তো চলে না, বাবা, মাকে

ভালোভাবে বোঝাতে তো হবে। তাদের রাজি করাতে হবে। তারাও যদি তোমার বাবা, মায়ের মত অস্বীকার করে বসে তখন তো গাছতলায় ঘর বাঁধতে হবে কমলিকা। অন্তত একটা রাত সময় দাও।

কমলিকার ভাবনাশক্তি কেমন যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কোনো মতে ট্যাক্সি করে শ্রাবণীর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলো ও। শ্রাবণী অবশ্য অনেকবার বলেছিল, ভুল করছিস কমলিকা, এভাবে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসাটা খুব বড় ভুল। কমলিকার চোখে তখন জেদ, অভিমান আর মনীন্দ্রর ওপরে চূড়ান্ত বিশ্বাস আর কিছু একান্তে দেখা স্বপ্নের হাতছানি। তাই শ্রাবণীর কথায় বিশেষ কিছু হেলদোল হয়নি কমলিকার।

কি ভাবে ব্যবস্থা করেছিল মনীন্দ্র সেটা অবশ্য কমলিকার কাছে অজানাই রয়ে গেছে। তবে ও এসে বলেছিল, কমলিকা দিন পনেরো পর আমাদের বিয়ে, এর আগে কোনো ডেট নেই, মা পুরোহিত ডেকে ডেট ফাইনাল করেছে। তুমি কি একবার তোমার বাড়িতে জানিয়ে দেবে ডেট টা, যদি ওনারা আসেন ওইদিন।

দেখো মেনে না নিয়ে যাবেই কোথায়, বাবা মা তো আফটার অল।

কমলিকা দৃঢ় গলায় বলেছিল, না, ওবাড়িতে আর কোনো খবর যাবে না। মনে পড়ে যাচ্ছিলো বেরোনোর আগের মুহূর্তে বাবার বলা কথাগুলো। শুকনো চোখে,

তীক্ষ্ন গলায় বাবা বলেছিল, আর কখনো এসো না আমার সামনে।

কথাগুলো মনে পড়েই শক্ত হয়েছিল কমলিকার চোয়াল। হয়তো ওর অগ্নিদৃষ্টির দিকে তাকিয়েই সেই মুহূর্তে থেমে গিয়েছিল মনীন্দ্র। কিন্তু হিসেবে একটা বড় ভুল করেছিল ও। ভাবতেই পারেনি আর কোনোদিন ডক্টর কমলেশ দাসগুপ্তর সাথে যোগাযোগ হবে না কমলিকার। ওর বাবার অত সম্পত্তির ভাগ যে মনীন্দ্র পাবে না সেটা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেনি ও।

বিয়ের দিন নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল কমলিকার সমস্ত ইচ্ছার মৃত্যু ঘটানো। সেন বাড়ির প্রতিটি মানুষকে যেন কেউ বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে কমলিকাকে সব দিক থেকে হেনস্থা করার জন্য। মনীন্দ্রর মা দুদিন অন্তর বলতে শুরু করেছিল, এই যে শুনলাম মনি বললো, খুব বড়লোকের মেয়ে, প্রচুর টাকা পয়সা দেবে, সেসব কোথায় গেল, একটা নমস্কারীও তো পেলাম না।

মরমে মরে যেত কমলিকা। বিয়ের আগের পরিচিত মনীন্দ্রও যেন কেমন অচেনা হয়ে যেতে শুরু করলো।

চেনার ভিড়ে অচেনা কেউ যেন। ধীরে ধীরে কমলিকার কাছ থেকে কোনো এক বিশেষ কায়দায় কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল ওর ইচ্ছে উড়ানটাকে। প্রথমেই মনীন্দ্র বলেছিল, আচমকা বিয়ে করে সংসারে মেম্বার বাড়ানোর প্ল্যান আমার ছিল না রিনা, তাই আপাতত খরচ অনেক বেড়েছে, এই মুহূর্তে তোমার ইউনিভার্সিটির পড়াশোনার

খরচ চালানো আমার কম্ম নয়। এক কাজ করো, তুমি বরং একদিন দাসগুপ্ত বাড়িতে চলে যাও, গিয়ে বলো আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা, তাহলে হয়তো তোমার বাবা তোমার পড়াশোনার ব্যাপারে হেল্প করবেন।

অপলক তাকিয়ে ছিল কমলিকা মনীন্দ্রর মুখের দিকে। এই সেই মানুষটা, যে ওর হাত ধরে কথা দিয়েছিল, কমলিকার সব স্বপ্নপূরণ করবে! বড্ড অচেনা লাগছিলো মানুষটাকে। কমলিকা বলেছিল, তাহলে আমি টিউশনি শুরু করি মনীন্দ্র।

ওর বাবা গম্ভীর স্বরে বলেছিল, সেন বাড়ি মধ্যবিত্ত হতে পারে কিন্তু এ বাড়ির বউ সকালবেলা বেরিয়ে ছাত্র পড়াতে যাবে না। আমাদের একটা সম্মান আছে। মনীন্দ্রও বাবার সুরেই সুর মিলিয়ে বলেছিল, অনেক তো পড়লে রিনা, এবারে মন দিয়ে সংসার করো।

ছাপোষা বাড়ির রান্নাঘরে কমলিকা দাশগুপ্তের চারা মাছ বাছা, মোচা কাটার ট্রেনিং চলছে তখন। বহুবার কমলিকা ভেবেছিল, সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে বাপের বাড়িতে। কিন্তু ইগো নামক বস্তুটি মাঝপথে এসে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবুও চেষ্টা করেছে সেন বাড়িতে মানিয়ে নিতে। মনে মনে ভেবেছে মনীন্দ্র হয়তো একটু সামলে নিয়েই ওকে আবার সব কিছুর সুযোগ করে দেবে। আশায় আশায় রোজই সূর্যোদয় দেখছিল ও। দিনের শেষে সন্ধেটা ছিল ওর একান্ত নিজস্ব সময়। যখন ও কবিগুরু আর কাজী নজরুলের সাথে নির্জনে সময় কাটাতো। মাঝে মাঝে

অবশ্য কবি সুকান্ত এসে স্বপ্ন ভঙ্গ করে যেতেন, পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটির সাথে তুলনা করে ক্ষতবিক্ষত করে যেতেন, তবুও কবিগুরুর "সাধারণ মেয়ে"র সাথে কমলিকাও পাড়ি দিতো সাত সমুদ্রের পাড়ে।

এ বাড়িতে বেশি বই নেই। হাতে গোনা কয়েকটা। হয়তো ওর সাথে প্রেমপর্ব চলার সময়েই মনীন্দ্র কবিতার বইগুলো কিনেছিল। বইগুলো বেশ নতুন, ঝকঝকে। একটা ছোট আলমারিতে গোছানো থাকতো বইগুলো। তবুও জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে ওদের গন্ধটা বুকের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভরে নেবার চেষ্টা করতো কমলিকা। এমনই এক সন্ধেতে অনামি প্রবীর রায়চৌধুরী নামের একজনের একটি পাতলা চটি বই আচমকাই হাতে এসেছিল কমলিকার। পাতা উল্টেই চমকে উঠেছিলো ও। বুকের ভিতর শুরু হয়েছিল রক্তক্ষরণ। ও তাহলে একটা ফ্রডকে বিয়ে করেছে, আসলে মনীন্দ্র একটা মিথ্যেবাদী। এতদিন ধরে ভালোবাসার অভিনয় করেছে ওর সাথে, ওর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েছে মনীন্দ্র!

এই কবি প্রবীর রায়চৌধুরীর কবিতাগুলোই মনীন্দ্র নিজের লেখা বলে চিঠিতে লিখতো কমলিকাকে।

কমলিকা ভাবত এমন যার ভাষায় দখল সে মানুষ তো নিজেই একজন কবি। তাই হয়তো ওর কবিতার অক্ষরদের এত ভালোবাসে মনীন্দ্র। পাতার পর পাতা উল্টে পড়ছিল কমলিকা, প্রতিটা কবিতা কবি মন প্রাণ ঢেলে লিখেছেন। উৎসর্গ করেছেন তাঁর স্ত্রীকে। যিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত পেশেন্ট।

নিজের ওপরে অসম্ভব রাগ হচ্ছিল কমলিকার। ও জাস্ট বোকা বনে গেল! বাবা, মা, বোন, শ্রাবণী সবাই বলেছিল, ওর চয়েস চূড়ান্ত ভুল। তবুও বিশ্বাস করেছিল ও মনীন্দ্রকে। কিন্তু এভাবে মিথ্যাচার করেছিল ওর সাথে, ভেবেই ঘৃণায় মুখটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল ওর। দমবন্ধ হয়ে আসছিল কমলিকার। চারটে ম্যাজিক্যাল শব্দ তখন নেহাতই প্রহসন মনে হয়েছিল ওর।

এই মনীন্দ্রর জন্যই ও সব ছেড়েছে!

বাড়ি ফিরেই মনীন্দ্র ওর আরক্ত চোখ দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, কি হয়েছে?

কমলিকা কবিতার বইটা ওর সামনে ফেলে দিতেই বেশ চিৎকার করে বলেছিল, হ্যাঁ ঠিকই দেখেছো, আমি কবিতা লিখতে পারিনা। ইনফ্যাক্ট আমি কবিতা ভালোও বাসি না তেমন। তোমাদের মত সুখী, বড়লোক বাড়ির ছেলে মেয়েদের আমি জাস্ট ঘৃণা করি, হিংসা করি আমি তোমাদের। না ভালোবাসিনি আমি তোমায়, শুধু তোমায় জয় করতে চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম আমার মত ব্যর্থ মানুষের পায়ের তলায় তোমার অবস্থান হোক, তাই হয়েছে। আমি জিতে গেছি। ভালোবাসা নামক মোহের জালে তুমি নিজেই এসে ধরা দিয়েছিলে। মাঝখান থেকে গণ্ডগোল পাকালো তোমার বাপটা। মেয়েকে ডিরেক্ট আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো, সম্পত্তির কানাকড়ি না দিয়ে। শোনো রিনা, তোমার ঐ কমলিকা নামটাতেই আমার আপত্তি। আটপৌরে হয়ে থাকো বুঝলে।

স্বপ্নপূরণ করো ভালো করে রান্না শিখে, সংসারের দায়িত্ব নিয়ে, ওসব অহংকারি বিলাসিতা এ বাড়িতে চলবে না বুঝেছো?

কমলিকা ধীর অস্পষ্ট গলায় বলেছিল, ভালোবাসনি তুমি আমায়? কোনোদিন বাসনি? সব প্রতিশ্রুতি মিথ্যে ছিল? একসাথে দেখা স্বপ্নগুলো বেরঙীন ছিল তাহলে?

মনীন্দ্র গলা চড়িয়ে বলেছিল, একদম পারফেক্ট চিনেছো তুমি আমায়। আর নিশ্চয়ই অসুবিধা নেই তোমার দাসগুপ্ত বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমাদের জন্য টাকা চেয়ে আনতে, আর নিশ্চয়ই আমার সম্মানহানির ভয় নেই তোমার! তাহলে যাও রিনা ওবাড়িতে, নিয়ে এস নিজের ন্যায্য ভাগ। স্থবিরের মত বসেছিলো রিনা।

চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো কি সত্যি! ভালোবাসা নয়, শুধুই প্রবঞ্চনা করেছিল মনীন্দ্র ওর সাথে। ওর মুখের উচ্ছল হাসি, ওর চোখের মায়াময় কাজল, ওর কপালের স্বপ্নদেখা টিপ, ওর কানের আত্মবিশ্বাসী কুন্দন, সব কিছুকে হিংসা করতো মনীন্দ্র! তাই ওকে এভাবে ঠকিয়ে বিয়ে করে, এ বাড়িতে এনে জব্দ করলো ও। মনে মনে শপথ করেছিল কমলিকা, শেষ করে দেবে নিজেকে মনীন্দ্রর চোখের সামনে। অসহ্য লাগবে মনীন্দ্রর কমলিকাকে কিন্তু নিরুপায় হয়ে সহ্য করবে ওকে।

সেদিন থেকেই কমলিকা এবাড়িতে রয়েছে, কর্তব্য করছে অথচ নিজের মনের কোনোরকম অনুভূতির প্রকাশ করেনি। মনীন্দ্র মাঝে মাঝেই বলে, অসহ্য, এমন রোবটের

সাথে কেউ থাকতে পারেনা। স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতেও কি কষ্ট হয় তোমার!

জিতে যায় কমলিকা, যতবার বিরক্ত হয় মনীন্দ্র ততবার জিতে যায় কমলিকা।

মধ্যরাতে বিছানায় মরার মত শুয়ে থাকে কমলিকা, মনীন্দ্র একটু তৃপ্তি পাবার আশায় পাগলের মত ছটফট করে ওর শরীরটার ওপরে। তারপর প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, আমি রেপিস্ট নই রিনা, প্লিজ, সাড়া দাও আমার ডাকে, তোমার শরীরের আকর্ষণে তৃপ্ত করো আমায়। কমলিকা মনে মনে হাসত, নাও মনীন্দ্র আমার গোটা শরীরটা নাও। নিখুঁত শরীরটাকে তুমি নিজে হাতে উলঙ্গ করো, তছনছ করে দাও আমার নারীত্বকে। ফলাও স্বামীর অধিকার, তুমি বারবার রিনা সেনকেই খুঁজে পাবে, কমলিকাকে নয়।

এভাবেই কমলিকার চূড়ান্ত অনিচ্ছা আর মনীন্দ্রর জোরের ফলেই জন্মেছিল দেবজিত, ঈশা।

কমলিকা সন্তানদের ঘিরে বাঁচতে চেয়েছিল। দেবজিত ছিল ভীষণ মা নেওটা, সেটাও সহ্য হলো না মনীন্দ্রর। দেবজিতকে ওর থেকে দূরে করে দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেললো ও আর ওর মা মিলে। ঈশার ক্ষেত্রেও তাই। ছোট থেকেই ওর ছেলে মেয়েরা জানে কমলিকা একজন অশিক্ষিত, আনকালচার্ড মেয়ে।

রান্নাঘরের গণ্ডির বাইরে যার কোনো পরিচয়ই নেই।

দিনগুলো কেটে গেছে কালের নিয়মে। ছেলে মেয়েদের কাছ থেকেও মনীন্দ্রর মতই অপমানিত হয়েছে কমলিকা। ধীরে ধীরে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। কমলিকার থেকে অনেকটা দূরে চলে এসে রিনা হয়ে বেঁচে আছে ও। ইদানিং আবার একটা নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে ওর মধ্যে। মাঝে মাঝেই কমলিকা এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, এর নাম বুঝি জেতা? মনীন্দ্রকে জিতিয়ে দিয়েছো তুমি, নিজে হেরে গিয়ে। পুরোনো কমলিকা বড্ড লোভ ধরাচ্ছে রিনার মনে, আরেকবার কমলিকাকে ফিরে পাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে এই মধ্যবয়স পেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে। ঝুলপির পাশের সিলভারলাইনগুলো বিদ্রূপ করে বলছে, অচেনার ভিড়ে চেনা কমলিকাকে হারিয়ে ফেলতে লজ্জা করলো না! নিজের নামটুকুর মূল্য পর্যন্ত না রাখতে পারা মেয়েটাও নাকি ভাবে সে জিতে গেছে। তিলতিল করে জীবনের সব ইচ্ছেগুলোর শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলার নাম যদি জিতে যাওয়া হয়, তাহলে তুমি জিতে গেছো রিনা সেন, কমলিকাকে হারিয়ে জিতে গেছো।

নিজের কান চেপে ধরে আয়নার সামনে থেকে সরে আসে রিনা, কষ্টগুলো আবার হয়তো রক্ত ঝরাবে এই ভেবেই পালিয়ে বেড়ায়।

তবে ইদানিং ঈশার ব্যবহারে বড্ড কষ্ট হচ্ছে কমলিকার। মা হিসাবে ওকে স্বীকার করতেও যেন বড্ড বাধা মেয়েটার। মনীন্দ্র যে এভাবে ওর সন্তানদের ওর কাছ থেকে কেড়ে নেবে ভাবতেই পারেনি কমলিকা। মনে মনে ভাবছিলো কিছু একটা করতে হবে। পুরোনো কমলিকাকে

এরা তো চেনেই না, এরা চেনে বড্ড আটপৌরে রিনা সেনকে। যে নুন তেলের কৌটো আর চামচ বাটির হিসেব করতেই ব্যস্ত থেকেছে গোটা জীবনটা। আচ্ছা, ছেলে মেয়েরা যদি কমলিকা দাসগুপ্তকে চিনতো তাহলে কি মা হিসাবে মিনিমাম সম্মানটুকু পেত ও। অন্তত অশিক্ষিত আনকালচার্ড বলে অশ্রদ্ধা হয়তো করতো না। মা ডাকে শুধুই প্রয়োজনের হাতছানি থাকতো না, হয়তো একটু হলেও ভালোবাসা থাকতো।

নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠলো, কমলিকা ডু সামথিং।

।। ১২।।

নিজের ঘরে রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো দেবজিত, কবিতা সিলেকশনটা যে মা করে দিয়েছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশা বাড়িতে ছিল না। থাকলেও দিত না। বাবার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই মা-ই ঠিক করে দিয়েছে ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে কোন কবিতাটা আবৃত্তি করা উচিত। নিজের মনেই হাসলো দেবজিত, মা তার মানে এখনো ওকে ভালোবাসে, একটু হলেও বাসে। বাবা, ঈশা আর দেবজিতের যৌথভাবে অপমানের পরেও কি করে যে ওদের এখনো খেয়াল রাখে মা, কে জানে! আচ্ছা ওই মহিলা সত্যিই কি ওদের কোনো ক্ষতি করেছিল কোনোদিন? তাহলে এতটা আক্রোশ কেন জন্মালো মায়ের প্রতি। কেন মা নামক মিষ্টি ডাকটা রিনা সেনের রূপ নিলো। এতদিন যাবৎ এই প্রশ্নগুলো মনের আনাচে কানাচে ঘুরলেও ও কখনো পাত্তা দেয়নি। আজ 'বিদায়'

কবিতাটা পড়তে পড়তে বুকের মধ্যে কেমন যেন মুচড়ে উঠলো। বিচ্ছেদ তো হয় নি মায়ের সাথে, একই ছাদের তলায় থেকে সমাপন ঘটেছে ক্রমাগত। সুখগুলো কি করে যেন স্মৃতির পাতায় স্থান করে নিয়েছে। মাও একদিন চলে যাবে পৃথিবী ছেড়ে সেদিন কি দেবজিত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলতে পারবে, ও মায়ের সাথে জাস্টিস করেছিল! একটাই কথা দলছুটের মত ওর মনের দরজার সামনে ধাক্কা দেয় মাঝে মাঝে, বাবার কিসের এত আক্রোশ মায়ের প্রতি। কেন বাবা চেয়েছিল, ওরা দুই ভাইবোন মাকে আক্রমণ করুক, ক্ষত বিক্ষত হোক মা! থাক, কিছু প্রশ্নের উত্তর বোধহয় এভাবেই হারিয়ে যায় উত্তর না দিয়েই।

নিজের মনেই কবিতাটা আউড়াচ্ছিলো ও, কালকেই বলতে হবে অফিসে। দরজায় নক করলো কেউ। বইটা সরিয়ে রেখে দরজা খুলতেই ধীর পায়ে মা ঢুকলো ঘরে। ঢুকেই বিনা বাক্যব্যয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

বিছানার এক কোণে বসে বললো, জিত আজ দু মিনিট আমার কথা শুনবি?

মায়ের এ হেন ব্যবহারে বড্ড চমকেছে ও। দীর্ঘবছর পর মা এভাবে কথা বলছে ওর সাথে। ইনফ্যাক্ট হাতে চায়ের ট্রে বা আয়রন করা জামা প্যান্ট ছাড়া মা কোনোদিনই ওর ঘরের চৌকাঠে পা দেয় না। যেন দেবজিতের প্রয়োজন মেটাতেই বাধ্য হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওর ঘরের মেঝেতে, কোনো কথা ছাড়াই ওগুলো টেবিলে

রেখে নিস্তব্দে চলে গেছে মা। কোনো কিছুর বিনিময়ে নয়, দিয়েই যেন আনন্দ। আজ হঠাৎ কি চাইছে মা?

দেবজিত বিছানায় উঠে বসে স্বাভাবিক গলায় বলল, বলো কি বলবে।

রিনা সেন একটু চুপ করে থেকে বললো, দময়ন্তী তোকে ভালোবাসে, বুঝিস নি কখনো? তোর অফিস যাওয়ার পথে সে দাঁড়িয়ে থাকে জানালায়, তুই বেরিয়ে গেলেই আমার আগেই সে বলে, দুর্গা দুর্গা। তুই ফিরবি বলেই হিম মাথায় অপেক্ষা করে ছাদের আলসেতে দেখিস নি কখনো? তোর প্রিয় রং বলেই বোধহয় ওর বেশির ভাগ ড্রেস বেবি পিঙ্ক।

দেবজিত অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মায়ের দিকে। জীবনেও ওর সাথে কোনোদিন কথা না বলা মা কিভাবে বুঝে গেল ওর আর দময়ন্তীর সম্পর্কের কথা! দেবজিতও খুব ভালোবাসে দময়ন্তীকে, কিন্তু কোনোদিন রাস্তাঘাটে ওরা কথাই বলেনি সেভাবে। কারণ ও জানে ওদের বাড়ির সাথে দময়ন্তীদের বাড়ির কিছু একটা ঝামেলা আছে। তাই ফোনেই কথা বলেছে টুকটাক, অথবা যাওয়া আসার পথে হালকা চাউনি। কিন্তু এসবের খবর তো এই নিঃস্পৃহ মহিলার কাছে থাকার কথা নয়।

দেবজিত নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, তুমি কি বলতে এসেছো সেটা বলো।

জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললো, ভেবেছিলাম থাকবো না এসব বিষয়ে, কিন্তু মনে পড়ে গেল, নার্সিংহোমে তোকে যখন আমার কোলে দিয়ে গিয়েছিল

নার্স তখন তুই তোর ছোট্ট হাত দিয়ে আমার আঙুল ধরার চেষ্টা করেছিলিস। ছোটবেলায় রাতে ঘুমের ঘোরে মা যেন হারিয়ে না যায় তাই শক্ত করে ধরে রাখতিস মায়ের আঁচলটা। কবিতা কম্পিটিশন বা স্কুলের এক্সামের সময় বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে দুবার প্রণাম করতিস আমাকে। একবার প্রথমে আরেকবার ঠাকুর দেবতা, ঠাম্মা-দাদু-বাবা সবাইকে করার পরে।

মুচকি হেসে বলতিস এটা হলো ফিনিসিং টাচ। এছাড়াও প্রথম মা ডাক শোনার কৃতজ্ঞতাবশেই বলতে এলাম, তোর বাবা আর তোর পিসি বোধহয় তোর বিয়ে ঠিক করছে। তোর পিসিই সম্বন্ধ এনেছে। শুনলাম নাকি অনেক টাকা পণ নেবে তোর বাবা। নিজের বিয়েতে পায়নি বলেই হয়তো ইচ্ছেপূরণ। দময়ন্তীর একনিষ্ঠ ভালোবাসাকে তুচ্ছ করে দিবি কয়েকটা টাকার জন্য? তাই বলতে এলাম তোকে, এটা করিস না জিত।

জিত অপলক তাকিয়ে আছে মায়ের মুখের দিকে। অন্য দিন প্রস্তর প্রতিমার মুখে কোনো বাহ্যিক অনুভূতির রেখা দেখতে পায়না ও, আজ দেখলো মায়ের চোখে কষ্ট, কপালে চিন্তার ভাঁজ।

দেবজিত অস্ফুটে বললো, কিন্তু ওদের ফ্যামিলির সাথে আমাদের যেন কিসের প্রবলেম আছে, কেউ তো মানবেই না।

মা চুপি চুপি বললো, তোর দাদু আর ওর দাদু একসাথে বিজনেস করতো, ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছিল বলেই মনোমালিন্য হয়েছিল, দু দাদুই এখন অবর্তমান। তাই

সেসব রাগ আর কেউ পুষে রাখেনি। চল, তুই আর আমি একদিন যাই দময়ন্তীদের বাড়িতে, বিয়ের কথা বলে আসি।

দেবজিত অবাক চোখে দেখেছিলো মাকে। ভীষণ চেনা, খুব ঘরোয়া মাও তার মানে পারে বাবার বিরুদ্ধে স্টেপ নিতে! উত্তেজনার বশে মায়ের হাতদুটো চেপে ধরে দেবজিত বললো, সত্যি? আমি কোনদিন দময়ন্তীকে ভরসার কথা শোনাতে পারিনি। বাবা যদি না মেনে নেয় সেই জন্য। মা ধীরে ধীরে বললো, আমি তো মেনে নেব, বাবার সাধ মেটাতে পণ নিয়ে বিয়ে করিস না জিত, আমার গর্ভের বদনাম করিস না। জিত অপলক চোখে তাকিয়ে বলল, এত কিছুর পরেও তুমি আমার ভালো চাও মা? কি ধাতু দিয়ে তৈরি গো তুমি!

মা আস্তে আস্তে বললো, কাল তুই অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস, আমি রেডি হয়ে থাকবো, কালই কথা বলে আসবো ওদের বাড়িতে।

গলা পাল্টে মা হঠাৎ জোরে জোরে আবৃত্তি করতে শুরু করলো বিদায় কবিতাটা।

"হে মহাসুন্দর শেষ,
হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির,
মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্বাদ।

ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির,
পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে,
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি
নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে।''

মায়ের কবিতা শেষ হবার আগেই জিতের দরজায় টোকা পড়লো, ঈশা আর বাবার গলা।

দরজা খুলতেই ঈশা বললো, এই দাদাভাই কার ভয়েস চালিয়েছিস তোর ঘরে? এটা কার গলা রে?

বাবা একটু গম্ভীর গলায় বলল, তোর মায়ের মাথায় আবার ভূত চেপেছে বুঝি!

কিছু শেখার দরকার হলে ঈশা তো বাড়িতেই আছে শিখে নে, অন্তত ভুল শিখবি না।

ঈশা প্রতিবাদ করে বললো, আরে না বাবা, যার কবিতা দাদাভাই চালিয়েছে তিনি দুর্দান্ত বলেন, এই দাদাভাই আমায় সেন্ড কর ক্লিপিংটা প্লিজ।

কথাটা শেষ করেই ছিটকে উঠলো ঈশা ঘরের বিছানার কোণ মাকে দেখে।

বাবা আবারও বললো, বললাম না, এটা তোমার মা বলছিলো।

ঈশার শ্রদ্ধার হাসিটা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে গেল কৌতুকে। এই দাদাভাই, আর ইউ ক্রেজি? তুই ওই

অশিক্ষিত মহিলার কাছ থেকে রিসাইটেশন শিখছিস? কেন রে আমি কি মরে গিয়েছিলাম?

আরে ওই মহিলা দিনরাত আমার সাথে কম্পিটিশন করে যাচ্ছে রে। কবিতা সম্পর্কে মিনিমাম কনসেপ্ট নেই রিনা সেনের, আর তুই কিনা!

বাবা মায়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, তুমি আর তোমার কবিতা অনেকটা ফিনিক্স পাখির মত, বুঝলে রিনা, মরেও মরে না।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে জিত বললো, তোমরা যাও, আমি মায়ের কাছ থেকে ভালো করে কবিতাটা শিখে নিতে চাই, কালকেই আমায় পারফর্ম করতে হবে।

ঈশা ঘৃণার চোখে দেবজিতের দিকে তাকিয়ে বলল, রুচিটাকে আগে উন্নত কর দাদাভাই, তারপর না হয় কবিতা বলবি। তুই যার কাছ থেকে শিখবি বলছিস, সে নিজের মেয়েকে হিংসা করে, বুঝলি। নেহাত উপায় নেই তাই কম্পিটিশনে নামে নি।

মা ধীর গলায় বলল, না ঈশা, তোমায় করুণা করি বলেই কম্পিটিশনে নামিনি। তোমার বাবা জানে, একসময় আমি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছি শুনলে অনেক ভালো ভালো আর্টিস্ট ভয়ে নিজেদের নাম কাটিয়ে দিয়ে আসতো প্রতিযোগিতা থেকে। কারণ তারা নাকি স্থির ভাবে জানতো, যে ফার্স্ট প্রাইজটা তারা পাবে না।

ঈশা মুচকি হেসে বললো, ও রিয়েলি? বেশ ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলাম তোমায় রিনা সেন, জিতে দেখাও।

আমারও জিততে জিততে অভ্যেসটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। একবার অন্তত হারতে চাই, আর সেটা হোক তোমার কাছেই।

বাবা বললো, বাড়ির মধ্যে এসব কি হচ্ছে। তোর মা কেন তোর সাথে কম্পিটিশনে নামতে যাবে, তোর মা তো কবিতা বলা ছেড়েই দিয়েছে। আজ হয়তো একবার দেবজিতকে শিখিয়ে দিয়েছে, তোর মায়ের সময় কোথায়! সংসারের কাজের বাইরে এসব করার সময় নেই তোর মায়ের। তাই এসব ফালতু চ্যালেঞ্জের কি দরকার। বাবার চোখে একটু হলেও ভয়ের ছায়া দেখেছিলো দেবজিত। বাবা কি মায়ের ট্যালেন্টকে ভয় পায়? কিন্তু বাবাই তো বলেছে, তোর মা তেমন পড়াশোনাও জানে না। খুবই গরিব বাড়ির অসহায় মেয়ে, বাবা নাকি মাকে বিয়ে করে উদ্ধার করেছিল ওদের ফ্যামিলিকে। তাহলে আজ বাবার চোখের কোণে ভয় কেন? তবে কি কিছু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে বাবা! কি সেটা?

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পরে মা খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, নে প্র্যাকটিস কর। তোর তো আবার স্টেজে ওঠার আগে বড্ড টেনশন হয়। দেবজিতের মনে হচ্ছিল ও বোধহয় আবার সেই ছোটবেলার জীবনে ফিরে গেছে। মা আবার আগের মত বকবে, শেখাবে....কত বছর পর যে এভাবে কথা বললো মা। দোষ কি শুধুই মায়ের ছিল, দেবজিতের ছিল না? মাকে ক্রমাগত অপমান করে দূরে সরিয়ে তো ওই দিয়েছিল। তাই হয়তো মা অমন নির্লিপ্ত ভাবে কাটিয়ে দিলো জীবনটা।

দেবজিত আদুরে গলায় বলল, আমি বলছি, ভুল হলে ঠিক করে দাও।

কতদিন পরে মা দেবজিতের মাথার চুলে হাত ডুবিয়ে আদর করে বললো, বল বল, সময় নষ্ট করিস না।

।। ১৩।।

বহু বছর পরে দেবজিত মাকে প্রণাম করে অফিস বেরোলো। সকাল থেকে মনটা অন্যরকম প্রশান্তিতে ভরে আছে কমলিকার। মনীন্দ্রর চোখে আতঙ্ক দেখেছে কাল রাতেই। ঈশার দৃষ্টিতেও ছিল হেরে যাওয়ার ভয়।

মনীন্দ্রর চোখে এই আতঙ্কটাই দেখতে চেয়েছিল কমলিকা, শুধু উপায়টা খুঁজে বের করতে পারছিল না। হয়তো খুঁজতে চায়নি ও। নিঃস্পৃহতাকেই একমাত্র অস্ত্র করে হারাতে চেয়েছিল মনীন্দ্রকে। ওর নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকে যে মানুষটা মূলধন করতে চেয়েছিল, ওকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যে মানুষটা জিততে চেয়েছিল তাকে হারিয়ে এবারে কমলিকা জিততে চায়।

বিশ্বাস শব্দটার অর্থ বদলে দিয়েছে মনীন্দ্র, ওকে ওর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, এমনকি নিজের সন্তানদের পর্যন্ত বুকে জড়িয়ে ধরে কোনোদিন আদর করতে পারেনি ও। তাদের মনেও মা সম্পর্কে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে ওই মানুষটা। কমলিকার হেরে যাওয়াতেই নাকি ওর সুখ, ওর প্রাপ্তি। চোখ দুটো আবারও জ্বালা করে উঠলো কমলিকার। না, আর নোনতা জলেদের অযথা বেরোতে দেবে না ও। মোবাইল একটা আছে ওর কিন্তু কখনোই তার ব্যবহার

করে না ও। ওই মনীন্দ্রকে ফোন করে সংসারের কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করা ছাড়া আর কোনো যোগাযোগ নেই কারোর সাথে। অ্যান্ড্রয়েড ফোনটা পড়েই থাকে ঘরের এক কোণে। দেবজিত চাকরি পেয়ে সবাইকে কিছু না কিছু দিয়েছিল, তখনই ওকে এই ফোনটা গিফট করেছিল। ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই ঈশাকে দেখতে পেল। বেশ দামি একটা পোশাক পরে গুণগুণ করতে করতে কোথাও একটা বেরোচ্ছে ও।

ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছিস?

জোর করে নিজের ইচ্ছেটাকে দমন করলো কমলিকা। ঈশার ব্যঙ্গাত্মক কথা শোনার ইচ্ছে একেবারেই নেই আজ সকালে। কত বছর পরে আবার দেবজিত ওকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, সেই খুশিটুকু কিছুতেই নষ্ট করতে চায় না কমলিকা। ফোনটা ঘেঁটে ঈশার ইউটিউভ চ্যানেলটা বের করলো ও।

হেডফোনটা কানে লাগিয়ে শুনছিলো কবিতাগুলো। ভালই বলেছে ঈশা তবে কয়েকটা একটু বেশিই নাটুকে করে ফেলেছে। কবিতা আবৃত্তি আর নাটকের মধ্যে ছোট্ট একটা পার্থক্য আছে, এটা অনেকেই মনে রাখে না।

কলিংবেলের আওয়াজে একটু চমকে উঠলো ও। এইসময় তো কারোর আসার কথা নয়, তাহলে হয়তো সেলসের কেউ। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলতেই একটা বছর ছাব্বিশের ছেলে আর একজন প্রায় ওরই সমবয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে।

একটু অপ্রস্তুত গলায় কমলিকা বললো, আপনারা? চিনতে পারলাম না তো!

ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ গলায় বলল, আমি প্রবুদ্ধ, ঈশার ফ্রেন্ড। এই নামটা কমলিকা বেশ কয়েকবার শুনেছে ঈশার ফোনে। সেদিন তো প্রশ্নও করেছিল ঈশাকে, প্রবুদ্ধ কে? উত্তর না দিয়ে অপমান করে বেরিয়ে গিয়েছিল ঈশা।

কমলিকা বললো, ভিতরে এস। ছেলেটি বেশ চিন্তিত গলায় বলল, ঈশা এখন কেমন আছে আন্টি। ওর তো তিনদিন ধরে জ্বর, ফোনটা পর্যন্ত রিসিভ করতে পারছে না। ডক্টর দেখিয়েছেন? একবার কি ওর সাথে দেখা করা যাবে!

কমলিকা একটু হকচকিয়ে বললো, কিন্তু ঈশা তো অসুস্থ নয় প্রবুদ্ধ। ও তো রেকর্ডিংয়ে বেরিয়ে গেছে।

অর্কপ্রভ বলে কোনো ডিরেক্টারের ফোন এসেছিল। কালকেও তো গিয়েছিল, আজও বেরিয়ে গেছে।

প্রবুদ্ধ ধপ করে ড্রয়িংয়ে সোফায় বসে পড়লো। সব হারানোর গলায় বলল, মিথ্যে বললো কেন আমায়!

কমলিকার মনে পড়ে গেলো নিজের কথা, প্রথম যেদিন মনীন্দ্রর মিথ্যেগুলো জানতে পেরেছিল ও সেদিন ঠিক এভাবেই ভেঙে পড়েছিলো ও।

প্রবুদ্ধ পাশের ভদ্রমহিলা হাত জোড় করে নমস্কার করে বললো, আমি প্রবুদ্ধর মা। বিনোদিনী স্কুলের ইংরেজির শিক্ষিকা।

কমলিকাও নমস্কারের ভঙ্গিমায় বললো, আমি রিনা সেন, ঈশার মা।

ভদ্রমহিলার দুই ভ্রুর মাঝে একটা চিন্তার ভাঁজ। একটু আমতা আমতা করেই বললেন, আপনার সাথে আমার একজন ক্লাসমেটের খুব মিল খুঁজে পাচ্ছি, আমরা একসাথে ইলেভেন টুয়েলভ পড়েছি, কিন্তু তার নাম ছিল কমলিকা দাসগুপ্ত, ভীষণ ভালো কবিতা বলতো, দুর্দান্ত স্টুডেন্টও ছিল। আচ্ছা ও কি আপনার কেউ হয়? মানে মুখের বেশ মিল রয়েছে। যদি সে বহুবছর আগে দেখা হয়েছিল ওর সাথে।

নিজের নামটা শুনে কেমন যেন হয়ে গেল কমলিকা। এখনও কেউ মনে রেখেছে ওকে। প্রবুদ্ধর মায়ের দিকে অপলক তাকিয়ে কমলিকা বলল, শ্রেয়সী, শ্রেয়সী বিশ্বাস, ঝর্ণাদির বাংলার পিরিয়ডে বকা খেতিস, ইংরেজিতে তুখোড় ছিলিস, হিস্ট্রির স্যার বলতেন, কমলিকা এই মেয়েটার সালগুলো যে কি করে এত নিখুঁত মনে থাকে সেটাই আশ্চর্য হয়ে যাই। কোনো কোশ্চেনের উত্তর ভুল লিখলেও সাল কিন্তু নিখুঁত।

শ্রেয়সী ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, স্কুলের যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথমেই ডাক পড়তো কমলিকা দাশগুপ্তের, আর সারাজীবন চেষ্টা করেও তোর থেকে রেজাল্টে দু থেকে তিন নম্বর কম পেয়ে সেকেন্ড হয়ে যেতাম। কিন্তু তুই এখানে, এভাবে? রিনা সেন কেন রে?

ঈশার কথা আমি শুনেছি প্রবুদ্ধর মুখে, ওরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসে, আমার ইচ্ছে ছিল ছেলে যাকে

জীবনসঙ্গী করতে চাইছে তাকে নিজের চোখে দেখতে, কিন্তু তুই যে ঈশার মা এটা তো ভাবতেই পারিনি।

এটা আমার উপরি পাওনা, তোর মেয়ে কোনোদিন খারাপ হতেই পারে না।

কমলিকা স্থির গলায় বলল, তুই কেন ভুলে যাচ্ছিস শ্রেয়সী ওর গায়ে ওর বাবার রক্তও বইছে। তাই কি করে এতটা নিশ্চিন্ত হচ্ছিস যে ও ভালো হবেই।

প্রবুদ্ধ স্খলিত গলায় বলল, আন্টি, আমায় একবার ওর ঘরে নিয়ে যাবেন?

কমলিকা ইতস্তত করে বললো, আসলে আমি ওর ঘরে সেভাবে ঢুকি না। ও একদম অপছন্দ করে, কাজের মাসিই পরিষ্কার করে দেয় ওর ঘর। তবুও তুমি যখন যেতে চাইছো চলো।

প্রবুদ্ধ কমলিকা আর শ্রেয়সী ঢুকলো ঈশার ঘরে।

কমলিকা দেখছিলো নিজের মেয়ের ঘরটা। মেয়েটা এত বড় হয়ে গেল কবে। ঘরটার মধ্যে কেমন যেন নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ একটা গন্ধ রয়েছে। দমবন্ধ হয়ে আসছে ওর।

প্রবুদ্ধ ওর কম্পিউটার টেবিল থেকে একটা ফ্রেম তুলে বললো, এটা আমি ওকে গিফট করেছিলাম, আমাদের দুজনের ছবি রাখবো বলে। ঈশা তো দেখছি ফ্রেমটা অলরেডি ইউজ করে ফেলেছে, অর্কপ্রভর ছবি রেখে, এই তো সেদিন পরিচয় হলো ওর অর্কর সাথে, আমার মাধ্যমেই। কবে হলো ওরা এতটা ইন্টিমেট?

কমলিকা প্রবুদ্ধর কাঁধে আলতো করে একটা হাত রেখে বললো, জানি মেনে নেওয়া খুব কষ্টকর, তবুও

বলছি, ঈশা বোধহয় কোনোদিনই তোমায় ভালবাসে নি। ঈশা, ঈশার বাবা এরা ভালোবাসতে জানে না, এরা সিঁড়ি বানায় ওদের প্রতি দুর্বল মানুষকে দিয়েই।

প্রবুদ্ধ ঈশার নম্বরে কল করলো, বার দুয়েক পরে ফোনটা রিসিভ করলো ঈশা। বিরক্ত গলায় বলল, প্রবুদ্ধ তোমায় আমি বলেছিলাম, আমি অসুস্থ। বাড়িতে শুয়ে আছি। মা দিনরাত নজরে রাখছে, ফোন ধরাটাও অসুবিধাজনক। প্লিজ আপাতত কল করো না আমায়। আমি সুস্থ হয়ে কল করবো তোমায়।

প্রবুদ্ধর চোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওর অজান্তেই। পুরুষের চোখে জল সহজে আসে না। ছোট থেকেই ওরা কষ্টগুলো লুকতে শেখে, তাই প্রবুদ্ধর চোখের জল দেখে কমলিকারও মনটা কেমন করে উঠলো।

মনীন্দ্রর কুম্ভীরাশ্রু বোঝার বয়েস সেদিন ছিল না ঠিকই কিন্তু আজ অভিজ্ঞ চোখে বুঝতে পারলো ছেলেটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

শ্রেয়সীর কাছে নিজের জীবনের সবটা বলে বহুদিন পরে হালকা লাগছে কমলিকার। পাশে চুপচাপ শুনছিলো প্রবুদ্ধ। আচমকা বলে উঠলো, আন্টি আমি তো আপনার ছেলের মত, আমায় একটু হেল্প করবেন?

একজনের অহংকারে আঘাত করতে চাই, করবেন হেল্প?

কমলিকা মাথা নেড়ে বললো, আমার মেয়ে দোষী, তোমার বিশ্বাস নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলেছে, এর কিছুটা

ভাগ যে আমাকেও নিতে হবে প্রবুদ্ধ। বলো, কি ভাবে হেল্প করবো তোমায়?

প্রবুদ্ধ বললো, আপনি বলুন, আপনি কোন সময়টা ফ্রি থাকেন, আমি নিজে আসবো গাড়ি নিয়ে আপনাকে নিয়ে যেতে, আমার একটা কাজ আপনাকে করে দিতে হবে।

শ্রেয়সী বললো, বাবুই, দেখিস আন্টি যেন আর কষ্ট না পায়, এটাই যে আমাদের স্কুলের সেই ট্যালেন্টেড কমলিকা দাসগুপ্ত সেটা বিশ্বাস করতেই যে কষ্ট হচ্ছে রে, একটা গোটা জীবনকে তুই এভাবে শেষ করে দিলি কলি? মানতে পারছি না বিশ্বাস কর, তোকে সারাজীবন জিততে দেখে দেখে ওটাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল রে, মঞ্চে উঠে সব বিষয়ে ফার্স্ট প্রাইজ তুই নিবি এটা বোধহয় আমাদের চোখ সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তোকে এমন আটপৌরে দেখতে ইচ্ছে করে না কমলিকা। ঈশার মা হয়েও তুই নিজের মেয়ের দোষটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলি, ওকে গার্ড করার কোনো চেষ্টাই করলি না দেখেই বুঝতে পারলাম, রিনার মধ্যে আমার পরিচিত সেই প্রতিবাদী কলি এখনো বেঁচে আছে। বাবুই ঈশার সাথে তোর সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেছে বলে যেন তুই আন্টির সাথে খারাপ কিছু করিস না।

প্রবুদ্ধ যন্ত্রণা মাখা গলায় বলল, মা সব শোনার পর আমি আন্টিকে শুধু শ্রদ্ধা নয়, ভালোও বেসে ফেলেছি, তাই কোনো ক্ষতি করবো না কারোর।

কমলিকা মুচকি হেসে বললো, ওরে শ্রেয়সী তুই কলিকে চিনতিস, রিনাকে নয়, রিনার সহ্য ক্ষমতা সম্পর্কে

কোনো ধারণা নেই তোর। তোর এই মিষ্টি ছেলে আমার মত মৃত মানুষের আর কি ক্ষতি করবে রে!

প্রবুদ্ধর মুখে হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা, চোখের দৃষ্টিতে বিশ্বাস করে প্রবঞ্চিত হওয়ার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি কমলিকাকে বারবার নিজের সর্বস্ব হারিয়ে হেরে যাওয়ার দিনটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এতদিন পর্যন্ত কমলিকার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, পুরুষ মানুষরাই বুঝি এভাবে ঠকাতে পারে। আজ প্রবুদ্ধর নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বিনিময়ে ঈশার বেইমানি কমলিকার ধারণার পরিবর্তন করে দিলো। নিজের মেয়ে যে কাউকে এভাবে ইউজ করে দূরে ঠেলে দিতে পারে এমনটা কল্পনাও করতে পারেনি ও।

মনে মনে বললো, রক্ত বোধহয় এভাবেই কথা বলে। মনীন্দ্রর বেইমানের রক্ত ঈশার ধমনীতে বইছে, তাই তো এ ভাবে কষ্ট পাচ্ছে প্রবুদ্ধ।

কোনো কথা না বলে কমলিকা প্রবুদ্ধর কাঁধে একটা হাত রাখল। প্রবুদ্ধ অস্ফুটে বললো, বড্ড ভালোবেসেছিলাম আন্টি ঈশাকে, বুঝতেও পারিনি এভাবে ও আমাকে অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারে।

কমলিকা দৃঢ় অথচ ধীর গলায় বলল, আর যদি বিয়ের পরে বুঝতে পারতে ঈশা তোমায় কোনোদিন ভালোই বাসেনি, তাহলে তো গোটা জীবনটা দিনগত পাপক্ষয়ের মত টেনে বেড়াতে হতো। তার থেকে তো এই ভালো হলো প্রবুদ্ধ, ভোলার সময় পাবে, নতুন জীবন গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। আন্টিকে দেখে বুঝতে পারছ না, ভুলের মাশুল গুণছে আজও।

শ্রেয়সী বললো, আমি একটা ভালো মেয়ের সম্বন্ধ দেখেছি জানিস কলি, কিন্তু ছেলে যখন কিছুতেই রাজি হচ্ছে না, তখনই জানলাম ঈশার কথা।

কমলিকা স্থির বাষ্প শূন্য চোখে তাকিয়ে বললো, একটা অনুরোধ করবো প্রবুদ্ধ, ঈশা ফিরে এলেও ভেবে দেখো।

।। ১৪ ।।

এতকালের চেনা জীবনটা একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছে কমলিকার। আজ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে মনীন্দ্র দেখলো কমলিকা বহুদিন পরে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে সেজেছে। এখনো সাজলে মনীন্দ্রর বুকের ভিতর কম্পন হয়। রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে। সুন্দর কমলিকাকে যেন কিছুতেই সহ্য হয়না ওর। আটপৌরে, নিজের ব্যাপারে উদাসীন, কর্তব্যে ত্রুটিহীন কমলিকাই যেন ওর জয়ের মুকুট। কমলিকার চোখে হালকা কাজলের রেখায় আবারও যেন পুরোনো দম্ভকে দেখতে পেল মনীন্দ্র।

কৈফিয়ৎ নেবার উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞেস করলো, বিকেলবেলা সেজেগুজে কোথায় চললে?

কমলিকা শান্ত গলায় বলল, জিতের জন্য পাত্রী ঠিক করতে।

মনীন্দ্র একটু থতমত খেয়ে বললো, মানে? আমি তো অলরেডি দেবজিতের পাত্রী ঠিক করছি রিনা। হঠাৎ তুমি কেন?

কমলিকা কাটা কাটা শব্দে বললো, তুমিও যেমন যাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলে তাকেই বিয়ে করেছিলে, আমিও চাই তোমার ছেলেও যাকে ভালোবাসে তাকেই বিয়ে করুক। বাবার ট্র্যাডিশন বজায় রাখুক, তুমিও যেমন ভালোবাসার জন্য একসময় বাজি রেখেছিলে, সরল একটা মেয়ের বিশ্বাস, তার বাবার সম্পত্তি, মেয়েটির আত্মমর্যাদা, সর্বোপরি তার ভালোবাসার গভীরতা....তেমনি তোমার ছেলেও আজ বাজি রাখবে তোমার সম্মান। চিন্তা করো না, তোমাদের চিরশত্রু শংকর মিত্রের মেয়ে দময়ন্তীর সাথেই বিয়ে হবে দেবজিতের।

মনীন্দ্র চিৎকার করে বললো, প্রতিশোধ নিচ্ছ আমার সাথে? পারবে না, জিত তোমায় ঘৃণা করে, বুঝলে, ও আমার কথা শুনবে।

মনীন্দ্রর কথা শেষ হবার আগেই কলিংবেলের আওয়াজ।

দরজা খুলতেই দেবজিত বললো, মা তুমি রেডি, চলো, আমি মেসেজ করে দিয়েছি দময়ন্তীকে। ওর কাছে এখনও ব্যাপারটা স্বপ্ন জানো মা। আমি বলেছি, সবটা সম্ভব হচ্ছে আমার মায়ের জন্য।

মনীন্দ্র পিছন থেকে চিৎকার করে বললো, জিত তুমি কোথাও যাবে না। আমি তোমার জন্য অলরেডি পাত্রী নির্বাচন করে ফেলেছি।

দেবজিত বোধহয় এই প্রথম বাবার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, না বাবা, আমি তোমার ছেলে হয়ে পণ নিয়ে বিয়ে করতে পারবো না। তুমি মাকে বিয়ে করে এক

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দায়িত্ব লাঘব করেছিলে, আমি তো তোমারই ছেলে। আর তুমি যেমন মাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলে, আমিও তেমন দময়ন্তীকে ভালবাসি।

কমলিকা স্মিত হেসে বললো, সেদিন যদি তোর বাবা আমায় বিয়ে না করতো তাহলে হয়তো গরিবের এই মেয়েটি লগ্নভ্রষ্টা হত, তাই না মনীন্দ্র?

মনীন্দ্র আর কথা না বলে জোরে জোরে পা ফেলে ঘরে চলে গেল।

ছেলে মেয়েদের কাছে নিজেকে হিরো বানানোর জন্য মনীন্দ্র কমলিকা আর ওর পরিবারের নামে কত যে মিথ্যে বলেছে এত বছর সেটা ও এখন জানতে পারছে।

দময়ন্তীর বাবা, মা সবাই রাজি দেবজিতের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে। ওরা শত্রুতা টিকিয়ে রাখতেই চায়না।

দময়ন্তীর বাবা তো পরিষ্কার বলেই দিলো, কবে কি হয়েছিল সেসব আমি ভুলেই গেছি। মেয়ে যাকে জীবনসঙ্গী করতে চায় সে যখন যোগ্য, তখন আপত্তি কিসের?

দময়ন্তী আর দেবজিতের আড়চোখের চাউনিটা দেখে কমলিকার মনে হলো, বহুবছর পরে সেন বাড়ির মুখে একটা জোরে থাপ্পড় মারতে পারলো ও। নিজের সন্তানকে চোখের সামনে পর হয়ে যেতে দেখলে কেমন অনুভূতি হয় কমলিকা বুঝেছে খুব ভালো করে। আর এর পিছনে যে মনীন্দ্র আর ওর পরিবারের নিখুঁত বুদ্ধি কাজ করেছে সেটা কমলিকা বুঝেও কিছু করতে পারেনি। ওদের মিথ্যাগুলো বুঝেও অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল ওকে।

রাস্তায় বেরিয়েই দেবজিত মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, লাভ ইউ মা। আর এত বছরের আমার সব ব্যবহারের ক্ষমা বোধহয় হয় না, তাই আমিও চাইছি না ক্ষমা। শুধু একটুই বলবো, তুমি শুধু ঋণীই করে গেলে আমাকে।

কমলিকা পুত্রস্নেহের উষ্ণতায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে বললো, বললি না তো তোর কবিতা কেমন হলো?

দেবজিত উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ওরে বাপরে সবাই তো মারাত্মক হাততালি দিলো। বললো, এমন পারফেক্ট কবিতা আর এত সুন্দর আবৃত্তি যে প্রশংসা না করে পারা যায় না। তবে জানো মা, আজ আমি স্টেজে আমার সব ক্রেডিটটুকু তোমায় দিয়েছি। বলেছি, সবটাই হয়েছে আমার মায়ের জন্য। কলিগরা একদিন তোমার কবিতা শুনতে চেয়েছে জানো!

কমলিকা মুচকি হেসে বললো, তুই কত বড় হয়ে গেলি জিত।

জিত ঠোঁট উল্টে বললো, মা তুমি একটু আগে দময়ন্তীর সাথে আমার বিয়ের কথা ফাইনাল করতে গিয়েছিলে, আর এখনও আমি বড় হবো না!

কমলিকা আলগোছে বললো, আসলে বড্ড আফসোস হয় রে, তোদের বড় হওয়ার মুহূর্তগুলো একই ছাদের নিচে থেকেও আমি উপলব্ধি করতে পারলাম না।

দেবজিত অসহায় গলায় বলল, আচ্ছা মা, বাবা কেন তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে বলতো ছোট থেকে, কেন

বলতো, মা কিছু জানে না, মা কিছু শেখাতে এলে যেন আমরা না শিখি, কেন মা?

কমলিকা অন্যমনস্কভাবে বললো, নিজের চরিত্রের কালো দিকটা ঢেকে রাখতে চেয়েছিল হয়তো।

কথাটা বোধহয় জিতের কান অবধি পৌঁছলো না। তার আগেই ও বাড়ির কলিংবেলটা টিপল। মনীন্দ্র দরজা খুলতেই ঈশা এসে বেশ বিরক্তির গলায় বলল, দাদাভাই তোর রুচিটা দিন দিন বড্ড চিপ হয়ে যাচ্ছে রে, দময়ন্তীর মত একটা সাদামাটা মেয়েকে তোর পছন্দ হলো কি করে রে!

ভাবতেই লজ্জা করছে, তুই ঈশা সেনের দাদাভাই। আরে তোর বোনের গলা হিট মুভিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, তোর বোনের মুখও দেখবি দুদিন পরে রূপালী পর্দায়, আর তুই কিনা পাড়ার একটা অতি সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছিস, আমায় দেখে তো শিখতে পারিস রে, আমি মিডিলক্লাস মেন্টালিটি ছেড়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছি, আর তুই কিনা....

ঈশাকে মাঝপথে থামিয়ে কমলিকা বললো, দেখো ঈশা, এতটাও ওপরে উঠে যেও না যেখান থেকে মাটির দূরত্বটা বড্ড বেশি হয়ে যায়, আরও বেটার খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় মানুষ কিন্তু বেস্টটাকেও ভুল করে হারিয়ে ফেলে, পাখিরাও কিন্তু দিনের শেষে আকাশ থেকে নেমে আসে নিজের বাড়ির সন্ধানে।

ঈশা ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললো, কি ব্যাপার পাপা, মিসেস রিনা সেনের মুখে আজ একটু বেশিই কথা শুনতে পাচ্ছি

যে গো, প্লিজ পাপা, ওনাকে নিজের জায়গাটা বুঝিয়ে দিও এ সংসারে।

দেবজিত বিরক্ত স্বরে বললো, ঈশা, মায়ের সাথে ভদ্রভাবে কথা বল। এখনও তো তোর দিনটা শুরু হয় মায়ের করা চা খেয়েই।

ঈশা অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, দাদাভাই তোর মাথার ঠিক আছে তো! তুই ওই মহিলাকে কবে থেকে মা বলে সম্মান করতে শুরু করলি রে, ওই দময়ন্তীর সাথে তোর বিয়ে ঠিক করে এলো বলেই আজ ওই মহিলা দ্য গ্রেট মাদার হয়ে গেল!

দেবজিত শান্ত স্বরে বললো, দময়ন্তী আর দুদিন পরেই এ বাড়ির বউ হবে, তাই আমি চাই তুই তার সম্পর্কে একটাও ফালতু কথা না বলিস। মনীন্দ্র হালছাড়া গলায় বলল, তার মানে সব জানা সত্ত্বেও তুমি ওই মিত্র বাড়ির মেয়েটাকেই বিয়ে করবে?

দেবজিত হেসে বললো, আমরা কি আদৌ সব সত্যি জানি বাবা! কেন তুমি দিনের পর দিন আমাদের দিয়ে মাকে অপমান করিয়েছ, সেটার হদিস কি আমার কাছে আছে?

ছেলের সামনে নিজের মুখোশ উন্মোচন হয়ে যাবে ভেবেই বোধহয় মনীন্দ্রর দৃষ্টিতে ভয়ের আভাস, মুখের রেখায় তীব্র অস্বস্তি। কমলিকা অপলক তাকিয়ে আছে মনীন্দ্রর দিকে। চোখাচোখি হতেই প্রায় দৌড়ে নিজের ঘরের ঢুকে গেলো ও। দেবজিত এখন বড় হয়েছে, বোঝার ক্ষমতা হয়েছে তাই তাকে আর ভুল বোঝাতে

পারবে না মনীন্দ্র সেটা ভেবেই হয়তো হতাশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে ও।

কমলিকা এতদিন মারাত্মক নিঃস্পৃহ ছিল বলেই জিতে যাচ্ছিল মনীন্দ্র। ছেলেমেয়ের সামনে হিরো সেজে ছিল। মাটিতে নামিয়ে দিয়েছিল কমলিকার সম্মান, কিন্তু যদি এত বছর পরে কমলিকা সত্যিই মুখ খোলে তাহলে তো জিত আর ঈশার চোখে ঘৃণার পাত্র হয়ে যাবে মনীন্দ্র। এই বয়েসে ছেলেমেয়ের চোখে অসম্মানের দৃষ্টি দেখার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

দেবজিত ভালো টাকা দেয় সংসারে, বড় চাকরি করে, তাই বোধহয় মনীন্দ্রর ওর মতের বিরুদ্ধে যেতে না পেরেই চুপ করে গেছে দময়ন্তীর সাথে ওর বিয়ের ব্যাপারে।

কমলিকা শুনতে পেল, ফোনে দিদিকে বলছে, জিতের বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়েছে, ওদের না বলে দিস।

ঠোঁটের এক কোণে তৃপ্তির হাসি নিয়ে বহু বছর পরে নিশ্চিন্তে ঘুমালো কমলিকা।

ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল এগারোটা। সেন বাড়ির দরজায় এসে থামলো প্রবুদ্ধর দামি গাড়িটা।

কমলিকা ওর খুব পছন্দের হালকা সবজে লক্ষ্ণৌ চিকনের শাড়িটা পরে বেরিয়ে এলো বাড়িতে তালা দিয়ে।

আজ প্রবুদ্ধর চোখে মুখে একটা জেদের প্রতিচ্ছবি দেখলো কমলিকা। আগের দিনের কষ্ট ক্লান্ত মুখটা দেখে বড্ড কষ্ট হয়েছিল ওর।

গাড়িতে উঠতেই প্রবুদ্ধ বললো, আন্টি আপনাকে এরকম পর পর দিন পাঁচেক যেতে হবে আমার সাথে, আর আমি যেভাবে বলবো আপনি ভয় না খেয়ে সেভাবে করবেন কাজটা। ভয়! এককালে কমলিকা দাশগুপ্তের স্মার্টনেস নিয়ে লোকজন আলোচনা করতো, সেসব দিন অবশ্য রাতের তারার গভীরেও লুকিয়ে নেই, হারিয়ে গেছে চিরকালের মত।

প্রবুদ্ধ বললো, যা নিতে বলেছিলাম নিয়েছেন তো। কমলিকা হালকা হেসে বললো, না সেটা নিই নি, তবে নিয়েছি একটা অত্যন্ত কাজের জিনিস।

দিন পাঁচেক নয়, প্রায় দিন সাতেক প্রবুদ্ধর সাথে ওর কথা মত গিয়েছিল কমলিকা, ছেলেটা যেন পুরোনো কমলিকা দাসগুপ্তকে বাঁচাতে বদ্ধ পরিকর। এই সাতদিনেই ওর মনে হচ্ছে রিনা সেন বদ্ধ কুঠুরি থেকে বলছে, আমাকে মেরে ফেললে কমলিকা? আয়নার পারদ পর্যন্ত অবাক চোখে দেখছে ওকে, কমলিকা লজ্জা পেয়ে বলেছে, কি দেখছো? আয়নার পরিষ্কার উত্তর, মৃত মানুষকে জীবিত হতে দেখলাম যে।

।। ১৫।।

সেদিন সন্ধেবেলা ফোনটা নিয়ে সোফায় বসে ঘাঁটছিলো কমলিকা। হঠাৎই বেশ উস্কোখুস্কো হয়ে বাড়ি ফিরল ঈশা। বাড়িতে ঢুকেই রাগে ফেটে পড়লো। মনীন্দ্র বসে টিভির খবরে চোখ রেখেছিলো। ঈশা ঢুকেই চিৎকার করে বললো, পাপা দিস ইস চিটিং, দিস ইস ড্যাম চিটিং, অর্কপ্রভ আমার সাথে চিট করলো। তুমি জানো আমার

আজ অ্যাসাইনমেন্টে সাইন করার কথা ছিল, সেই অবস্থায় ও ইউটিউবে না ফেসবুকে কোন এক কমলিকা দাশগুপ্তের কবিতা শুনছে, দিয়ে বললো, ওই কমলিকা দাশগুপ্তের গলাটাই নাকি পারফেক্ট হবে ওর মুভির ক্যারেক্টারের জন্য। তাই কোনো এক অচেনা কমলিকা দাশগুপ্তের নম্বর জোগাড়ের জন্য পাগল হয়ে গিয়ে আমার সাথে অ্যাসাইনমেন্ট ক্যানসেল করলো।

আই অ্যাম ফিলিং ইনসাল্টেট পাপা।

ঈশার চোখে হতাশা আর জীবনে প্রথম হেরে যাওয়ার ব্যর্থতা দেখলো কমলিকা।

মনীন্দ্রর মুখে আতঙ্ক। ফিসফিস করে বললো, কি নাম বললি?

ঈশা বিরক্ত হয়ে বলল, পাপা তুমি এখনও নাম নিয়ে পড়ে আছো? এদিকে আমি বন্ধু, বান্ধব পরিচিত সকলকে বলে দিয়েছিলাম, এমনকি আমার চ্যানেলে পর্যন্ত অ্যানাউন্স করে দিয়েছি, যে অর্কর নেক্সট মুভি 'বিজয়িনী'তে বেশ কয়েকটা কবিতা শুনতে পাবেন আমার গলায়! বুঝতে পারছ আমার ভিউয়ার্সদের কাছে আমি কতটা ছোট হয়ে যাবো।

আমি আর ভাবতে পারছি না পাপা।

মনীন্দ্র আবারও বললো, কার নাম বললি?

ঈশা বিরক্ত হয়ে বলল, কমলিকা দাসগুপ্ত, ওনার কবিতা এই তিনদিনে ভাইরাল হয়ে গেছে ফেসবুকে। আমাকেও তিনজন সেন্ড করেছে।

মনীন্দ্র আতঙ্কিত গলায় বলল, একবার শোনাবি?

ঈশা পাপার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি তো এমন ভাবে বলছো, যেন তুমি মহিলাকে চেন!

নিজের মোবাইলটা অন করে কবিতাটা চালিয়ে দিলো ঈশা।

কেঁপে উঠলো মনীন্দ্র।

কবি প্রবীর রায়চৌধুরীর—পরজন্ম

কমলিকা দাসগুপ্তের কণ্ঠে

যখন তুমি দাঁড়িয়ে আছো ছাদের আলসেতে,

আমি নির্নিমেষ তাকিয়ে ভাবি একটা পরজন্ম চাই, দুচোখ ভরে তোমায় দেখবো বলে।

তোমার কড়ি আঙুলটা ধরবার স্পর্ধার জন্য একটা পরজন্ম চাই আমার।

তোমায় ডাকনামে ডাকবো বলেই চাই পরজন্ম।

তোমার খোলা চুলের গন্ধ নিতেও চাই ওই জন্মে।

তোমার গোলাপি ঠোঁটের দিকে সাহস ভরে তাকাতে চাই পরজন্মে।

না, না, এ জন্মে তুমি দূরের নীহারিকা। রূপকথার রাজকন্যা।

তোমায় ছুঁয়ে দেখবো, সাহস কোথায়!

পরজন্মে আমিও আসবো পক্ষীরাজে চড়ে,

এই ভাঙা সাইকেল ফেলে দেব আস্তাকুঁড়ে।

তোমার চিবুক ধরে বলবো, চলো তোমায় নিয়ে যাবো সাত সমুদ্র পাড়ে।

তোমার ইচ্ছেপূরণের চাবিকাঠিটা তোমার হাতে দিয়ে বলবো,

ভালোবাসি, বিশ্বাস করো গতজন্ম থেকে

অপেক্ষা করছি শুধু তোমার জন্য।

একটা পরজন্ম চাই আমার।

দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো মনীন্দ্র।

ঈশা তিতবিরক্ত গলায় বলল, তোমার আবার কি হলো পাপা? এক্সের কথা মনে পড়লো নাকি! মাকে তো বাধ্য হয়ে লগ্নাভ্রষ্টা হওয়া থেকে বাঁচাতে বিয়ে করেছিলে তুমি, তাই কি পুরোনো ব্যর্থ প্রেমের কথা মনে পড়লো তোমার?

আশ্চর্য মানুষ বটে। কবিতা শুনে কাঁদছো!

মনীন্দ্র ভাঙা গলায় ফিসফিস করে, এই কবিতাটাই প্রবীর রায়চৌধুরীর বই থেকে টুকে আমি কমলিকাকে পাঠিয়েছিলাম।

ঈশা সব ভুলে বোকার মত তাকিয়ে আছে পাপার দিকে।

ঈশা বললো, তুমি কি চেন নাকি মহিলাকে?

আরে এনার জন্য আমার সব বানচাল হয়ে গেছে গো, এর নম্বর জোগাড় করতে পারলে আমি জাস্ট রিকোয়েস্ট করবো, উনি যেন অর্কর সাথে কাজটা না করেন। তাহলে অর্ক বাধ্য হয়ে আমাকেই ডাকবে, ওর হাতে আর অপশন নেই।

কমলিকা ধীর পায়ে ফোনটা নিয়ে নিজের ঘরে গেল।

প্রবুদ্ধ, প্লিজ আমায় এটা করতে বলো না। অর্কপ্রভ না কে যেন ঈশার অ্যাসাইনমেন্ট বাতিল করে দিয়েছে, ঈশা ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছে। মা হয়ে এভাবে মেয়ের সাথে কম্পিটিশন করতে পারছি না আমি। তুমি যা বলেছো আমি শুনেছি প্রবুদ্ধ। ইউটিউবে চ্যানেল খোলা, ফেসবুকে পেজ খোলা, রেকর্ডিং করা, সেগুলো তুমি যেভাবে পোস্ট করেছো আমি কিছুতেই তোমায় বাধা দিইনি। কিন্তু তাই বলে মা হয়ে শেষ পর্যন্ত ঈশার সাথে প্রতিগযোগিতায় নামবো? নিজের বিবেককে কি উত্তর দেব প্রবুদ্ধ!

ওর কথা শেষ হবার আগেই ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকলো ঈশা।

কমলিকার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঈশা বললো, তুমিই কমলিকা দাসগুপ্ত? তুমি কার্ডিওলজিস্ট কমলেশ দাসগুপ্তর মেয়ে? তুমি ইংলিশে মাস্টার্স?

এগুলো কি সঠিক?

এখুনি আমার এক বন্ধু তোমার একটা ছবি পাঠিয়েছে আর ডিটেল দিয়েছে। তুমি তো চ্যানেলে নিজের ছবি দাও নি। কি হলো, চুপ করে আছো কেন, এগুলো কি সত্যি?

কমলিকা কিছু বলার আগেই মনীন্দ্র বললো, হ্যাঁ এগুলো সত্যি।

ঈশা অবাক চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, মানে? তুমি যে সেই ছোট থেকে বলেছো, তোর মা খুব গরিব বাড়ির মেয়ে, তুমি নাকি তাকে বিয়ে করে উদ্ধার করেছ,

মা নাকি চূড়ান্ত অশিক্ষত। ভুল কবিতা শেখাবে আমাদের....এগুলো তাহলে কি পাপা?

মনীন্দ্র অর্থহীন ভাবে ঈশার দিকে তাকিয়ে বলল ওগুলো মিথ্যে ছিল।

ঈশা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়ে বলল, মিথ্যে বলেছিলে? কেন, মায়ের নামে এত মিথ্যে বলে তোমার কি লাভ হয়েছিল?

কমলিকা স্থির কম্পনহীন গলায় বলল, জিতে গিয়েছিল তোমার পাপা।

নিজের মানসিক বিকারকে চরিতার্থ করতে মিথ্যের পর মিথ্যে সাজিয়েছিলো তোমার বাবা।

কমলিকার ফোনে একটা আননোন নম্বর থেকে ফোন ঢুকছে। রিসিভ করতেই ভরাট গলায় কেউ একজন বললো, আমি অর্কপ্রভ ব্যানার্জী বলছি। ফেসবুকে আপনার বেশ কয়েকটি কবিতা শুনে আমি আপনার সাথে কাজ করতে আগ্রহী।

কমলিকা ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললো, সরি। আমি যতদূর জানি, আপনার সাথে মিস ঈশা সেনের একটা মৌখিক কন্ট্যাক্ট হয়েছিল এই মুভিটার ব্যাপারে, তাহলে আপনি কেন আমায় অ্যাপ্রোচ করছেন?

এক্সট্রিমলি সরি, আমি কাজটা করতে পারবো না।

কমলিকা ফোনটা কেটে দিলো।

রান্নাঘরে যাওয়ার সময় শুনতে পেল ঈশা ফোনে অর্ককে বলছে, সরি অর্ক, আমি তোমার কোনো মুভিতেই

আর কাজ করতে পারবো না।

তারপরেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ঈশা, বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে মেয়েটা।

ছোটবেলায় বায়না করে কিছু না পেলেই এভাবে কাঁদত ঈশা। কমলিকা পায়ে পায়ে ওর ঘরে ঢুকে ঈশার পিঠে হাত দিয়ে বললো, কাঁদছিস কেন? অর্কর অফার ফিরিয়ে দিলি কেন?

ঈশা কমলিকাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বললো, মা প্রবুদ্ধ আমার ফোন রিসিভ করছে না, মেসেজের রিপ্লাই পর্যন্ত দিচ্ছে না, প্রবুদ্ধ আর আমায় ভালোবাসে না মা। আমি ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটাও পেলাম না ওর কাছে।

কমলিকা শান্ত গলায় বলল, একদিন প্রবুদ্ধ তোকে বারংবার ফোন করে গেছে, তুই রিসিভ করিস নি।

ওর মেসেজের উত্তর অবধি দিস নি। মিথ্যে বলেছিস ওকে, তারপরেও ও তোকে ফোন করে গেছে। ঈশা ধরে নে এবারে তোর পরীক্ষা। ও যতটা এফোর্ট দিয়েছিল তোদের সম্পর্কটাতে তুই ততটা দিসনি। এখন তুই এফোর্ট দে ঈশা, যতক্ষণ না প্রবুদ্ধর অভিমানের বরফ গলে ততক্ষণ পর্যন্ত তুই চেষ্টা করে যা।

ঈশা বললো, মা প্রবুদ্ধ তো তোমাকে খুব ভালোবাসে তাই না? ওই তো তোমার রেকর্ডিং, চ্যানেল এসব করে দিয়েছে, তুমি একবার ওকে বলবে আমার হয়ে?

কমলিকা ঘাড় নেড়ে বললো, বেশ বলে দেখবো।

রাতে প্রবুদ্ধ ফোনে বললো, আন্টি, ঈশা আজ আমায় পঞ্চাশবার ফোন করেছে, 'মেয়েটা নিজের ভুল বুঝতে

পেরে মেসেজ করেছে, আমি আর পারছি না আন্টি। এবারে আমি ওর কল রিসিভ করছি।

ঈশা কষ্ট পাচ্ছে আন্টি।

কমলিকা বললো, পাঁচশোটা কল করলে তারপর রিসিভ করবে প্রবুদ্ধ, এটা আমার নির্দেশ। আরেকটু এফোর্ট তুমি ডিসার্ভ করো।

প্রবুদ্ধ ভাঙা গলায় বলল, কিন্তু ঈশা যে কষ্ট পাচ্ছে।

কমলিকা কঠিন গলায় বলল, তুমি আরও বেশি কষ্ট পেয়েছিল প্রবুদ্ধ, ভুলে যাচ্ছ কেন। ঈশাকে আরেকটু কষ্ট পেতে দাও। আগুনে পুড়লে তবেই তো খাঁটি সোনাটাকে তুমি পাবে প্রবুদ্ধ।

দেবজিত আর ঈশার সাথে ব্রেকফার্স্ট টেবিলে বসে দেবজিতের বিয়ের মেনু ঠিক করছিল কমলিকা। ঈশা আজ নিজের চ্যানেলে মাকে লাইভে আনবে বলে পাগলামি শুরু করেছে। ওর সব ভিউয়ারের সামনে নাকি ও বলতে চায়, আজকের ঈশা সেন হবার পিছনে সমস্ত ক্রেডিট ওর মায়ের।

মনীন্দ্র দূর থেকে দেখেছিলো ওদের।

ছেলে, মেয়ে দুজনেই চূড়ান্ত অপমান করেছে বাবাকে। এত মিথ্যে কথা ওরাও সহ্য করতে পারে নি।

দেবজিত তো বলেই বসলো, ভাগ্যিস মায়ের ব্লাডটাও আমাদের শরীরে ছিল, নাহলে তো মিথ্যেবাদীর শিরোপা পেয়ে যেতাম, সঙ্গে প্রবঞ্চকের মুকুটটাও।

মনীন্দ্র এই সংসারেই আছে কিন্তু এক কোণে, যেখানে এতদিন কমলিকার স্থান ছিল, মনীন্দ্র আজ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, একা, নিঃসঙ্গ ভাবে।

মনে মনে ভাবছিলো, কমলিকাকে হারাতে গিয়ে নিজের সব হারিয়ে ফেললো ও। এমন কি সম্মানটুকুও। দূর থেকেই শুনতে পেল কমলিকা বলছে,

একটা পরজন্ম চাই আমার।

নতুন করে মানুষকে বিশ্বাস করার শক্তি চাই।

ভালোবাসা শব্দের সঠিক অর্থ জানার জন্য

পরজন্ম চাই।

মুখোশ ছাড়া প্রেমিকের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখার জন্য আরেকটা পরজন্ম চাই আমার।

ইচ্ছাপূরণের ঘুড়িটাকে ধরার জন্য পরজন্ম চাই।

এ জন্মের সব ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার জন্য

একটা পরজন্ম চাই আমার।

সমাপ্ত

সহযাত্রী

।। ১।।

তুই বল স্বর্ণালী, ছেলেরা কবে ভালোবাসা শব্দের অর্থ বুঝেছে রে? আর দ্যাট বয়, এই সৃজন তো রীতিমত ইরিটেটিং হয়ে উঠেছিল রে। ওর কাছে মডার্ণ শব্দের অর্থ বারে বসে ড্রিংক করা আর ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরা। না রে অনেক চেষ্টা করেছিলাম মানিয়ে নেওয়ার, বাট আল্টিমেট রেজাল্ট ইস এ বিগ জিরো। তুই একটা কথা বল স্বর্ণালী, কেন আমাকে আমার প্রিয় চুড়িদার, জিন্স-টপ ছেড়ে শর্ট পোশাক পরতে হবে? কেন আমায় মাঝরাতে পার্টিতে গিয়ে উত্তাল নাচতে হবে? শুধু ভালোবাসতাম বলে? গো টু হেল। ওর জব, ওর ফ্যামিলি সবকিছু মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ আর আমি যেহেতু স্কুল টিচার, তাই আমার নাকি তেমন কোনো কাজই থাকে না স্কুলে। না রে, বিয়ের আগেই এত টালবাহানা, না জানি বিয়ের পরে কি করবে! দিন দিন আমিও ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলাম।

কি বলছিস? না ট্রেন এখনো ছাড়ে নি। মা, বাবা এখনো জানে না সৃজনের সাথে আমার ব্রেকআপ হয়েছে। আসলে কি বলতো, এতদিন ধরে ওরা জেনে এসেছে, সৃজনের সাথেই আমার বিয়ে হবে। তাই বাবা, মা মুখে কিছু না বললেও মোটামুটি স্যাঙ্গুইন ছিল। এখনই

ব্রেকআপের খবরটাও দিতে পারিনি। তাছাড়া কি বলবো বলতো, মাস তিনেক ধরে আমি নিজেই কাজ নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম। সৃজন অলরেডি ওদের অফিসের একটা মেয়ে রাকার সাথে ডিস্কে গিয়েছিল বার চারেক জানিস? আমাকে ওরই বন্ধু অর্জুন ওদের দুজনের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি পাঠিয়েছে। এখন তো রাকাকে নিয়ে ঘুরেও বেড়াচ্ছে। আমি প্রশ্ন করায় ও পরিষ্কার বললো, প্রেম করলে বুঝি বান্ধবী থাকতে নেই?

না রে স্বর্ণালী, সৃজনের সাথে আমার মধ্যবিত্ত পজেসিভ মানসিকতার কোনো মিল নেই বুঝলি।

আসলে কি বলতো, ছেলেদের মন বলেই কিছু নেই। এখন ও চাইছিলো, ঘরে একটা বউ রেখে বাইরে অন্যদের নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। এনাফ হয়ে গেছে রে। সেলফ রেসপেক্ট বলেও তো একটা কথা আছে। তাছাড়া আমি আপাতত দার্জিলিং যাচ্ছি, নিজের সাথে নিজে কিছুটা সময় কাটাবো বলে একান্তে। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পাইনি বুঝলি! তাই পাহাড়ের কোলে বসে ওদের সাদামাটা জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁজবো নতুন করে। হয়তো বলবি, ব্রেকআপের পর সব মেয়েরাই লাভারের নামে দোষ দেয়, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি সৃজনের নামে দোষারোপ করছি না। তবে ওর মত অনুযায়ী চলতে চলতে আমি জাস্ট হাঁপিয়ে গেছি রে। সৃজনও ভীষণ ক্লান্ত আমাকে নিয়ে। ও নিজেই স্বীকার করলো সেটা। পরিষ্কার বললো, আমার মত ব্যাকডেটেড মেয়েকে নিয়ে নাকি ও হাঁপিয়ে উঠেছে। ও ফাস্ট লাইফ

লিড করতে চায় রে। তাই আমি ওর জীবনে বড্ড বেমানান। দুজনেই যখন বুঝে গেছি আমরা মারাত্মক মিসম্যাচ তখন আর কেন টেনে বেড়ানো!

যাকগে, আপাতত রাখলাম। ডোন্ট ওরি, তুই তো আমায় চিনিস সেই ছোট থেকে, মনের ক্ষতটাকে রাখতে জানি মনের মধ্যেই। পরে কল করবো। দিন পাঁচেক পরে ব্যাক করছি, তারপর মিট করবো।

দেবলীনার কথা শেষ হবার আগেই দার্জিলিং মেল সামান্য নড়ে উঠে জানাল দিলো, এবারে চলো। পিছনে পড়ে রইলো শিয়ালদহর জনবহুল স্টেশন। জীবনে প্রথম বার বাবা, মাকে একটা বড় মিথ্যে বলেছে দেবলীনা। বলেছে স্কুল এক্সকারসনে যাচ্ছে। আসলে যাচ্ছে সম্পূর্ণ একা। একা যাবে শুনলে মা কিছুতেই যেতে দিত না, তাই বাধ্য হয়েই মিথ্যে বলতে হয়েছে।

এসি থ্রি টায়ারে বসে জানালার দিকে এক মনে তাকিয়ে থাকলো দেবলীনা। আগে ঘনঘন ফোন চেক করাটা একটা নেশা হয়ে গিয়েছিল, হয়তো সৃজন মেসেজ করেছে, তাই চেক করতো। কিন্তু গত দু তিনমাস ধরে অভ্যাসটা কমতে কমতে বাতিলের দলে চলে গেছে। পার্স থেকে হেডফোনটা কানে গুঁজে অরিজিৎ সিং কিংবা শ্রেয়া ঘোষালে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছিল দেবলীনা। ঠিক তখনই সামনের সিটের ছেলেটা ফোনে বেশ জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করে দিলো। কেউ কেউ ভুলেই যায়, পাবলিক প্লেসে ফোনে কথা বলার সিস্টেমটা।

ছেলেটা বলছিলো, কেন যে তুমি এত চিন্তা করো রাই, আরে আমি তো ট্রেন ছাড়লেই মেসেজ করতাম। পাগলী, সোনা আমার। বিয়েটা হয়ে গেলে তো তোমাকে সঙ্গে করেই নিয়ে যেতাম। তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বললো, সামনে একজন মেয়ে বসেছে। বয়েস আমার থেকে বছর দুয়েকের ছোটই হবে বুঝলে। ওই পাশে একটা ফ্যামিলি রয়েছে। নানা, সোনা, তুমি থাকতে আমি কি অন্যের দিকে তাকাতে পারি? তাছাড়া মেয়েটার সবে ব্রেকআপ হয়েছে, তাই নিজেকে একটু সামলেই রেখেছি।

কি বলছ, দেখতে? ওই আরকি সো সো, তোমার মত অত সুন্দরী নয় সোনা। আচ্ছা শোনো, সিগন্যাল চলে যাচ্ছে, আর মেয়েটা তোমার বেবির দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে, তাই এখন রাখছি। তুমি ভাবলে কি করে কেউ আমায় মলেস্ট করবে আর আমি সহ্য করবো? নো ওয়ে সোনা, পুচু, তোমার দিগন্ত সব সামলে নেবে। গুড নাইট পুচু মনা।

সহ্যের একটা সীমা থাকে, দেবলীনা সামনের ছেলেটার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। একে তো কান পেতে ওর আর স্বর্ণালীর কথা শুনেছে, তারপর আবার নিজের গার্লফ্রেন্ডের কাছে ফলাও করে সেসব কথা বলছিল। হাও ডেয়ার হিম! এতক্ষণে ছেলেটার দিকে সোজাসুজি তাকালো দেবলীনা। দেখতে শুনতে মন্দ নয়, ড্রেস সেন্সও ঠিক ঠাক, অথচ রুচিটা দেখো, মিনিমাম সৌজন্যতা নেই। দেবলীনার সব থেকে রাগ ধরেছে, ওকে দেখতে সো সো বলাটা। ওর বয়ফ্রেন্ড সৃজন ছিল মারাত্মক নাকউঁচু

পাবলিক। সে পর্যন্ত স্বীকার করেছিল, হয়তো দেবলীনার থেকে মডার্ন মেয়ে ও পেয়ে যাবে জীবনসঙ্গী হিসাবে, কিন্তু সুন্দরী নয়। সেখানে অপরিচিত একটা ছেলে ওর ব্রেকআপের খবর শুনে আহ্লাদিত হয়ে উঠেছে ভাবলেই পায়ের বুড়ো আঙুলের রক্ত ডিরেক্ট মাথায় উঠে যাচ্ছে।

দেবলীনার মনটা এমনিই ভাল নেই। কলিগ থেকে আত্মীয়-স্বজনরা সবাই মোটামুটি জানে ও একজনকে ভালোবাসে, তার সাথেই ওর বিয়েটা হবে। হয়তো সবাই সৃজনের নাম জানতো না, বা ওকে চিনতো না, কিন্তু একজনের উপস্থিতি তো ছিল। তাদের কাছে এখন কি বলবে সেই ভাবনাটাই ঘুরে ফিরে আসছে। ও সৃজনের মত উচ্চবিত্ত ফ্যামিলিতে বিলং করে না। ওর বাবাও শিক্ষক, মা নেহাতই হাউজ ওয়াইফ, তাই ওরা মধ্যবিত্ত মানসিকতাতেই অভ্যস্ত। একজনের সাথে বিয়ে হবে প্রায় ঠিক অথচ হচ্ছে না, কথাটা বলা অতটাও সহজ নয়। হাজারখানেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে দেবলীনাকে। এরকম মনের অবস্থায় সামনের এই সুপুরুষ জোকারটারটা বসে বসে ওর নামে উল্টো পাল্টা বকেই চলেছে, অসহ্য হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা।

দেবলীনা বিরক্ত হয়ে কটকট করে তাকালো ছেলেটার দিকে। স্কুলের স্টুডেন্টরা ওর আড়ালে বলে, দেবলীনা ম্যাম একবার তাকালেই ভয়ে কুপোকাত হই আমরা। তিনবছরের স্কুলের সেই ভরসাতেই ছেলেটিকে ভয় পাওয়াতে চাইলো দেবলীনা। হিতে বিপরীত হলো।

ছেলেটি কাঁচুমাচু মুখ করে বললো, সরি ম্যাম, আসলে আমার ফিঁয়াসে বড্ড কিউট আর একটু সন্দেহবাতিক, তাই আপনাকে কম সুন্দরী বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। আসলে কিন্তু এটা সত্যি নয়।

রাগে গোটা শরীর জ্বলে গেল দেবলীনার, ভেবেছে কি ছেলেটা!

।। ২।।

ট্রেনের কামরার অনেক মানুষই লাইট নিভিয়ে শোওয়ার বন্দোবস্ত করছে দেখেই, ব্যাগ থেকে ডিনার বক্সটা বের করলো দেবলীনা। রাতের ট্রেনে ও বরাবরই খুব হালকা খাবার খেতে পছন্দ করে। বাবা, মায়ের সাথেও যখন ট্যুরে যায় তখনও মায়ের গরম গরম লুচি বা বাবার ত্রিকোণা পরোটার প্ল্যান ক্যানসেল করে ও বরাবর রুটি-আলুর তরকারির পক্ষে লড়াই করে। আজ যেহেতু সম্পূর্ণ একা যাচ্ছে, তাই আর লড়াই করতে হয়নি। মা বক্সে তিনটে রুটি আর অন্য কন্টেইনারে তরকারি ভরে দিয়েছে। মায়ের হাতের খাবার আর নরম যত্নের ছোঁয়াটুকুতেই মনটা অবসন্ন হয়ে গেল দেবলীনার। আজ অবধি কোনো ট্যুরে ও একা যায়নি। বাবা, মাকে ছাড়া বাইরে বেড়াতে যাওয়া এই প্রথম। ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে থাকতে একবার বন্ধুরা মিলে ছোট ট্যুর করেছিল বটে, কিন্তু সেখানেও বাবা ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল। মনটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল ওর। একা থাকবে বলেই তো দার্জিলিং যাচ্ছে আর একা হওয়ার ভয়ে কাতর হচ্ছে ওর অবাধ্য শাসন না মানা মন।

নিজের মনটাকেই এখনো ঠিক মত চিনতে পারলো না দেবলীনা। স্বর্ণালীকে বলা ওর কথাগুলো যে কেউ শুনলে ভাববে, ও হয়তো ভীষণ ভাবে চাইছিলো সৃজনের সাথে ওর ব্রেকআপটা হয়ে যাক। আসলে কি তাই? যদি তাই হবে তাহলে এখনো কেন সৃজনের হোয়াটসআপের মেসেজগুলো ডিলিট করতে পারেনি ও! কেন এখনও ফটো গ্যালারিতে রাখা সৃজনের ছবিগুলো ওপেন করে অপলক তাকিয়ে থাকে!

এক্সকে খারাপ বলাটা বোধহয় হিউম্যান সাইকোলজির একটা পার্ট। প্রাক্তনকে খারাপ প্রতিপন্ন না করলে নিজেকে নিখুঁত মানুষ সাজানোর প্রচেষ্টাটা সফল হয় না।

তাই কি ও সৃজনকে অপরাধী তৈরি করছে!

হতেই তো পারে সৃজনের সাথে এতদিন পর্যন্ত ওর মতের মিল হতো, এখন হচ্ছে না। দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ বুঝেছে যে তারা মিসম্যাচ, আর আবেগ দিয়ে জীবন চলে না। তাই তারা ব্রেকআপ করেছে, এতে এত সমস্যা কোথায়!

প্রাক্তন মানুষটার সবটা খারাপ তো নয়। সৃজন ভীষণ স্মার্ট, বেশ ম্যানলি একটা ব্যাপার আছে ওর মধ্যে। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেওছে দেবলীনা। সৃজনই প্রথম ওকে বলেছিল, দেবলীনা, জীবনটা তোমার, তাই তুমিই সিদ্ধান্ত নেবে তুমি কি চাইছো। অন্যের প্রেশারে নিমরাজি হয়ে জীবন কাটাবে না, তাহলে মনে হবে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ। আর লোকের কথায় প্রভাবিত হবার আগে

নিজের মনে একবার ভাববে, তাহলেই কথাটার সত্য মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে যাবে তোমার সামনে।

সৃজনের এই কথাকে গুরুত্ব দিয়েই ও ব্রেকআপ করেছে সম্পর্কটা থেকে। বুঝতে পারছিল, চুইংগামের মত টেনে ধরে রাখলে হয়তো থাকতো, কিন্তু মিষ্টতা নষ্ট হয়ে যেত। তবে গত তিন বছরে এটুকু বুঝেছে, সৃজনের সাথে ওর কোনো দিক দিয়েই মিল নেই। আসলে সৃজনের বন্য ফুলের উগ্র গন্ধটা বড্ড পছন্দের। জঙ্গলের আদিম গভীরতায় মেতে থাকতে চায় ও। অথবা শহরের আলো ঝলমলে মায়া নগরীর উদ্দামতায় মদির হতে চায়। ওর সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটতে গিয়ে দেবলীনা সত্যিই খুব হাঁপিয়ে যায়। ক্লান্ত লাগে ওর। নিজের মনের প্রতিটা ঘরে উঁকি মেরে বুঝতে পেরেছে দেবলীনা, আদপে ও মধ্যবিত্ত। মুখে যতই আধুনিকতার বড়াই করুক, দিনশেষে একটা নিশ্চিন্ত গৃহকোণ ওর বড় পছন্দের। সেখানে মাটির দেওয়ালে নিকোনো আলপনা না থাক, একটা গোছানো ঘর থাকবে, তাতে ওর ফুলছাপ পরিচিত চাদর পাতা থাকবে, আর থাকবে জানালায় একটু ভারী পর্দা। যাতে বেডরুমের ভিতরের ওদের একান্ত মুহূর্তগুলো কিছুতেই পাবলিক না হয়। ডিস্কো ঠেকে পাবলিকলি লিপ লক করাতে ওর আপত্তি থাকলেও, নিজেদের ঘরে একান্ত মুহূর্তে ও নিশ্চয়ই শুষে নেবে একমাত্র মানুষটির ঠোঁটের আর্দ্রতা। এগুলোই পার্থক্য ওর আর সৃজনের। সৃজন জীবনে কোনো রকম আড়াল, আবডাল পছন্দ করে না। সবটাই বড্ড ওপেন। কিন্তু দেবলীনা পছন্দ করে আড়াল।

সকলের সামনে নয়, সকলের চোখ বাঁচিয়ে প্রাণের মানুষটার হাত ধরতেই ও পছন্দ করে। মানুষ মাত্রই ভিন্ন, তাই তাদের পছন্দও ভিন্ন হবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে দেবলীনা এতদিন সৃজনকে হারানোর ভয়ে ওর পছন্দগুলোর সাথেই নিজেকে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করছিল। মনের সাথে যুদ্ধ করেও চেষ্টা করছিল, কিন্তু ইদানিং নিজের কাছের মানুষটার চারপাশে অন্যদের উপস্থিতি এতটাই বেশি হয়ে গেছে, যে ওই ভিড়ে নিজের অস্তিত্বটা কেমন হারিয়ে ফেলছিলো ও। রাকা, ডালিয়া, দেবযানী, সৃজনের এত এত বান্ধবীর ভিড়ে দেবলীনা নামটাকে খুঁজেই পাচ্ছিলো না যেন। ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে যাবার ভয়েই বাধ্য হয়ে সরে আসছিল একটু একটু করে। তারপর বুঝলো, সৃজন ওর হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। ইচ্ছেও করেনি, আবার নতুন করে এফোর্ট দিতে। বরং মুক্তির একটা নিঃশ্বাস নিয়েছিল ওর ফুসফুস।

উপলব্ধি করতে পারছিল, "বোঝা", "বন্ধন" মনে হওয়া সম্পর্কে আর যাই থাকুক অনুভূতিগুলোর মৃত্যু হয় খুব তাড়াতাড়ি। হারিয়ে যায় ভালোবাসা নামক অতি আপেক্ষিক অনুভূতিটা।

এই যে ম্যাডাম, আপনি কি কবিনী?

নিজের ভাবনার জগৎ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো দেবলীনা। সামনের অতি অসভ্য ন্যাকা ন্যাকা ছেলেটা ওর দিকে তাকিয়েই কিছু যেন বলছে।

ভ্রু তুলে তাকাতেই বললো, বলছি, আপনি কি কবিনী?

শব্দটা বড্ড আননোন তাই ঠিক বুঝতে পারলো না দেবলীনা। বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, মানে?

ছেলেটি অকারণে এক মুখ হেসে বললো, না মানে কবিতা লেখেন নাকি? মানে যেভাবে হাতে রুটি নিয়ে কাব্যিক ঢঙে কিছু ভাবছিলেন, তাই ভাবলাম আপনি হয়তো কবিনী।

সহ্যের একটা সীমা আছে, তিতিবিরক্ত হয়ে দেবলীনা বললো, আপনার এক্সাক্টিলি প্রবলেমটা কি বলুন তো মিস্টার? সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের সঙ্গে কথাই বা বলতে আসছেন কেন?

ছেলেটি সপ্রতিভ ভাবে বললো, ওহ, দেখেছেন, আপনাকে নিয়ে আমার গার্লফ্রেন্ড সন্দেহ অবধি করে ফেললো, আর আমি এখনও আপনাকে আমার নামটাই বলিনি। দিগন্ত সাহা। আমার নাম দিগন্ত সাহা, আমি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, নেশায় ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি। ভ্রমণ বলতে আপনারা যেটা বোঝেন সেটা নয়। দামি একটা হোটেলে উঠলাম, রুম সার্ভিসে খাবার অর্ডার করলাম, নানা রঙের ড্রেস পরে সেলফি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করলাম আর হোটেলের ঘরে বসে বসে লাইক গুণলাম... ফেরার দিন গুচ্ছের শপিং করলাম, মাসতুতো ননদের শাশুড়ির জন্য। আরও দুখানা ব্যাগ কিনে কুলির মাথায় দরদাম করে চাপিয়ে দিয়ে পিছন পিছন ছুটে ভ্রমণ শেষ করলামের দলে আমি পড়ি না। আমি রীতিমত কোমরে দড়ি বেঁধে ট্রেকিং করি, টেন্ট ফেলে শুয়ে থাকি বিপদসঙ্কুল জায়গায়। অদ্ভুত একটা আনন্দ পাই এভাবে

জীবনটাকে এনজয় করতে। আজ আছি মশাই কাল নেই, তাছাড়া বারো মাস তো অফিসের একঘেয়ে কাজ, বাকি সময়টুকু ঘরে বসে ল্যাদ খাচ্ছিই, আবার বেড়াতে এসেও ল্যাদখোর আমি নই।

দেবলীনা দিগন্তর কথার তোড়ে ভেসে যেতে যেতে কোনোমতে পাড় ধরে উঠে বললো, কিন্তু কবিনীটা কি পদার্থ?

জিভ কেটে দিগন্ত বললো, সরি ম্যাডাম, আপনি ফেমিনিজিনম অ্যান্ড কোম্পানির মেম্বার বুঝি? যারা কবি, লেখক, ডক্টর এসবের জেন্ডার চেঞ্জ করলে হেভি রেগে গিয়ে, পতাকা হাতে রাস্তায় নেমে বলে, আমাদের দাবি মানতে হবে। যেন মনে হচ্ছে শিক্ষিকাকে শিক্ষক বললেই, ওনারা সুরক্ষিত হয়ে যাবেন। মনে হয় যেন, এসব বলেই পাল্টে ফেলবেন সমাজটাকে। আরে বাবা, এতকালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের খোল নলছে বদলানো কি এতই সোজা নাকি হে। এসব শিক্ষক, শিক্ষিকা বলা, বা ভাবাতে বিশাল কিছু হয়না বুঝলেন, বরং আধুনিকতা রাখতে হয় নিজের মনে। যাইহোক, সরি কবিনী নয়, কবিই বলি তবে?

দেবলীনা অবাক হয়ে দেখছিল, একটা মানুষ কি পরিমাণে বকতে পারে, তা এই দিগন্ত সাহা লোকটিকে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতো না দেবলীনা।

দেবলীনা বিরক্ত হয়ে বলল, না আমি কবি নই। আমি একজন শিক্ষিকা। আর অপরিচিত মহিলার সাথে কি ভাবে

কথা বলতে হয় সেটা আপনার পুচুসোনা শেখায় নি আপনাকে?

এক মুখ হেসে দিগন্ত বললো, মোটামুটি নিশ্চিন্ত হলাম। এই যে নিজেকে শিক্ষিকা আর মহিলা বললেন এতেই আমি খুশি হলাম। অনেকে তো আবার আধুনিক হতে গিয়ে নিজের জেন্ডারকেই মানতে চায় না মশাই।

সে যাকগে, এবারে বলুন দেখি, আপনার লোয়ার না মিডিল? মানে আমার পুচুসোনা ট্রেনে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে বলে।

শরীরটা ভালো লাগছিলো না দেবলীনার। অদ্ভুত একটা একাকীত্ব কামরার এতজনের উপস্থিতিকে ছাপিয়ে ওকে ঘিরে ধরছিল যেন। খাবারটাও খেতে ইচ্ছে করছিল না। বাড়িতে বাবা-মা, রেগুলার স্কুল, নিজের গান শোনা, বই পড়া করে কেটে যায় দিনটা। সারাদিনের ক্লান্তি এসেই ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যায় ওকে। কিন্তু এই কামরায় ও একেবারে একা, ওর নিজের কেউ নেই ভাবলেই কেমন মনখারাপ হয়ে যাচ্ছে যেন। এই আবোলতাবোল বকবক করা লোকটাও যদি ঘুমিয়ে যায় তখন নিশ্ছিদ্র একটা রাত্রি, ও কাটাবে কি করে? তবে এই লোকটার নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে, তাই ওর সিট কোনটা জিজ্ঞেস করছে। সারারাত কি ওর সামনে শুয়ে অসভ্যের মত ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে নাকি রে বাবা! আজকাল মানুষ চেনা বড় দায়। সৃজনকেই চিনতে পারলো না দেবলীনা, আর মুহূর্তের পরিচয়ে তো কথাই নেই। ওদিকে ফোনে পুচু

সোনা হচ্ছে, এদিকে মেয়ে দেখলেই হাঁ করে গেলার মেন্টালিটি। দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে ওর।

তেমন ইচ্ছা না থাকলেও দেবলীনা বললো, আমার লোয়ার আছে।

দিগন্ত বলল, সম্ভবত আপনার ওপরের সিটটাতেও একজন মহিলা আছেন। আমারও লোয়ার, ওদিকে ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় দেখলাম একটা ফ্যামিলির সবাই আপার আর মিডিল পেয়েছে। একটা লোয়ার খুঁজছিল বুঝলেন, বোধহয় বয়স্ক একজন ভদ্রমহিলার পায়ে প্রবলেম আছে, ওনার জন্যই।

একটা কাজ করি, আমি আমার সিটের মিডিলে চড়ে বসি, ওনাকে আপনার সামনের আমার সিটটা দিয়ে দিই বুঝলেন। তারপর চোখটা একটু টিপে মুচকি হেসে বললো, তাছাড়া এমন সুন্দরী সামনে থাকলে, সেদিকে বার দুই চোখ চলে যাবেই। আমার পুচু সব বুঝতে পারে, হয়তো মাঝরাতেই আমায় ফোন করবে।

দেবলীনা ওয়াশরুম থেকে ঘুরে এসে দেখলো, দিগন্ত বেড সিট পেতে বেশ ভালো করে গুছিয়ে তিনটে বিছানা করে রেখেছে।

আর পাশের কামরার ভদ্রমহিলার সাথে বকবক করছে।

ভদ্রমহিলা বললো, এই পা নিয়েই ঘুরতে বেরিয়েছি বুঝলে বাবা। কি করবো, বাইরের পৃথিবীটা যে বড্ড টানে। এখন আর দূরে দূরে যেতে পারি না।

দিগন্ত বিজ্ঞের মত বললো, আপনার পায়ে তেমন প্রবলেম নেই পিসিমণি, প্রবলেম মনে। এই যে মনটাকে

ঠিক করে বশে এনে ফেলেছেন, তাই বেরিয়ে পড়তে পেরেছেন। অনেকে তো আবার মনকে বশে আনতেই বাইরে বেরোয়। ধরুন কষ্ট ভুলতে যায়। আসলে কি বলুন তো পিসিমণি, আপনি যখন নিজের থেকেও বেশি গুরুত্ব অন্য কাউকে দেবেন, তখনই আপনি নিজেকে কম ভালো বাসবেন, এই তার থেকে শুরু হবে নিজের প্রতি উদাসীনতা। এসব ভুলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজেকে দেখুন অনেকক্ষণ ধরে। দেখবেন, আপনার চোখদুটো অপরিসীম গভীর, কত অব্যক্ত কথা লুকিয়ে রাখতে রাখতে ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। চোখের কোনের মিষ্টি হাসিটা ক্লান্ত হয়ে উধাও হয়ে গেছে। পারলে ওগুলোকে ফিরিয়ে আনুন।

দিগন্তর এখুনি পাতানো পিসিমণি সব কথা না বুঝেই বললো, তুমি বড্ড ভালো ছেলে গো।

দেবলীনাও নিজের গাম্ভীর্য ভেঙে ফিসফিস করে বললো, ওনার পুচুমনাও তাই বলে।

দিগন্ত মানুষটা যে অসভ্য গোছের নয় সেটা এই একঘন্টাতেই টের পেয়েছে দেবলীনা। তবে বড্ড টকেটিভ। ওর ক্লাস সিক্স, সেভেনের স্টুডেন্টদের মত। কথা আর তাদের শেষ হয় না। তবে গ্রীষ্মের ছুটি কিংবা পুজোর ছুটিতে দেবলীনা বেশ বুঝতে পারে, ওই বকবকম আওয়াজটা ওর জীবনী শক্তি। তাই ছুটিগুলোতে ভীষণ মিস করে ওদের।

ভদ্রমহিলা একমুখ হেসে বললেন, এই বুঝি তোমার স্ত্রী? বাহ, দুটিকে বেশ মানিয়েছে।

দেবলীনার ঠোঁটে অপ্রস্তুত চাউনি। বলতেই যাচ্ছিল, না উনি আমার কেউ হন না, শুধুই সহযাত্রী।

কিন্তু দেবলীনা কিছু বলার আগেই সর্ববিজ্ঞ দিগন্ত বলে উঠলো, আরে না না, পিসিমণি কি যে বলেন, আরে উনি আমার কেউ হন না। এই তো একঘন্টা আগে আমরা একতরফা বন্ধু হলাম মাত্র। তারপর লজ্জা লজ্জা ভাবে হেসে বললো, আসলে আমার মাও বলে, আমার চেহারাটাই এমন, সবাইকেই আমার পাশে মানিয়ে যায়। এমনকি ক্যাটরিনা কাইফকেও নাকি মানিয়ে যাবে। আমি আমার মায়ের মত দেখতে হয়েছি বুঝলেন কিনা।

দিগন্তর দুমিনিট আগে হওয়া পিসিমনি জিভ কেটে বললেন, ওহ সরি মেয়ে, কিছু মনে করো না।

তবে এই একতরফা বন্ধুত্ব বলতে কি বোঝাচ্ছ, বুঝলাম না তো?

দিগন্ত হেসে বললো, আমি ওনাকে বন্ধু ভাবছি, কিন্তু উনি ভাবছেন না, তাই আর কি! তাতে অবশ্য আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমি একতরফা বন্ধুত্বেও কম্ফোর্টেবল।

দেবলীনা দাঁত চেপে বললো, আপনার একশো আঠাশ জিবির পেনড্রাইভ কি সারারাত একই মোশনে চলবে?

দিগন্ত জিভ কেটে বললো, সরি সরি। নিন আপনারা শুয়ে পড়ুন। আমার পুচু সোনা আবার রাত জাগলে খুব বকবে।

দেবলীনার এবারে হাসিই পেয়ে গেল দিগন্তর কথায়। বেশ মজারু টাইপ লোক। এর জীবনে আর যাইহোক

কোনো সমস্যা নেই। বিন্দাস লাইফ কাটায়। এমন মানুষরা আশেপাশে থাকলে বাঁচার ইচ্ছেটাই যেন বেড়ে যায়। একটা অদ্ভুত পজেটিভ এনার্জি পাওয়া যায় এদের থেকে।

দিগন্তর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে একটা থ্যাংক ইউ বললো, দেবলীনা।

দিগন্ত বললো, হঠাৎ থ্যাংক ইউ কেন? আমি বদমাশ টাইপ লোক নয়, বুঝে গেলেন?

দেবলীনা একটু গম্ভীর ভাবে বললো, না, বিছানা করে দেওয়ার জন্য।

দিগন্ত ফিসফিস করে বললো, হোস্টেলে থাকা ছেলে মশাই, আপনা হাত জগন্নাথ। আপনাদের মত আদুরে নয়। বাড়িতে গেলেই বাবা, মা পায়ে ফোস্কা পড়েছে কিনা অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে দেখতে চলে আসবে। খেটে খাওয়া ইঞ্জিনিয়ার, বুঝলেন।

দেবলীনা বললো, একটু বেশিই বুঝলাম, পাহাড়ে যদি পায়ে ফোস্কা পড়ে বলে বাবা ব্যান্ডেড ভরে দিয়েছে একটা বক্সে। ভেবেছিলাম ডক্টরস শু পরে যাচ্ছি, ফোস্কার কোনো প্রশ্নই নেই। তাই ব্যান্ডেড কোনো কাজেই লাগবে না। এখন দেখছি অবশ্যই লাগবে, বুঝলেন?

দিগন্ত অবাক হয়ে বলল, ওমা, কোথায় কাটলো? ওয়াশরুমের দরজায় নয় তো? তাহলে কিন্তু নেমেই টিটেনাস? কই দেখি? আমার কাছে স্পিরিট আছে, লাগবে? ওয়াশ করে নিতে পারেন।

দেবলীনা মুচকি হেসে বললো, কাটেনি, সেলটেপের বদলে ব্যবহার করবো ব্যান্ডেডটা। একজনের অনর্গল কথা

বন্ধ করার জন্য তার মুখে আটকে দেব।

দিগন্ত বেশ তটস্থ হয়ে বলল, সরি দিদিমণি। বড্ড কথা বলছি না? যদি আমার বেবি সোনা জানতে পারে, আমি একজন তার থেকেও সুন্দরী মেয়ের সাথে রাত সাড়ে এগারোটায় গল্প করছি, তাহলে আমার ব্রেকআপ নিশ্চিত বুঝলেন?

গুড নাইট ম্যাডাম। কথাটা বলেই দিগন্ত লাফিয়ে উঠে পড়ল মিডিলে। দিগন্তর পাতানো পিসিমণির ছেলে এসে একবার মায়ের খবর নিয়ে গিয়েছিল। এখন ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

দেবলীনাও চেষ্টা করছে ঘুমাবার কিন্তু ওই যে স্মৃতি কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। বারবার দৃষ্টি পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সৃজনের সাথে কাটানো সময়গুলো।

কি ছিল ওগুলো ভালোবাসা না মোহ? মোহ নয়, তিনবছর পর্যন্ত মোহের মেয়াদ হতে পারে না। ওটাও ভালোবাসাই ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে মনের বদল হয়েছে, পাল্টে গেছে ওরা। ওদের ভালোলাগা, খারাপলাগা গুলোর মধ্যে বড্ড বেশিই ফারাক হয়ে গেছে হয়তো। তাই কি, নাকি দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে মনের অলিন্দে! তাই ভালোবাসা নামক অনুভূতির সূক্ষ্ম তারে টান পড়তে পড়তে, ঘষা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে গেল। ক্ষয় হতে হতে অবশিষ্টটুকুও শেষ হয়ে গেল। কেন এতটা বদলে গেল সৃজন। হতেই পারে দুজনের রুচির ফারাক আছে, কিন্তু তাই বলে কি একসাথে থাকা যেত না? হতো

না হয় ঠোকাঠুকি, ঝগড়া ঝাঁটি, তবুও বেঁচে থাকতো সম্পর্কটা।

চোখ বন্ধ করে এলোমেলো ভেবেই যাচ্ছিল দেবলীনা।

ওদিকের ভদ্রমহিলার ঘন নিঃশ্বাসের আওয়াজ জানান দিচ্ছে নিশ্চিন্ত ঘুমের সুখ। দিগন্তও বোধহয় ঘুমিয়ে গেছে, শুধু জেগে আছে ও একা।

হঠাৎই দেখলো, দিগন্তর মোবাইলটা জ্বলে উঠলো। অন্ধকার কামরা বলেই অপজিট দিক থেকে চোখে আলোটা এসে পড়ল দেবলীনার। একটু সচেতন হয়েই তাকালো দিগন্তর মোবাইলের দিকে। গোটা স্ক্রিন জুড়ে একটা হলদে ওড়নার লুটপুটি। একটা মিষ্টি মেয়ের ছবি।

দিগন্ত ছবির দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে ফিসফিস করে বললো, গুড নাইট সোনা।

মুচকি হেসে ফেলল দেবলীনা। ছেলেটা কিন্তু ভীষণ ভালোবাসে ওর বেবি সোনাকে। মাঝরাতেও ছবি দেখে গুড নাইট বলছে। যদিও দেবলীনার এগুলো জাস্ট ন্যাকামি মনে হয়। আচ্ছা, ন্যাকামি কেন মনে হয়?

ও কোনোদিন এত কেয়ারিং মানসিকতা পায়নি বলে, নাকি সৃজনের কাছ থেকে কখনোই এমন গুরুত্ব পায়নি বলেই ন্যাকামি মনে হয় এই অনর্থক আদরগুলোকে।

জোর করে ঘুমের চেষ্টা করলো ও। বাবা, মায়ের সাথে যখন বেড়াতে আসতো তখন তো ও বেশ নিশ্চিন্তেই ঘুমিয়ে পড়তো। মা বরং মজা করে বলতো, তোকে তো যেখানে ফেলবো সেখানেই ঘুমাবি। ট্রেনের এত দুলুনিতেও কি ঘুমটাই না ঘুমালি! কোথায় গেল সেসব নিশ্চিন্তের ঘুম?

কেন ওর চোখ দুটো জ্বালা করছে, ভারী হয়ে আসছে অথচ ঘুম আসছে না! পাশ ফিরে শুয়ে আবারও চেষ্টা করলো সব ভুলে গিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার।

।। ৩।।

পিছন থেকে স্বর্ণালীই ডেকেছিল ওকে। দেবলীনা ইনি তোর সাথে একটু পরিচয় করতে চান। পিছন ঘুরতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে আকস্মিক প্রশ্নটা ছুটে এসেছিল ওর দিকে। মডেলিং করতে চান?

দুটো ভ্রূকে প্রায় ধনুকের অবস্থানে নিয়ে গিয়ে দেবলীনা বলেছিল, মানে?

তখন সদ্য স্কুল জয়েন করেছিল ও। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই ছোটবেলার বান্ধবী স্বর্ণালীকে নিয়ে গিয়েছিল একটা ঝাঁ চকচকে গোল্ড শো রুমে। উদ্দেশ্য একটাই, মায়ের জন্য একটা পেন্ডেন কিনবে। ওর আর বাবার জন্মদিন পালন করা হলেও মায়ের জন্মদিন সেভাবে মা কোনোদিন সেলিব্রেট করতে দেয়নি। বাবা, আর দেবলীনা বার দুয়েক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অস্বস্তিতেই হোক বা দীর্ঘদিনের অনভ্যাসেই হোক, মা ঠিক এনজয় করতে পারেনি। দেবলীনার কানে কানে বলেছিল, শোন না, এসব কেক টেক আনিস না আমার জন্মদিনে। তোর কাকিমারা হাসাহাসি করে। তার থেকে তুই যখন চাকরি পাবি, তখন আমার জন্মদিনে ছোট একটা করে গিফট কিনে দিবি। তাহলে আমারও মনে থাকবে আমি কবে এই পৃথিবীর আলো দেখেছিলাম।

দেবলীনাদের পাশেই ছোটকাকার বাড়ি। সম্পর্ক খারাপ নয়, তবে কাকিমা মাঝে মাঝেই দেবলীনার মেয়ে হওয়া নিয়ে বেশ আফসোস করে মায়ের কাছে। বিয়ে হয়ে চলে গেলে বুড়ো বয়েসে মাকে কে দেখবে নিয়ে বড়ই চিন্তা কাকিমার। দুই পুত্র সন্তানের জননীর অনর্থক গর্ব আর অহংকারের শিকার হয় দেবলীনার ভালোমানুষ মা-টা। দুই ভাইয়ের সাথে অবশ্য ওর সম্পর্ক ভীষণ মিষ্টি। ওরা দিদিভাই বলতে অজ্ঞান। কিন্তু কাকিমার দীর্ঘশ্বাসের ফলে মা মাঝে মাঝেই মনমরা হয়ে বলে, লীনা তো আমার মেয়ে, আমার কোনো সমস্যা নেই ও মেয়ে বলে, কেন যে পাড়ার লোকজনের, বুলটির এত সমস্যা কে জানে? বুলটি তো দিনরাত বলে যায়, মন খারাপ করো না বড়দি, আমার ছেলেরা কি তোমার ছেলে নয়? ওরাই দেখবে তোমায়। বাবা হেসে বলেছিল, কেন, বুলটিকে দেখলেই বুঝি তুমি মনখারাপ করো? মা রেগে গিয়ে বলে, তোমার শুধু সবেতেই রসিকতা। বাবা, বরাবরই প্রাণচঞ্চল মানুষ। মুখে সর্বদা হাসি। সব সমস্যার খুব সাধারণ সমাধান আছে বাবার কাছে। মনখারাপ করছে তো বই পড়, বাগানে গিয়ে ফুলেদের সাথে গল্প কর, এরাই তোর মন ভালো করে দেবে। বাবাকে কখনো কোনো কারণেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখেনি দেবলীনা। মাঝে মাঝে বাবাকে ওর খুব হিংসা হয়। কেন যে ও বাবার মত নিশ্চিন্ত মনে হাসতে পারে না। তবে বাবা ওর রোল মডেল। সর্বদা চেষ্টা করে বাবার মত হতে। হয়তো বিফলে যায় ওর চেষ্টা কিন্তু তবুও বাবা ওর প্রাণশক্তি। চাকরিতে ঢোকার পরেই বাবা

বলেছিল, লীনার কাকিমাকে বলে এস, আমাদের মেয়ে শিক্ষিকা হয়েছে। বাবার গলার স্বরে সেদিন গর্বের সূক্ষ্ম আনাগোনা লক্ষ্য করেছিল লীনা। মায়ের মুখে প্রাপ্তির হাসি।

এ মাসের স্যালারিটা অ্যাকাউন্টে ঢুকতেই দেবলীনা স্থির করেছিল, বাবা আর মায়ের জন্য এক্সক্লুসিভ গিফট কিনবে। বাবার উপহার যে বই হবে, সে নিয়ে দ্বিমত ছিল না ওর। মায়ের গিফট নিয়েই চিন্তা করছিল। স্বর্ণালীই বললো, একটা লেটেস্ট পেন্ডেন দে, আন্টি মুক্তোর হার দিয়ে পরবে, দারুণ লাগবে। আইডিয়াটা বেশ পছন্দ হয়েছিল ওর। তাই দুই বন্ধু এসে পৌঁছেছিল গোল্ড এমপরিয়াম নামের এই ঝাঁ চকচকে শো রুমে।

দেবলীনা ফিসফিস করে বলেছিল, হ্যাঁরে এত বড় দোকানে কেন ঢুকলি? এখানে তো সব জিনিসের দাম বেশি হবে রে!

স্বর্ণালীই ওকে ভরসা দিয়ে বলেছে, হালকা ওজনের থেকে ভারী, সব রকম পাবি। আমরা অফিসের এক কলিগের বিয়েতে গিফট করলাম, এখান থেকেই কিনেছিলাম। কম বাজেটের ভালো জিনিস আছে।

দোকানে ঢুকে সবে পেন্ডেনের দিকে পা বাড়িয়েছে দেবলীনা, সেই সময় এমন অবাস্তব প্রস্তাব নিয়ে হাজির একজন সুদর্শন, অত্যন্ত স্মার্ট পুরুষ। বয়েস আন্দাজ সাতাশ। দেবলীনার থেকে বছর দুয়েকের বড়ই হবে বলে মনে হলো। পায়ের জুতো থেকে মাথার জেল ব্রাশ করা চুল, সবটাই বড্ড নিখুঁত। একনজরে দেবলীনার মনে

হয়েছিল, একটু এলোমেলো হলেই বোধহয় ছেলেটাকে বেশি মানত। বড়লোক বাড়ির সাজানো লনের মত, একটাও শুকনো পাতা পড়ে থাকে না সবুজ ঘাসে। তাই কৃত্রিমতার মাঝে প্রাণের স্পন্দন একটু কম।

দেবলীনা নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিয়ে বললো, আমি একজন কাস্টমার, মডেলিং করার জন্য তো আসি নি। ছেলেটা মুখে গোটা চারেক করুণ রেখা ফুটিয়ে বললো, বুঝলাম আপনি কাস্টমার, কিন্তু মডেলিংয়ে আপত্তি কোথায়? স্বর্ণালী ছেলেটিকে কথা শেষ না করতে দিয়েই বললো, ও একজন টিচার, জবও খুঁজছে না, সো...

ছেলেটি ভীষণ স্মার্টলি দেবলীনার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, সৃজন চৌধুরী। এটা আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস। আমি একেবারেই ইনটারেস্টেড নই বিজনেসে। আমি নাম করা আই টি কোম্পানিতে গুরু দায়িত্বে আছি। কিন্তু আমার দাদুর একটা অদ্ভুত নিয়ম আছে। ফ্যামিলির প্রতিটা ছেলেকে প্রতি বছরে একমাসের জন্য হলেও ফ্যামিলি বিজনেস সামলাতেই হবে। এই মাসটা আমার দায়িত্বে। এটাই বাঙালির বিয়ের মাস। তাই বেশ কিছু ওয়েডিং কালেকশন রেডি করেছে শিল্পীরা। আমি চাই একটা বাঙালি লুকের, সুন্দরী মেয়ে সেগুলো পরে মডেলিং করুন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের সাথে সাথে বিভিন্ন ম্যাগাজিনেও ছাপা হবে তার ছবি। গহনার বিজ্ঞাপনও হলো, আবার বাঙালিয়ানাও হলো।

কি ম্যাডাম, ক্লিয়ার করতে পারলাম আমার আইডিয়াটা?

আমি বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলাম, কিন্তু জাস্ট ফেডআপ হয়ে গেলাম। একটাও চেহারা পেলাম না, যার হাতে কৃষ্ণচূড়া, কব্জিতে মানতাসা, রতনচূড়ের মত সাবেকি গহনা মানাবে। মডেলিং করতে যারা এলো তারা তো সবাই দেখলাম ওয়েস্টার্ন ড্রেসের বিজ্ঞাপন দেবার জন্যই জন্মেছে। যদিও আমার ব্যক্তিগত পছন্দ ওয়েস্টার্ন লুক। কিন্তু এখন তো ষোলআনা বাঙালি লুক চাই আমার। সারাদিনের লড়াইয়ের পর, সন্ধেবেলা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার সময়েই আপনার দিকে চোখ আটকে গেলো। আমার মনের ক্যানভাসে সাবেকি গহনা পরানোর জন্য, যে মডেলের ছবিটা এঁকেছিলাম, আপনি তো হুবহু তাই।

ওই জমিদার বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে, চাবির গোছা পিঠে ফেলে আটপৌরে শাড়িতে এক গা গহনা পরিহিত সেই নারী, যার প্রতিটা পদক্ষেপে আত্মমর্যাদা, অহংকার, ব্যক্তিত্ব সব কিছুর প্রতিফলন। প্রজারা শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে বলছেন, ওই যে আমাদের রানিমা এসে গেছেন।

চূড়ান্ত অস্বস্তিতে, গাঢ় লজ্জায় মাথা নিচু করলো দেবলীনা। রূপের প্রশংসা ও সেই ছোট থেকে পেয়ে আসছে। প্রোপোজও ওর কাছে নতুন নয়। স্কুল কলেজে এক সময় প্রোপোজালের জ্বালায় তিতিবিরক্ত লাগতো।

কিন্তু এমন একজন ব্যক্তিত্ব এভাবে প্রশংসা করতে শুরু করলে, ওর গালে কৃষ্ণচূড়ার রং ধরবে না এমন গ্যারেন্টি কোথায়? সেটা হবে আরও লজ্জার।

তার আগেই কথার স্রোতে নিজের দুর্বল হয়ে যাওয়া মনটাকে সামলে নিয়ে বললো, একটু বোধহয় বেশিই বলছেন মিস্টার চৌধুরী। আপনি চেষ্টা করুন, মডেল ঠিক পেয়ে যাবেন। তাছাড়া বাঙালি বেশিরভাগ মেয়েকেই শাড়ি, গহনা পরলে সুন্দরই লাগে।

দয়া করে এসব বলে আমায় বিব্রত করবেন না প্লিজ।

সৃজন নাছোড়বান্দার মত বললো, কিন্তু ম্যাডাম, আপনাকে পেয়েও হারিয়ে ফেলবো এমন হতভাগা আমি, এটা ভাবতেই তো কষ্ট হচ্ছে। বাড়ি ফিরে দাদুর চোখে তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে বিদ্ধ হবো। ভেতো বাঙালির সুখের চাকরিতে বেশি আনন্দ, ব্যবসার রিস্ক নিতে নাকি ভয় করে। এসব বলে প্রমাণ করে দেবে, আমি একটা ওয়ার্থলেস, গুড ফর নাথিং। অথচ একমাত্র আপনিই পারেন আমার সম্মান বাঁচাতে। অ্যামাউন্ট নিয়ে ভাববেন না, যেটা চাইবেন আমি পে করবো, প্লিজ রাজি হয়ে যান।

দেবলীনা গম্ভীর ভাবে বলেছিল, স্বর্ণালী চল অন্য কোনো শো রুমে গিয়ে মায়ের গয়নাটা কিনে নিই। এনারা বোধহয় কাস্টমারকে একটু বেশিই চিপ ভাবেন।

সৃজন হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিমায় বলেছিলো, সরি, আমি ভীষণ ভাবে দুঃখিত। আপনাকে জোর করা আমার উচিত হয়নি। আপনারা শপিং করুন প্লিজ। এভাবে ফিরে গেলে আমাদের কোম্পানির গুড উইল নষ্ট হবে।

কথাটা শেষ করেই একটু জোরেই বললো, এই বরুণ, ম্যাডামকে এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখাও।

সরি ম্যাডাম, এক্সট্রিমলি সরি, বলেই হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল সৃজন।

ও যেতেই স্বর্ণালী বলতে শুরু করলো, আরে ইয়ার তোর প্রবলেমটা কোথায়? একটা দারুণ এক্সাইটিং ব্যাপার হতো। তুই গোল্ড এমপেরিয়ামের সাবেকি গয়নার মডেল হতিস। আরে পত্রিকায় তোর ছবি থাকতো। এদের শো রুমেও বড় বড় হোর্ডিং-এ থাকতো ছবি, একদিনে সেলিব্রিটি ইয়ার! আর তোকে কে বলেছে রে, যে টিচার মানেই তাকে চশমা এঁটে বোরিং টাইপ হতে হবে?

মনে রাখবি, এটা একটা প্রফেশন। হ্যাঁ বলতে পারিস, নোবেল প্রফেশন। তা তুই স্কুলে তো আর ফিল্ম আর্টিস্টের মত সেজেগুজে ঢুকছিস না। এখানে মডেলিং করতে সমস্যা কোথায়? আর সৃজন চৌধুরী তো বললেন, ওনারা এক মুখ বারবার ব্যবহার করেন না। তারমানে একবারই তোকে করতে হবে। কর না, দেবলীনা, প্লিজ।

দেবলীনা বিরক্ত মুখে বলেছিল, অসম্ভব, ওরকম চড়া মেকআপ করে সং সেজে আমি দাঁড়াতে পারবো না ক্যামেরার সামনে। দেখ, স্বর্ণালী, সবার জন্য সব কিছু নয় রে। আমি ছাপোষা শিক্ষিকা, হয়তো মা, বাবা দেখতে ভালো বলে আমিও সুশ্রী হয়েছি। তারমানে এই নয়, যে একেবারে মডেলিং করতে হবে!

স্বর্ণালী বললো, তুই যেন কেমন একটা। জীবনে মাঝে মাঝে চেনা পথের উল্টো দিকে হেঁটে দেখবি, ওই অপরিচিত পথটাও তোকে অনেক কিছু দেবে বলে অপেক্ষা করছিল। শুধু তোর আসার প্রতীক্ষায় ছিল। তুই

এক পা বাড়িয়ে দেখ, ওই অপরিচিত সম্পূর্ণ অচেনা রাস্তাটাও তোকে দুহাত ভরে দেবে।

মায়ের জন্য একটা খুব সুন্দর লকেট কিনে বিল মেটানোর জন্য ক্যাশ কাউন্টারের দিকে যাচ্ছিল ওরা। তখনই শুনতে পেল সৃজনের গলা। কাউকে একটা ফোনে বলছে, আরে ট্রাই করুন রঘুনাথ বাবু। পারবো না বললে তো চলে না। আমি অফিস কামাই করে আজ সারাটা দিন ওই সব মেয়েদের ইন্টারভিউ নিলাম, আর আপনি বলছেন সঠিক মডেল পাবেন না, ওদের মধ্যে থেকেই সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে? আরে মশাই, কোনোদিন দেখেছেন, কেশর লাগিয়ে ঘোড়াকে সিংহ বানাতে? আপনি তো জানেন, আমি মারাত্মক পারফেকশনিস্ট। হ্যাঁ, কাজ চালানোর মত হয়তো হতো, কিন্তু পারফেক্ট হতো না। আমার কাল দুপুর বারোটার মধ্যে নতুন মডেল চাই। যেমন বললাম, ওরকম। স্মার্ট লুকিং বাট চেহারার মধ্যে যেন একটা আভিজাত্য থাকে, ব্রেন উইথ বিউটি যাকে বলে তেমন।

আরে একজনকে পেয়েছিলাম, হ্যাঁ, কাস্টমার। কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না। আপনি ট্রাই করুন রঘুনাথ বাবু।

দেবলীনা হঠাৎই নিজের বাধ্য মনটাকে অবাধ্য হয়ে যেতে দেখলো নিজের চোখে। কঠিন হাতে শাসন করতে গেল শেষ মুহূর্তেও, তবুও অষ্টাদশীর মতই মনটা চঞ্চল হয়ে ছুটে গেল ওকে অমান্য করেই।

আচমকা ওকে চমকে দিয়েই ওর অবাধ্য মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠে নিয়ম ভাঙার খেলায় মেতে উঠলো যেন। বলে বসলো, আমায় কাল কখন আসতে হবে মিস্টার চৌধুরী?

ভাবছি দাদুর চোখে আপনাকে বেইজ্জত হওয়ার থেকে বাঁচিয়েই দেব এবারের মত।

সৃজন হকচকিয়ে বললো, সত্যি বলছেন? মানে আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? সত্যি আপনি রাজি?

দ্বিধান্বিত মুখে ঘাড় নেড়ে দেবলীনা বলেছিল, রাজি। তবে বাড়ির পারমিশন নিয়ে আপনাকে রাতে কনফার্ম করছি।

নিজের ভিজিটিং কার্ডটা দেবলীনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে সৃজন বলেছিল, ভাগ্যিস আপনারা মেয়ে আর গড আপনাদের মনে বেশ খানিকটা সহানুভূতি দিয়েই গড়েছেন, তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম মনে হচ্ছে। ওর কথা বলার ঢঙে হেসে ফেলেছিলো দেবলীনা। পরক্ষণেই সৃজন ভীষণ সিরিয়াস ভাবে বলেছিল, ম্যাডাম, আপনার নাম, অ্যাড্রেস বলুন প্লিজ, আমি চেকটা লিখবো।

দেবলীনা শান্ত গলায় বলেছিল, কাজটা কমপ্লিট হলে আমি চেক নেব। ধীর পায়ে গোল্ড এমপরিয়াম থেকে বেরিয়ে এসেছিল ও।

বাড়ি ফিরে মায়ের হাতে পেন্ডেন আর বাবাকে বই গিফট দেওয়ার পর ভাবছিলো, কি ভাবে বাড়িতে এই একদিনের মডেল হওয়ার গল্পটা করবে! মধ্যবিত্ত পরিবারের আদর্শে বড় হয়ে ওঠা দেবলীনারও কোথাও

যেন মনে হয়, এই লাইট, ক্যামেরা অ্যাকশন ব্যাপারটা ঠিক ওর জন্য নয়। হলেই বা একদিনের জন্য। পরক্ষণেই স্বর্ণালীর কথাটা মাথায় এসেছিল, একবার অন্তত চেনা পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে হেঁটে দেখ লীনা, সে পথের শেষেও হয়তো এমন কিছু অপেক্ষা করছে তোর জন্য। কাঁপা গলায় বাবাকে বলেছিল, বাবা, এই গোল্ড এমপরিয়ামের মালিক আমায় ওদের মডেল হওয়ার অফার দিয়েছে। সাবেকি গহনা পরে কিছু ছবি তুলতে হবে ওদের কোম্পানির জন্য।

গয়নার বিজ্ঞাপন আর কি।

বাবা একটু ভেবে বলেছিল, একটা সময় পর্যন্ত আমি নিজের শাসনে রেখেছিলাম তোমাকে, তোমার রুচি আমি তৈরি করে দিয়েছি লীনা। আমি বিশ্বাস করি, তুই এমন কিছু করবি না, যাতে আমাদের সম্মানহানি হয়। তাই তুই যদি মনে করিস, কাজটা চ্যালেঞ্জিং, খারাপ কিছু নয়, তাহলে ট্রাই করতেই পারিস। নতুন কিছু মানেই খারাপ, এই ধারণায় আমি বিশ্বাসী নই।

মা বেশ উত্তেজিত ভাবে বলেছিল, হ্যাঁরে লীনা, টিভিতে দেখাবে তোর ছবি?

লীনা ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছিল, হয়তো দেখাবে মা।

পরের দিন স্কুলে হাফ ছুটি নিয়ে পৌঁছেছিল গোল্ড এম্পরিয়ামে।

ওদের নিজস্ব মেকআপ আর্টিস্টরা দেবলীনাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে সাজাতে শুরু করলো। যতবারই ও তাকানোর চেষ্টা করছিল ততবারই মেকআপ আর্টিস্টের

বকুনি শুনে আবার চোখ বন্ধ। মুখে হালকা পাফ, ভ্রূর মাঝে ছোট্ট টিপ, বিয়ে বাড়িতে লাইনার আর রোজকার রুটিনে চোখের নিচে হালকা কাজল, ঠোঁটের ভাঁজে নরম লিপস্টিকের উপস্থিতি ছাড়া আর কিছুই সাজে না ও।

চড়া মেকআপে নিজের মুখমণ্ডলকে বিকৃত করার কোনো সদিচ্ছা ওর কোনোদিনই তৈরি হয়নি। তাই চড়া মেকআপে ওকে জোকার টাইপ সাজাচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে যথেস্ট চিন্তিত হয়ে বসেছিলো ও।

তখনই শুনতে পেল স্বল্প পরিচিত কণ্ঠস্বরটা।

যদিও আমি মেকআপের কিছুই বুঝি না, তবে একটু খেয়াল রেখো, যেন রঙের আড়ালে ওনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট না হয়ে যায়। কাজল কালো চোখ দুটো যেন ভারাক্রান্ত না হয় আইশ্যাডোর রঙিন রঙে। আর মুখের শিরা উপাশিরার নরম অথচ দৃঢ় ভঙ্গিমাটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। চিবুকের ভাঁজের আত্মবিশ্বাস আর অহংকারের মিশেলটা যেন নিখুঁত থাকে, এটুকুই খেয়াল রেখো তোমরা। সৃজন বেরিয়ে যেতে যেতে ফিরে এসে বলেছিলো, আর ঠোঁটের নিচের ছোট্ট তিলটাকে আরেকটু হাইলাইট করে দিও। যেন সে উদ্ধত ভাবে বলতে পারে, আমি সাধারণ হয়েও অনন্যা।

সৃজন চলে যেতেই দুজন মেকআপ আর্টিস্ট ফিসফিস করে বললো, ছোট স্যার তো জীবনে ঢোকে না মেকআপ রুমে, আজ হঠাৎ যে এসব বলে গেলেন!

আরেকজন বললো, শোনো চন্দনদা, স্যার যখন নিজে এসব বলে গেলেন, তখন নিশ্চয়ই কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন ভাবে বললেন, তেমন ভাবেই করো।

চন্দনদা নামক ব্যক্তিটা মুচকি হেসে বললো, স্যার তো আজ ইংরেজি ছেড়ে বাংলায় কথা বলছেন, এটা ফলো করেছো।

একজন বললো, ম্যাডাম, আপনি কি স্যারের বিশেষ পরিচিতা?

চোখ বন্ধ অবস্থায় দেবলীনা ঘাড় নেড়ে বললো, না, আমি আপনাদের স্যারকে চিনি না।

দেবলীনা তখনও ভাসছিল সৃজনের বলা কথাগুলোর মৃদু স্রোতে তুমুল ঢেউ নয়, স্নিগ্ধ ধীর গতিতে বওয়া ঢেউ, তবুও তার ক্ষমতা প্রবল। দেবলীনার মত চূড়ান্ত প্র্যাকটিক্যাল মেয়েকেও মুহূর্তের জন্য দুকূল প্লাবিত করে ভাসমান অবস্থায় নিয়ে চলে গিয়েছিলো জনমানবহীন কোনো একটা দ্বীপে। যেখানে কেউ নেই, শুধুই ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ধ্বনিত হচ্ছে। কে সৃজন? কেন একটা অর্ধপরিচিত ছেলের ডাকে ও আটপৌরে ঢঙে বেনারসী আর সাবেকি গয়না পরে জমিদার গিন্নী সাজতে রাজি হলো? শুধুই সৃজনের অনুরোধ? স্বর্ণালীর বায়না? নাকি মনের কোণে অন্য কোনো অশান্ত বসন্ত বাতাসের আনাগোনায় চঞ্চল হয়েছে দেবলীনার মনটা। জোর করে মন থেকে সৃজনের বলা কথাগুলোকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল ও। ঠিক সেই মুহূর্তেই মেকআপ আর্টিস্ট ওর থুতনির একটু ওপরের তিলটাকে আরেকটু গাঢ় করার চেষ্টায় মগ্ন হয়ে গেল। কে জানে কেন লালচে আদুরে লজ্জাটা এসে দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল ওকে।

ওর শাসনের দৃষ্টিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই কেউ যেন ফিসফিস করে বললো, কখনো জানতে, তোমার ঐ ছোট্ট তিলটারও একটা উদ্ধত ভঙ্গিমা আছে!

নিজের দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়াতেই চন্দনদা বললো, নিন ম্যাডাম, আমাদের কাজ কমপ্লিট। এবারে আপনি ফ্লোরে যান।

বিশাল আয়নার সামনে আগুন লাল বেনারসীতে নিজেকে দেখে একটু চমকেই গেল দেবলীনা।

গলায় গিনীর লম্বা হার, বাজুবন্দে কৃষ্ণচূড়া, হাতে রতনচূড়, মানতাসা, কোমরে কোমর বন্ধনী, নাকে বড় একটা নথ। বেনারসীর খুঁটে বাঁধা চাবির গোছায় নিজেকে নিজেই চিনতে পারছিল না দেবলীনা।

অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল আয়নার দিকে।

অন্যমনস্ক হয়ে দেখেছিলো নিজেকে। তখনই কেউ একজন ডাকলো, ম্যাডাম, প্লিজ ফ্লোরে আসুন।

ফ্লোরে ঢুকে আরেক চমক। একটা পুরোনো বাড়ির সেট, পুরোনো পুজো মণ্ডপের সেট রেডি।

ফটোগ্রাফার বুঝিয়ে দিচ্ছিল, দেবলীনাকে কি কি করতে হবে। আনমনে বসে থাকতে হবে ওই সিঁড়িতে। কখনও ওই সিঁড়ি দিয়ে দর্পিত পায়ে নামতে হবে ....কেমন যেন নার্ভাস লাগছিলো ওর। দুচোখ খুঁজছিল সৃজনকে।

কিন্তু সৃজন কোথাও নেই।

সিঁড়িতে নামতে গিয়ে আরেকটু হলেই হোঁচট খাচ্ছিল দেবলীনা। ঠিক তখনই সিঁড়ির পাশের নকল দেওয়ালের

পর্দার আড়াল থেকে একটা বলিষ্ঠ হাত এসে ওকে ধরে নিয়েছিল। নরম গলায় বলেছিল, সাবধানে।

আমি পাশেই আছি। কোনো ভয় নেই। ফ্রি ভাবে হাঁটুন।

লজ্জিত দেবলীনা বলেছিল, সরি।

সৃজন বেশ চেঁচিয়ে বলেছিল, এই সময় একটা শট নাও তো। চোখে লেগে থাকুক লজ্জার একটু রেশ।

সৃজনের কথাটা শোনার পর এক মুঠো আবীর এসে ছড়িয়ে পড়েছিল দেবলীনার গালে।

মুচকি হেসে সরে গিয়েছিল সৃজন। ছবির পর ছবি তুলে তুলে ও যখন প্রায় ক্লান্ত তখন সৃজন এসে বলছিলো, এবার ছাড়ো ওকে।

চলুন ম্যাডাম চেঞ্জ করে নেবেন। তারপর ডিনার করে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব আমি নিজে।

দেবলীনা মৃদুভাবে প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছিল ওনার অফারটা কিন্তু ঘড়ির দিকে চোখ গেল, প্রায় নটা বেজে গেছে। যদি এসময় ট্যাক্সি না পায়, তাহলে মা চিন্তা করবে।

চেঞ্জ করে আসতেই সৃজন একটা খাম দিয়ে বললো, ম্যাডাম, সাবধানে রাখুন এটা ব্যাগে, দিয়ে তাড়াতাড়ি চলুন, আপনার বাড়িতে হয়তো টেনশন করবে। ডিনার সেরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দেবলীনা শান্ত গলায় বলল, আমি সোজা বাড়ি যাবো মিস্টার চৌধুরী, ডিনার করা সম্ভব নয়।

সৃজন একটু থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমাকে কি সুযোগ সন্ধানী ছোকরা মনে হয় আপনার? তাই আমার সাথে ডিনারে যেতে চাইছেন না? আসলে কি বলুন তো, আমাদের ফ্যামিলি বিজনেসের একটা গুড উইল আছে। এখন যদি একজন গেস্টকে অতিথিয়েতা না করেই গোল্ড এমপরিয়াম থেকে ফিরিয়ে দিই, তাহলে আমার দাদু হয়তো চৌধুরী ম্যানশন থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবেন। সে এই শহরে আমার নিজের উপার্জনে কেনা দুটো ফ্ল্যাট আছে, রাস্তায় হয়তো থাকতে হবে না। তবে পরিবারের বদনাম করে গৃহছাড়া হলে সম্মান বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বিশেষ করে কাল থেকে আমি আবার আমার নিজের কমফোর্ট জোন চাকরিতে ফেরত যাবো। তাই শেষ মুহূর্তে আর বদনামের ভাগীদার হতে চাইছি না আর কি! তবে যদি আপনি আমায় নেহাতই সুযোগসন্ধানী কলেজ পালানো ছেলের দলে ফেলেন, তাহলে একটাই কথা বলতে পারি, না ম্যাডাম, আপনি একটু ভুল করছেন, আমার নিজের ওপরে এনাফ কন্ট্রোল আছে। আরে আপনাকে দেখেই আমার লাভ অ্যাট ফার্স সাইট হয়েছিল। গত রাতটা না ঘুমিয়ে কফি খেয়ে কাটিয়েছি। সেই স্কুলের ছেলেদের প্রেমে পড়ার মত অভিজ্ঞতা নিয়ে দিন কাটালাম। তারপরেও আমি কিন্তু আপনাকে প্রোপোজ করবো না। নিশ্চিন্তে থাকুন আপনি, না পাবেন কোনো ফোন কল, না কোনো মেসেজ। আমার ভাললেগেছে মানেই আমি বিরক্ত করতে শুরু করবো এমন কিন্তু নয়। বাগানে একটা সুন্দর ফুল দেখলাম মানেই তাকে তুলতে

ছুটবো, এমন কিন্তু নয়। তাই আপনি নিশ্চিত হয়ে টাইম স্পেন্ড করতেই পারেন আমার সাথে। আমার কলিগ থেকে বন্ধুবান্ধবরা বলে, আমি নাকি দুর্দান্ত টাইম পাশ হতেই পারি।

হ্যাঁ, আমি জীবনদর্শন নিয়ে তেমন সিরিয়াস টাইপ নই এই আর কি। বাদ বাকি আমি পারফেক্ট জেন্টেলম্যান।

দেবলীনা এমন সম্মুখ প্রশংসা শুনতে তেমন অভ্যস্ত নয়, বিশেষ করে এতটা পরিষ্কার ভাষায়। ওর ধারণা ছিল, ভালোলাগা, ভালোবাসার কথাগুলো একটু আধটু গোপনে রাখলেই তার মাধুর্য থাকে। কিন্তু সৃজন বড্ড ওপেনলি সব বলে, এতটা ডাইজেস্ট করা সত্যিই কষ্টকর। নিজের প্রশংসাও এভাবে শুনতে অভ্যস্ত নয় দেবলীনা। তাই অস্বস্তি নিয়েই বললো, আমি একবারও আপনাকে সুযোগসন্ধানী টাইপ ভাবিনি কিন্তু, ইনফ্যাক্ট কারণ ছাড়া আপনাকে খারাপ ভাবতেই বা যাবো কেন?

সৃজন নিজের শার্টের বটনটা অকারণেই একবার ঠিক করে নিয়ে আচমকা বলে বসলো, চলুন আপনাকে বাড়িতে ড্রপ করে দিয়ে আসি। আগে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করি, তারপর না হয় বুক করবো ডিনার টেবিল।

দেবলীনা বলতেই যাচ্ছিল, চলুন খেয়েই ফিরবো কিন্তু তার আগেই গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দিয়ে ও বললো, আপনি বরং পিছনে বসুন, পাশে বসলে হয়তো আমি দুর্বল হয়ে পড়তে পারি। নিজের ওপরে কন্ট্রোল আছে জানি, তবে আপনার ক্ষেত্রে সেটাকে পরীক্ষা করতে সাহস পাচ্ছি না।

দেবলীনার খুব ইচ্ছে করছিল বলতে, না আমি আপনার পাশের সিটেই বসব, আর ডিনার করেই ফিরবো বাড়ি। কিন্তু সৃজনের হঠাৎ বদলে কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল দেবলীনা। লজ্জা আর মানুষকে অবিশ্বাস করার অপরাধবোধ নিয়েই গাড়ির পিছনের সিটে বসলো ও।

গাড়ি স্টার্ট করেই সৃজন জিজ্ঞেস করলো, মিউজিক? আপনি মিউজিক শোনেন ম্যাডাম?

দেবলীনা বিরক্ত হয়ে বলল, আমায় ম্যাডাম না বলে দেবলীনা বললে খুশি হবো।

সৃজন ততোধিক গম্ভীর স্বরে বললো, আমি আবার নাম ধরে ডাকলেই তুমি বলে ফেলি, বড্ড বদভ্যাস। তার থেকে বরং ম্যাডামই ঠিক আছে। আপনার কাছে গোটা গোল্ড এমপরিয়াম কৃতজ্ঞ, আপনাকে সঠিক সম্মান দেওয়াটা আমার কর্তব্য ম্যাডাম। অকারণে বন্ধুত্ব করার আব্দার করে আপনাকে যদি একটুও অসম্মানিত করে থাকি তাহলে আমি দুঃখিত।

দেবলীনা ছটফট করে উঠেছিলো। লজ্জায় অধোঃবদন হয়ে বলেছিল, এভাবে লজ্জা দেবেন না প্লিজ। আমি অত্যন্ত সাধারণ একটা মেয়ে। নেহাতই মধ্যবিত্ত মেন্টালিটিতে বড় হওয়া, তাই রাত্রি নটার পরে সদ্য পরিচিত কারোর সাথে রেস্টুরেন্টে যাওয়া, ডিনার করার কথা ভাবতেই পারিনা। এটা আমার সমস্যা, এতে আপনার তো কোনো দোষ নেই! তাই বারবার ক্ষমা চেয়ে আমায় ছোট করবেন না।

দেবলীনা তো কোনোদিনই অস্বীকার করেনি যে ও মিডিলক্লাস মেন্টালিটির মেয়ে, তাহলে আজ প্রায় তিনবছর পরে কেন সৃজনের ওকে নিয়ে এত প্রবলেম হচ্ছে! নাকি রাকার উদার মানসিকতার সান্নিধ্যে এসেই দেবলীনা সম্পর্কে ওর দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে!

নিজের অফিসের কিউবে বসে একমনে বাইরের কৃত্রিম সবুজের দিকে তাকিয়ে আছে সৃজন। ওদের অফিসের লনের সবুজটাকে সৃজনের সাজানো মেকি মনে হয়। ঘন জঙ্গলের মত বন্য গন্ধ নেই এতে, যেন মনে হয় কৃত্রিমতার নিখুঁত আড়ালে ঢেকে যায় সবুজের স্বাভাবিক সরলতা।

নিজের মনেই হেসে উঠলো সৃজন। মানুষের মন বড় অদ্ভুত। দেবলীনার সরলতা, ঘরোয়া ব্যাপারটাই একদিন আকর্ষণ করেছিল ওকে। আর এখন ওদের ব্রেকআপ হলো ঠিক ওই কারণেই। ওয়েস্টার্ন ড্রেসে সাবলীল নয়, ডান্স, ওয়াইন, পার্টিতে স্বাচ্ছন্দ্য নয় বলেই ধীরে ধীরে সৃজনের মনে বিরক্তি উৎপাদন করছিল দেবলীনা। একই খাতে বয়ে যাওয়া শান্ত একটা নদী যেন। কোনো বাঁক নেই, সৌন্দর্য আছে অপার কিন্তু উষ্ণতা নেই। দেবলীনার রূপটা বড্ড স্নিগ্ধ, পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়ার ক্ষমতা নেই ওর। আগে ওই নরম শান্ত স্নিগ্ধ নদীর ধারে দুদণ্ড বসতে বড্ড ভালো লাগতো সৃজনের। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করছে সৃজন, দেবলীনাও যেন ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে ওর আব্দার মানতে মানতে। যেদিনই ডিস্কো যাবো বলে বায়না করেছে সৃজন, সেদিনই

কোনো না কোনো বাহানায় ও পাশ কাটিয়ে দিচ্ছে। এমনকি সৃজনের পছন্দের ওয়েস্টার্ন ড্রেস না পরে পরপর দুদিন পার্টিতে গিয়েছিল, ইন্ডিয়ান ড্রেস পরে। নজর এড়ায়নি ওর। দেবলীনার অবশ্য স্পষ্ট উত্তর ছিল, নিজেকে বদলাতে পারবো না সৃজন। এতদিন পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করলাম তোমার মনের মত হয়ে ওঠার। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেছি জানো, সেই দেবলীনাটা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আসলে কি জানো সৃজন, আমি ঐ দেবলীনাটাকে বড্ড ভালোবাসি। কোনো কিছুর বিনিময়েই ওকে হারিয়ে ফেলতে পারবো না। সেই জন্ম থেকে তেইশ-চব্বিশ বছর পর্যন্ত ওই দেবলীনাটাইকেই একটু একটু করে গড়ে তুলেছিলাম নিজের মধ্যে। ইদানিং তোমার পছন্দের লীনা হতে গিয়ে রীতিমত আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হয়ে যাচ্ছে আমার। তাই ওই পুরোনো আমিটাকেই ফিরিয়ে আনলাম, প্লিজ আমাকে যখন ভালোবাসো বলে দাবি করছো, তখন গোটা আমিটাকেই বাসো। তোমার তৈরি কৃত্রিম আমিটাকে এবারে বিদায় দেব আমি।

সৃজন বুঝেছিলো, দেবলীনা ওর পছন্দের সাথে পাল্লা দিতে দিতে ক্লান্ত। তাই সরে এসেছিল সম্পর্ক থেকে। সৃজন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, একটা সম্পর্কে সব সময় কৌতূহল, আগ্রহ থাকা খুব জরুরী, কিন্তু ইদানিং কেন যে দেবলীনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে যাচ্ছিল সেটা ও নিজেও জানে না। তবে বারবার মনে হচ্ছিল, যদি জোর করে এই সম্পর্কটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে এর মাধুর্য

হারিয়ে দাঁত নখ বের করে দুজনে দুজনকে দোষারোপ করবে সারাজীবন।

তবে দেবলীনাকে ভোলা বোধহয় কোনোদিনই সম্ভব নয় সৃজনের পক্ষে। মেয়েটার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আছে। স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় একটা ব্যক্তিত্ব।

সৃজন জানে ও দেবলীনাকে এখনো ভালোবাসে। হয়তো রাকাকে ও বেশি পছন্দ করে। রাকার সাথে ওর পছন্দের বড্ড মিল। দেবলীনা সৃজনের পছন্দের ঠিক যেগুলো করতে গিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়তো, রাকার আবার সেগুলোই পছন্দের। তাই রাকাকে কোনোদিন বলতে হয় না, চলো লং ড্রাইভে যাবো। কিন্তু দেবলীনার ছিল হাজার বাহানা, বাবা বকবে, ফিরতে কত দেরি হবে? কাছে-পিঠে গেলে হয় না? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে লং ড্রাইভের এক্সাইটমেন্ট হারিয়ে ফেলত সৃজন। আর রাকা গাড়িতে উঠেই আদুরে গলায় বলে, সৃজন চলো না লং ড্রাইভে যাই, পিছনে পড়ে থাকুক শহুরে আভিজাত্যের ঘেরা টোপ। সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ঝেড়ে ফেলে চলো, নিরুদ্দেশের পথে। রাকার অফুরন্ত এনার্জিই ইদানিং সৃজনকে নতুন করে উষ্ণতা দিচ্ছে। দামাল খরস্রোতা ঝর্ণার পাল্লায় পড়ে, প্রায় স্রোতহীন নদীও এখন তরতর করে বইছে। দেবলীনার সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে কেমন যেন একঘেয়ে ডাল ভাতের মত হয়ে যাচ্ছিল জীবনটা। রাকা এসে বুনো গন্ধে ভরা মহুয়া অথবা তীব্র হুইস্কির ঝাঁঝে পুড়িয়ে দিচ্ছে ওকে। ও প্রাণভরে ওই আগুনে নিজেকে ঝলসে নিচ্ছে। না, দেবলীনা কিছুতেই ওর

জীবনসঙ্গী হতে পারেনা। এই কথাটা ভালোভাবে রিয়ালাইজড করার পরে সৃজনের মনে হয়েছিল, কি ভাবে ফেস করবে দেবলীনাকে! হয়তো ব্রেকআপের দুঃখে কাঁদবে মেয়েটা, হয়তো খুব কষ্ট পাবে! কিন্তু ওর ধারণাকে সম্পূর্ণ মিথ্যে করে দিয়ে, দেবলীনা পরিষ্কার বললো, হ্যাঁ সৃজন আমারও মনে হয়েছে, আমাদের সম্পর্কটা বড্ড বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দুজনের কাছে। তোমার মত আমিও মুক্তি চাই এই বন্ধন থেকে।

অনেক চেষ্টা করেছিল সৃজন দেবলীনার চোখে এক টুকরো কষ্ট দেখতে, কিন্তু দেখতে পায়নি। পরিষ্কার আবেগহীন গলাতেই দেবলীনা মেনে নিয়েছিল ওদের ব্রেকআপটা। বারবার নিজেকে প্রশ্ন করেছে সৃজন, দেবলীনার চোখে নিজেকে হারানোর কষ্ট দেখলে কি ও একটু শান্তি পেতো, একটু তৃপ্তি পেতো কি, যদি দেবলীনা বলতো, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না সৃজন! ওর অন্তরাত্মা উত্তর দিয়েছে, দেবলীনার ওই ভাবলেশহীন দৃষ্টিটাই কিছুতেই ভুলতে দিচ্ছে না লীনাকে।

দেবলীনা বুঝিয়ে দিলো, সৃজন চলে যাওয়ায় ওর বিশেষ কিছু ক্ষতি হলো না। একটা চিনচিনে অপমানবোধ বারবার আঘাত করছে ওর পুরুষত্বকে।

দেবলীনার চোখের গভীর দৃষ্টি, ওর পলকবিহীন তাকিয়ে থাকার মুহূর্তগুলো বড্ড প্রিয় ছিল সৃজনের।

যেদিন মডেলিংয়ের পর ওকে বাড়ি পৌঁছাতে যাচ্ছিল, সেদিনই প্রেমে পড়েছিলো ওর কাজল কালো চোখের।

কত কথা যেন বলতে চাইছিলো ওই চোখদুটো, কিন্তু গোলাপি ঠোঁটের নিষেধ মেনে কিছুই বলছিলো না আর।

সৃজন ড্রাইভ করতে করতে বারবার মিররে দেখছিল ওর মুখটা। বুকের মধ্যে সেই প্রথম অমন একটা অদ্ভুত অনুভূতির আনাগোনা হয়েছিল ওর।

স্কুল, কলেজেও দু একজনকে ভাললেগেছিলো ওর। কিন্তু চূড়ান্ত প্র্যাকটিক্যাল সৃজন ছোট থেকেই বুঝেছিলো, স্কুল, কলেজের পছন্দ হওয়া মেয়েগুলোর সাথে ওর ফ্যামিলি স্ট্যান্ডার্ডের অনেক ফারাক। তাই এরা ওর ক্লাসমেট হতে পারে, বন্ধুও হতে পারে কিন্তু লাভার নয়। একমাত্র দেবলীনাকে দেখেই ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, স্ট্যাটাস এসব যুক্তি মুহূর্তে ভেসে গিয়েছিল।

যখন এক গা গহনা পরে, আটপৌরে শাড়ি পরে দেবলীনা নামছিল সিঁড়ি দিয়ে, তখন সৃজন কবিগুরুর একটা কবিতার লাইনের অর্থ বুঝেছিলো।

সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।

লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইটের অর্থ পরিষ্কার হয়েছিল এই বয়েসে এসে। অচেনা সব অনুভূতির ভিড়ে দেবলীনার উদাসীন চাউনি ওকে আরো বেশি এলোমেলো করে দিয়েছিল। মেয়েটা কিছুতেই রাজি হয়নি ওর সাথে ডিনার করতে যেতে। চোখে কেমন যেন অবিশ্বাসীর দৃষ্টি ছিল। শেষে সৃজনের খারাপ লাগবে বলে যখন নিমরাজি হয়ে বলেছিল, বেশ চলুন, ডিনার করেই ফিরবো তখন সৃজনের মনে হয়েছিল, ওর ক্লিন সেভ গালে কেউ একটা থাপ্পড়

মেরে দিলো। বাধ্য হয়ে ওর সাথে যেতে রাজি হয়েছে দেখেই ওর কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। তাই বলেছিল, না আজ থাক।

মনের মধ্যে দোটানা চলছিল ওর, মেয়েটা কি এনগেজড! এই প্রশ্নটাই বারবার এসে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু সৃজন এটাও বুঝতে পারছিল, প্রশ্নটা করা সভ্যতা নয়। যদি সাহস করে প্রশ্নটা করেও বসে, আর তারপর শোনে দেবলীনা এনগেজড, তাহলে ওর হৃৎপিণ্ডটা বোধহয় থমকে যাবে এই মুহূর্তে, তার থেকে বরং এমন উড়ো হাওয়ায় ভাসুক ওর ভালোবাসার প্রথম উপলব্ধিগুলো। এসব ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিছুতেই দেবলীনাকে জিজ্ঞেস করবে না, ও এনগেজড কিনা।

এলোমেলো দোলাচলে দোলা মন নিয়েই একমনে ড্রাইভ করার চেষ্টা করছিল ও।

তখনই কথা বলেছিল দেবলীনা। আচমকা বলেছিলো, আচ্ছা মিস্টার চৌধুরী, একটা কথা বলবেন, আপনাদের কোম্পানিতে যারাই মডেলিংয়ের জন্য আসে তাদেরকেই ভালোলাগে আপনার?

সৃজন বুঝেছিলো, দেবলীনা দ্বন্দ্বে ভুগছে, ওকে রীতিমত ফ্লার্ট করা ছেলে ভাবছে হয়তো। তাই বাধ্য হয়েই মুখ খুলেছিল। না ম্যাডাম, লাগে না। আর আপনাকে এভাবে হুট করে ভালো লেগে যাওয়ার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। প্লিজ ফর গিভ মি। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনোরকম প্রপোজাল আপনি পাবেন না আমার কাছ থেকে। না কোনো বিরক্তি

উৎপাদন করা মেসেজ ঢুকবে আপনার মুঠোফোনে। এই ভালোলাগাটুকুকে নিজের মধ্যে গোপন রেখে, না পাওয়ার কষ্টটুকুকে উপভোগ করতে আমার ভালোই লাগবে। অনেকটা কষ্ট কষ্ট সুখের মতই মহা মূল্যবান। উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে হওয়ার সুযোগে হাত বাড়ালেই গোটা দুনিয়াকে মুঠোয় ভরার একটা প্রবণতা সেই ছোট থেকেই। তাই না শুনতে খুব একটা অভ্যস্ত নই আমি। ইনফ্যাক্ট আমি আমার এই সাতাশ- আঠাশটা বসন্ত পেরিয়ে বার দুয়েক না শুনেছি। এক নম্বর-ফ্যামিলি বিজনেসের দায়িত্ব নিইনি বলে আমায় বাড়ির গাড়ি ইউজ করতে দেওয়া হয়নি অফিস যাওয়ার সময়। এখন অবশ্য আমি নিজেই কিনেছি।

দুই নম্বর হলো, ক্লাস ইলেভেনে একজন ম্যাথের টিচারকে আমি আমার বাড়িতে এসে টিউশনি করার অফার করেছিলাম। স্যালারিও অনেক দিতে চেয়েছিল বাবা, কিন্তু স্যার পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, মন্ত্রীর পুত্র হলেও উনি কারোর বাড়ি গিয়ে টিউশন করবেন না।

আর তিননম্বর না টা শুনলাম আপনার কাছ থেকে।

না খুব কম শুনেছি বলেই এগুলো মনে আছে এত বছর পরেও। আপনার ডিনারে যাবো না-টাও মনে থাকবে চিরকাল। সৃজনের দৃঢ় ধারণা ছিল এরপরে হয়তো দেবলীনা বলবে, তাহলে প্লিজ চলুন। ওই লিস্টে আমার নামটা না থাকুক। কিন্তু সৃজনের দৃঢ় বিশ্বাসকে মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিয়ে দেবলীনা বলেছিল, আমি তো ভাবছিলাম, তাহলে যাই আপনার সাথে ডিনার করতে,

কিন্তু এখন আর কোনোভাবেই ব্যতিক্রমী হওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। আজ তবে তিনন্বর "না"টাকেই মনে রাখুন আজীবন।

সৃজনের ডান গালে কেউ যেন আরেকটা সপাটে থাপ্পড় মেরেছিলো। নিজের মনেই গালটাতে হাত বুলিয়ে বলেছিল, কষ্ট কষ্ট সুখ। একটুকরো যন্ত্রণায় অন্যরকম প্রাপ্তি হয়েই থাক দেবলীনার এই প্রত্যাখ্যান।

ভেবেছিল দেবলীনাকে বাড়িতে ড্রপ করে আসার পরে ভুলে যাবে ওকে। এমনিতেই কাজের প্রেশারে উইকেন্ড ছাড়া কিছুই মনে করার সুযোগ থাকে না ওর, সেখানে মুহূর্তের এই ভালোলাগাটুকুকে ভুলতে খুব বেশি সময় লাগবে না সৃজনের।

ছোট্ট করে বলেছিল, বুঝেছি ম্যাডাম। আমার সাথে ডিনারে গেলে হয়তো আপনার ফিঁয়াসে রাগ করতো, আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি বলেও কি তিনি রাগ করবেন?

একটু গম্ভীর স্বরেই দেবলীনা বলেছিল, আমার কোনো ফিঁয়াসে নেই মিস্টার সৃজন। আর যদি থাকতো, তাহলেও তার রাগ-অভিমানের ওপরে আমার দৈনন্দিন জীবন নির্ভর করতো না। স্বল্প পরিচিত মানুষের স্পনসরে ডিনার করতে যাবো, এমন ভাবনাতেই আমার আপত্তি। বন্ধুদের কাছ থেকে তাদের টিফিন কেড়েও খাওয়া যায়, কারণ সেখানে তৈরি হয় একটা অধিকারবোধ।

ওর কথার রেশ ধরেই সৃজন বলেছিল, তারমানে আপনি আমায় বন্ধু ভেবে মডেলিংয়ে রাজি হননি, নেহাতই করুণা করেছেন, তাই তো?

দেবলীনা উত্তর না দিয়ে বললো, বাঁ দিকে গাড়িটা রাখবেন প্লিজ। সামনেই আমার বাড়ি, নেমে যাবো।

সৃজন ভেবেছিল, বাড়িতে ড্রপ করে দিলে হয়তো এক কাপ গরম কফির আতিথেয়তা আর একমুঠো এক্সট্রা সময় পাবে সৃজন, কিন্তু সে আশায় এক বালতি জল ঢেলে দিল দেবলীনা। বাধ্য হয়ে গাড়ি পার্ক করিয়ে নিজের ভিজিটিং কার্ডটা বের করে ওর হাতে ধরিয়ে সৃজন বলেছিল, যদি বন্ধুত্ব চান, তাহলে হাত বাড়িয়েই রাখলাম, শুধু ধরার অপেক্ষা। যদি না চান, পুরোনো কাগজের ভিড়ে ফেলে দেবেন আমার ফোন নম্বর, আজকের তারা জ্বলা সন্ধেটা আমার থাকুক। আপনার ওই সাবেকি সাজের ছবিগুলোর মধ্যে একটা ছবি আমি কিছুতেই গোল্ড এমপরিয়ামকে দেব না, ওটা একান্তভাবেই আমার থাকবে। দেবলীনা কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে বলেছিল, কোন ছবি?

নিজের মোবাইলের বড় স্ক্রিনটা দেখিয়ে বলেছিল, এটা প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারের তোলা নয়, তবে বড্ড আপন।

দেবলীনা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বলেছিল, এটা কখন তুললেন?

যখন সিঁড়ি থেকে পড়ে যেতে যেতে বেঁচে যাবার পরে একটু ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আমি পারবো তো? ওই অভিব্যক্তিটুকুকে নিজের ক্যামেরাবন্দি করতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। তাই পারমিশন ছাড়াই এলোমেলো, একটু ভীতু দেবলীনাকে ক্যামেরাবন্দি করেছিলাম। তখনই ভেবেছিলাম, এই ছবিটা গোল্ড এমপরিয়ামের নয়, চাকুরিজীবিরই থাকুক। এই ছবিটার

জন্য কিন্তু কোনো পারিশ্রমিক দেব না আমি। এটা ভিক্ষা চাইলাম আমি, যদি একান্ত না দেন, তাহলে না হয় ডিলিট করে দেব আপনার সামনেই।

দেবলীনা লজ্জায় ছটফট করে বলেছিল, পারিশ্রমিক লাগবে না, ভিক্ষাও নয়, ওটা থাকুক আপনার কাছে।

আর একমুহূর্ত দাঁড়ালেও যেন ওর দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে, তেমন ভাবেই ছুটে পালিয়েছিল নিজের বাড়ির দিকে।

ওর ওই পালানোর তৎপরতাটুকু অপলক দেখার লোভ ত্যাগ করতে পারেনি সৃজন, নির্নিমেষ তাকিয়ে ছিল ওর চলে যাওয়ার দিকে।

নিজের কাজের চাপে যাকে ভুলে যাওয়া খুব সহজ হবে ভেবেছিল সৃজন, আদৌ সেটা হয়নি। ঐদিনের পর প্রায়ই মনে পড়তো দেবলীনাকে। ওর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ঘেঁটে ফেলেছিলো এই কদিনেই। তবুও ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারেনি সৃজন। খুব আশা করেছিল দেবলীনা একটা অন্তত ফোন করবে। নিজের পারসোনালিটির ওপরে একটা তীব্র অহংকার জন্মেছিল সৃজনের। এতদিন পর্যন্ত যারাই ওর সাথে মিশেছে তারাই ওর ব্যক্তিত্বে আকর্ষিত হয়েছে। কলিগ থেকে বন্ধু বান্ধব সবাইকেই বলতে শুনেছে, সৃজন তুই সবার থেকে একটু আলাদা। শুনতে শুনতেই ধারণা হয়েছিল, ওর ব্যক্তিত্বে অল্প বিস্তর সবাই প্রভাবিত হয়। এই প্রথম নিজের কনফিডেন্স তলানিতে এসে ঠেকেছিলো। দেবলীনার কাছ থেকে না কোনো মেসেজ, না কোনো ফোন পেয়ে বেশ বুঝতে পেরেছিল, ও

ছাড়াও আরও অনেকেই সবার থেকে বেশ কিছুটা আলাদা, যেমন দেবলীনা। ওর সব অঙ্ককে নিমেষে মিথ্যে করে দিলো মেয়েটা।

গোল্ড এমপরিয়ামের নতুন ক্যাডালকে মানতাসা আর রতনচূড়ের বিজ্ঞাপনে দেবীলনার ছবি, এছাড়াও ওদের শো রুমের রিসেপশনেও রয়েছে দেবলীনার বেশ বড় একটা ছবি, মেয়েটার চোখ দুটো যেন তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে সৃজনকে, অথচ ও একান্ত নিরুপায়। সংকোচের বশেই দেবলীনাকে আর কল করতে পারেনি।

সেদিন ছিল গ্রীষ্মের সন্ধে, সারাদিন অফিসের সেন্ট্রাল এসি আর নিজস্ব গাড়ির এসির জন্য গরমটা ঠিক মত অনুভবই করতে হয়না সৃজনকে। তবে আশপাশ থেকে ভেসে আসছিল, উফ, কাল যা দাবদাহ গেল, আজই বা কম কিসে! এখন একটু বৃষ্টি দরকার বুঝলে! সকলের একান্ত কাম্য বৃষ্টি ওইদিন সন্ধেতে আসেনি ঠিকই, তবে সৃজনকে চমকে দিয়ে দেবলীনার কল এসেছিল ওর মুঠোফোনে। গোটা স্ক্রিন জুড়ে দেবলীনার এলো চুল আর লাল টিপের মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, সঙ্গে মুঠোফোন জানান দিচ্ছিল, দেবলীনা কলিং।

কাঁপা হাতেই ফোনটা রিসিভ করেছিল সৃজন। গলার স্বরটাকে শান্ত করেছিল শাসন করে, বুকের মধ্যের ঝড়ের পূর্বাভাস যেন কিছুতেই টের না পায় দেবলীনা, তাই অবাধ্য মনটার রাশ টেনেছিলো কঠোর হাতে।

হ্যালো বলতেই ওপ্রান্তে সুরেলা স্বরে পরিচিত কণ্ঠস্বর বলেছিল, মিস্টার সৃজন চৌধুরী?

হাজার চেষ্টা করেও মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠেছিলো সৃজনের গলাটা। ওর সাড়া পেয়েই একটু থেমে দেবলীনা বলেছিল, কদিন ধরেই ভাবছি আপনাকে কল করবো, কিন্তু হয়ে উঠছিল না।

দেবলীনা ওকে নিয়ে ভেবেছে কথাটা শুনেই নতুন করে বুকের বাম দিকের যন্ত্রণাটা চিনচিন করে উঠেছিলো।

সৃজন হালকা স্বরে বলেছিল, বলেন কি, আমার কথাও আপনি ভেবেছেন? একে কি বলবো, সৌভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্য?

সৌভাগ্য—কারণ আপনি ভেবেছেন, দুর্ভাগ্য—কারণ আমি জানতেও পারিনি আপনার ভাবনাটা।

দেবলীনা অল্প হেসে বললো, নেক্সট সানডে, একবার মিট করা যাবে?

সৃজন দীর্ঘশ্বাসটা গোপন না করেই বলেছিল, আপনার জন্য আমার সব ডে কে আমি সানডে বানিয়ে নেব।

ডোন্ট ওরি ম্যাডাম, এখন বলুন কোথায় হাজির হতে হবে?

দেবলীনা একটু ভেবে বললো, ওটা আপনিই বলুন। আমি পৌঁছে যাবো।

সৃজন টেবিল বুক করার কথা বলতে গিয়েও থমকে গিয়ে বলেছিল, একটা ক্যাফেতে আসুন। আপনার বাড়ির কাছাকাছি, আমি পৌঁছে যাবো।

বেশ, তাহলে নিরিবিলিতে আসুন।

সৃজন মুচকি হেসে বলেছিল, ম্যাডাম, এই তিলোত্তমায় নিরিবিলি কোথায় পাবো?

দেবলীনা অপ্রস্তুত গলায় বলেছিল, আরে না না, ক্যাফেটার নাম হলো "নিরিবিলি"।

সৃজন ভুল শুধরে নিয়ে বলেছিল, আই অ্যাম জাস্ট জোকিং। তাহলে সানডে সন্ধে সাতটা নাগাদ পৌঁছে যাবো।

ফোনটা রাখার পরেই ছোটবেলার মত আঙুল গুণতে শুরু করেছিল। ধৈর্য হারিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল, ধুর, এখনো মাঝে তিনটে দিন।

এর মধ্যে অবশ্য একটু হোমওয়ার্ক করে নিলে মন্দ হয় না। ওর ফ্রেন্ড স্বর্ণালীকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠিয়ে দেওয়াই যায়। তারপর জেনে নেওয়াই যায়, দেবলীনার পছন্দের রং বা আনুষাঙ্গিক। তাহলে নিজেকে প্রেজেন্ট করা যাবে সেই ভাবে।

আর ভাবনাচিন্তা না করেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিয়েছিল স্বর্ণালীকে। আরে ফ্রেন্ড হতে বাধা কোথায়!

।। ৫।।

চুপ করে শুয়ে থাকুন, সহযাত্রী বা বন্ধু ভাবতে দোষ কোথায়?

এই ঢাকাটা ভালো করে জড়িয়ে নিন। সম্ভবত এসিতে ঠাণ্ডা লেগেছে আপনার। ঘড়িতে এখন সবে রাত দুটো, অনেক রাত বাকি। একটু কষ্ট করে উঠুন, এই ওষুধটা খেয়ে নিন। আপনার গায়ে বেশ জ্বর।

দেবলীনা নিজের শুকনো তপ্ত ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে ভেজানোর চেষ্টা করে বললো, কি করে বুঝলেন আমার জ্বর এসেছে?

দিগন্ত ওর নিজস্ব ঢঙে বললো, ভুলভাল বকছিলেন ঘুমের ঘোরে, আর উঁহু, উঁহু আওয়াজ করে আমার ঘুমের বারোটা বাজিয়েছেন। তাই বাধ্য হয়ে আমার সোনা বেবীর কথা না শুনেই আপনার কপালে হাত ঠেকালাম, তখনই মনে হলো, যা গরম একটা সিগারেট ধরানো হয়ে যাবে।

শুনুন, এত বকবক না করে, আর আপনার ওই প্রাক্তন সৃজনকে ঘুমের ঘোরে না ডেকে, আপাতত ওষুধটা খেয়ে নিন। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আপনাকে নামিয়ে নিয়ে যাবো না। আমার পুচু যদি জানতে পারে, আমি আপনার সাথে এত রাতে গল্প করছি, তাহলে নিজের ব্রেকআপ তো নিশ্চিন্ত করেইছেন, আমারটাও অবধারিত হবে। তাই প্লিজ, মেডিসিনের কম্বিনেশনটা দেখে নিয়ে, দয়া করে খেয়ে ফেলুন।

মোবাইলের আলোয় দেবলীনা দেখলো, প্যারাসিটামল ৬০০-এর একটা ট্যাবলেট আর জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ অপরিচিত দিগন্ত নামের ছেলেটা।

মা, বাবা বারবার বলেছিল, ট্রেনে কেউ কিছু দিলে একদম খাবি না। আজকাল যা হচ্ছে!

দেবলীনার তপ্ত শরীর, শুকিয়ে আসা গলা আর ভেঙে যাওয়া মন এত যুক্তি তর্কের তোয়াক্কা না করেই হাতটা বাড়িয়ে দিল দিগন্তর দিকে, ফিসফিস করে বললো, আপনাদের ডিস্টার্ব করার জন্য সরি।

দিগন্ত মুচকি হেসে বললো, আরে ধুর মশাই, আমার পিসিমণির নাক ডাকার চোটে আমি প্রায় জেগেই ছিলাম। সঙ্গে যোগ হলো আপনার, "সৃজন মুক্তি দিলাম তোমায়" টাইপের বাংলা সিরিয়ালের ডায়লগ। দুটো মিলিয়ে নিশ্চিত হলাম, আজ রাতে ধুম হবে ভারী, নিয়ে এসো কারণবারী। ধুর ধুর, ট্রেনে একটা সিগারেট খেতে পারছি না, কারণবারী তো কোন ছাড়।

দেবলীনা বললো, আপনি মদ খান?

দিগন্ত ওষুধ খাইয়ে জলের ঢাকাটা আটকে বললো, মাঝে মাঝে খাই, তবে খুব অল্প। আপনি হয়তো পাড়ার মনসা পুজোর মাতালদের মত "মদ খান" টাইপের কোশ্চেন করলেন। তবে আমার উত্তর হলো, খাই তবে সেটা ভীষণ রকমের পরিমিত।

যাইহোক, আপনি এখন ঢাকাটা চাপা দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করুন। আমি কাল সকালে আমার পুচুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব, পরনারীর কপাল স্পর্শ করার জন্য। তবে কি বলুন তো, আমার পুচু সোনা কিন্তু অবুঝ নয়, অসুস্থ রোগী হলে সব দোষ স্খলন হয়ে যায়।

দেবলীনা ক্লান্ত জ্বোরো গলায় বলল, কাল আপনার পুচু সোনার গল্প শুনবো।

দিগন্ত একটু হেসে বললো, নিশ্চয়ই।

দিগন্তর দেওয়া মোটা উলের চাদরটা মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়েও কাঁপছিল দেবলীনা। জ্বরটা বেশ ভালোই এসেছে ওর। কেন জ্বর এলো, ঠাণ্ডা তো তেমন লাগেনি, তাহলে বোধহয় অতিরিক্ত মানসিক প্রেশারেই এর আগমন

ঘটেছে। একটু দুর্বলও লাগছে, গলাটা বেশ শুকিয়ে গেছে। ফিসফিস করে বললো, জল, নিজের মাথার কাছে হাতড়ে জলের বোতলটাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করতেই দিগন্ত ওর সিট থেকেই বললো, জল খাবেন? দাঁড়ান দিচ্ছি।

মিডিল সিট থেকে নেমে এসে ওর হাতে জলের বোতলটা দিয়ে বললো, মাথাটা একটু তুলে খান, গলায় লেগে যাবে।

জলের বোতলটা দেবলীনার হাত থেকে নিয়ে বললো, একবার মাথায় হাত দিয়ে দেখবো, একটুও কমেছে কিনা? না হলে অন্য ওষুধ ট্রাই করতে হবে।

দেবলীনা নীরবে ঘাড় নাড়াতেই একটা শীতল হাত এসে স্পর্শ করলো ওর চুলে ঢাকা কপাল। চুলগুলোকে খুব শান্ত ভঙ্গিমায় সরিয়ে দিয়ে কপালের উষ্ণতা পরখ করে দিগন্ত বললো, এখনও পুরো কমেনি। তবে আগের মত অতটাও নেই, বুঝলেন?

দেবলীনা ক্লান্ত হেসে বললো, সিগারেট ধরানো যাবে না এখন, তাই তো?

দিগন্ত মুচকি হেসে বললো, এবারে একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। কাল একটা দারুণ সকাল অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। যে চলে যেতে চায়, তাকে জোর করে ধরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা যেমন করেন নি, তেমনই মন থেকেও তাকে সরিয়ে দিন একটু একটু করে। নিজের থেকে বেশি মূল্য কাউকে কখনো দেবেন না, তাহলেই দগ্ধ হবেন আজীবন। সবটুকু দিয়ে নিজেকে ভালোবাসুন,

দেখবেন সুখ আর আনন্দ আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছেই না।

দেবলীনার জ্বোরো লালচে চোখ থেকে দুবিন্দু জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে চিবুকে। নোনতা জলের বিন্দুদুটোর যেন কোনো তাড়া নেই, কষ্টগুলোকে শুষে নিয়ে ধীরে ধীরে নামছিল চিবুকের দিকে। আধোঅন্ধকারে সেদিকে তাকিয়ে দিগন্ত বললো, ওই বিন্দুদুটোকে আরেকটু সময় দিন, ওকে বলুন, স্মৃতি মুক্ত করুক আপনাকে।

দেবলীনা বললো, যান ঘুমিয়ে পড়ুন, আমি ভোরের নতুন সূর্য ঠিক দেখবো। ততক্ষণে অন্ধকার শুষে নেবে আমার দৃষ্টিপথ রোধ করা স্মৃতিগুলোকে।

দিগন্ত চলে গেল ওর সিটে। যাওয়ার সময় ফিসফিস করে বলে গেল, এত কি ভাবছেন বলুন তো, ঘুমিয়ে পড়ুন।

এত কি ভাবছেন বলুন তো, একবার তো বললাম আপনাকে আমরা মডেলকে এই পরিমাণ টাকাই প্রোভাইড করে থাকি। আপনার ক্ষেত্রে এক্সট্রা দিই নি। আমি তো ভাবলাম, আমার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরবেন বলে আপনি আজ এই ''নিরিবিলিতে'' এলেন। যদিও এত লোকজন ভর্তি ক্যাফের নাম যে কেন ''নিরিবিলি'' রেখেছেন মালিক সেটা উনিই বলতে পারবেন। সৃজনের বলার ধরনে একটু হেসে দেবলীনা বলেছিল, তাই বলে

কয়েক ঘন্টার জন্য এতগুলো টাকা আমি নিতে পারবো না। চেকটা রিটার্ন করুন।

সৃজন অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেছিল, আমায় একটা চিমটি কাটবেন? আমি বুঝতে চাইছি আমি এখনো স্বজ্ঞানে মনুষ্য সমাজে বাস করছি কিনা!

গোটা পৃথিবী টাকার পিছনে ছুটছে, আর আপনি এসেছেন টাকা ফেরত দিতে? প্রবাদ আছে, সুন্দরী আর বুদ্ধিমত্তার নাকি দারুণ ঝগড়া, এদের কোথাও সহাবস্থান হয়না, কথাটা কি সত্যি?

মানে, কি মনে হয় আপনার?

সৃজনের কথা শুনে হেসে ফেলেছিলো দেবলীনা। বলেছিল, সে আপনি যাই বলুন, ওই সামান্য মডেলিংয়ের জন্য আমি এত টাকা নিতে পারবো না। আমি সুন্দরীও নই, বুদ্ধিমতীও নই।

সৃজন কফিতে চুমুক দিয়ে বলেছিল, এমন মিথ্যে তো আপনার শত্রুও বলতে পারবে না। আপনি সুন্দরী নন?

তাহলে তার সংজ্ঞা কি ম্যাডাম? এমন চকিত হরিণ নয়ন, গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট, দৃঢ় চিবুক, মরাল গ্রীবা একেও সুন্দরী বলবো না। আপনার মত কাউকে দেখেই স্বয়ং কালিদাসও কাব্য রচনা করেছিলেন। যদিও বাংলা আমার তেমন স্ট্রং নয়, তবুও পড়েছি মন দিয়েই।

দেবলীনা ছটফট করে উঠে বলেছিল, তাহলে চেকটা আমি কি করবো?

সৃজন বললো, এখনো জমা দেন নি? তাহলে হয়তো এক্সপায়ার করে গেছে। আমায় নতুন চেক করে দিতে

হবে।

দেবলীনা বলেছিল, তাহলে প্লিজ অ্যামাউন্টটা কম করে লিখবেন।

সৃজন কথা না বলে, নিজের হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, বিজনেস ম্যানের ছেলে, তাই ডিল ছাড়া কাজ করি না। এই অর্বাচীনের বন্ধুত্ব স্বীকার করুন, তবেই মানবো আপনার কথা।

দেবলীনা আলতো করে ধরেছিল সৃজনের হাতটা, নরম গলায় বলেছিল, বেশ বন্ধু হলাম।

সৃজন ওয়েটারকে ডেকে বলেছিল, এতটুকু নিরিবিলি তো নেই আপনাদের "নিরিবিলিতে", গুড ফুড কি আছে বলুন?

দেবলীনা, প্লিজ বলো, এই বন্ধুত্বের মুহূর্তকে কি করে স্মরণীয় করে রাখি। অ্যাটলিস্ট ফিসফ্রাই খাও একটা।

দেবলীনা হেসে বলেছিল, বেশ তাই হোক। আপনার যা ইচ্ছে।

সৃজন অবাক হওয়ার ভান করে বলেছিল, তুমি বুঝি বন্ধুদের আপনি বলো?

নাকি আমায় দেখে তোমার আঙ্কেলের বয়েসী মনে হচ্ছে, কোনটা! যেটাই হোক সত্যি বলো প্লিজ।

তাহলে আমায় আরেকটু মেইনটেইন করতে হবে। এখন থেকেই যদি সুন্দরীরা কাকু আর আপনি বলতে শুরু করে, তাহলে সম্মানহানির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

সৃজনের মত উচ্ছল ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে ভেসে গিয়েছিল দেবলীনার ছদ্ম গাম্ভীর্য।

ঘন্টা খানেকের মধ্যেই দেবলীনা নিজের অস্বস্তি কাটিয়ে সৃজনকে বন্ধু বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ওই "নিরিবিলি" ক্যাফের কফি আর ফিসফ্রাই খাওয়া বন্ধুত্ব কবে যে ভালোবাসার পথে পাড়ি দিয়েছিল, সেটা অবশ্য দেবলীনা নিজেও বুঝতে পারেনি। ওর রুটিন মাফিক জীবনে কখন কিভাবে যেন সৃজন নামক অনুভূতির অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে এবং সে ওর গোটা মন জুড়ে বেশ ভালোই আধিপত্য বিস্তারও করেছে।

ক্যাফেতে সৃজনকে দেখেই প্রথম চমক লেগেছিল, ও পরেছিলো দেবলীনার পছন্দের জলপাই রঙের একটা শার্ট। এই রংটা ওর একান্ত নিজের, ভীষণ পছন্দের একটা রং। খুব বেশি জাঁকজমক নয়, কিন্তু একটু আলাদা। আর চাকচিক্য কম বলেই হয়তো মানুষ একে একটু ব্রাত্য করেই রেখেছে, কিন্তু এর নরম স্নিগ্ধতাটাই আকর্ষণ করে ওকে। সৃজনের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, অলিভ? আপনার ফেভারিট বুঝি?

সৃজন মুচকি হেসে বলেছিল, না আপনার ফেভারিট, তাই সদ্য কিনে পরলাম। আমার ওয়াড্রবে তো আসমানী নীলের আধিক্য, যেটা আপনার পরণে আছে।

আমি তো আপনার বান্ধবী স্বর্ণালীর কাছ থেকে জানলাম আপনার পছন্দের রং, আপনার ভালোলাগার খবরগুলো। আপনাকে ইমপ্রেসড করতে পরে চলে এলাম। কিন্তু আপনি কোথা থেকে জানলেন আমার পছন্দের খবর? আর আমায় ইম্প্রেসড করার কোনোরকম সদিচ্ছা যে আপনার নেই, সেটা আমি ভালোই বুঝেছি।

দেবলীনা একটু হেসে বলেছিল, ইম্প্রেসড না করতে চেয়েও ভিকটিম যখন হয়েই গেলাম তখন আর কার্যকারণ খুঁজে লাভ কি!

সৃজনের পছন্দ, অপছন্দের সাথে কোনোদিনই মিল ছিল না দেবলীনার। তবুও ওদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা গড়েই উঠেছিলো। কিন্তু বছর খানেক পেরোতেই একটা জিনিস দেবলীনা ভীষণ ভাবে অনুভব করছিল, সৃজন হারতে জানে না, না শুনতে পছন্দ করে না, নিজের মতামতগুলোই অন্যের ওপরে জোর করে প্রয়োগ করেই ওর তৃপ্তি। প্রথম প্রথম ভালোবাসার টানে দেবলীনাও মেনে নিতো ওর অন্যায্য আব্দারগুলো, কিন্তু ধীরে ধীরে বড্ড একপেশে লাগছিলো বিষয়টা। আবারও গুলিয়ে যাচ্ছিল ভালোবাসা আর মানিয়ে নেওয়ার সংজ্ঞাটা। সৃজনের বিরোধিতা করতে গেলেই ও বলতো, তুমি না আমায় ভালোবাসো, তাহলে কেন এটুকু করতে পারছো না আমার জন্য! দেবলীনার বলা হয়ে ওঠেনি, সৃজন তুমিও তো আমায় ভালোবাসো, ইম্প্রেসড করার জন্য প্রথম দিন আমার পছন্দের রং পরে গিয়েছিলে, তাহলে কেন তোমার কাছে আমার কোনো পছন্দেরই মূল্য রইলো না! এমন অনেক প্রশ্ন ছিল ওকে করার, কিন্তু হয়ে ওঠেনি কখনো। হয়তো সৃজনকে হারিয়ে ফেলার ভয়েই ওর সব কিছুকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিচ্ছিলো দেবলীনা। মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন মনের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতো, উত্তর খুঁজে বেড়াতো অনবরত।

সৃজন কি আদৌ দেবলীনাকে ভালোবাসে? নাকি সুন্দরী, শিক্ষিতা,বাধ্য গার্লফ্রেন্ড বলেই মেনে নিয়েছে ওকে! আচ্ছা যদি হঠাৎ অবাধ্য হয়ে যায় ও সৃজনের, তাহলেও কি ভালবাসবে সৃজন? নাকি ওর ইচ্ছেগুলো দেবলীনার ওপরে চাপিয়ে দিতে দিতে আসল দেবলীনাকে এভাবেই বদলে ফেলবে ও! দেবলীনা একদিন বলেছিল, সৃজন তুমি এভাবে একটু একটু করে আমায় বদলে ফেলতে চাইছো কেন?

সৃজন বেশ ক্যাজুয়ালি বলেছিল, কারণ সৃজন চৌধুরীর পাশে তোমাকে মানানসই করতে এটুকু বদল দরকার।

মনে মনে হেসেছিল দেবলীনা। বুঝেছিলো, গড়ে পিঠে একটা ঠিকমত জীবনসঙ্গী চায় সৃজন, দেবলীনাকে নয়। গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া বানানোর থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ঘোড়াকে রেশে নামানো সহজ হবে ভেবেছিল বলেই বোধহয় দেবলীনা ওর পছন্দের তালিকায় প্রথমে ছিল।

সৃজনও মাঝে মাঝেই বিরক্ত হয়ে বলছিলো, প্লিজ দেবলীনা নিজেকে বদলাও। কেন যে তুমি তোমার মিডিলক্লাস মেন্টালিটি নিয়ে বসে থাকো কে জানে! এত নামি দামি রেস্টুরেন্টে, ডিস্কে নিয়ে গিয়েও তোমার মেন্টালিটির কোনো পরিবর্তন হলো না। এখনো তোমায় কোথায় হানিমুনে যেতে চাও জিজ্ঞেস করলে, তুমি আমার পজিশনের কথা না ভেবেই বলে বসবে, মানালি। কেন, সুইজারল্যান্ড বলতে সমস্যা কোথায়? ভাবনা চিন্তাগুলোর আপগ্রেডেশন দরকার, বুঝলে! এত দামি দামি ড্রেসগুলো গিফট করি তোমায়, সেগুলোর লেন্থ, স্টাইল নিয়ে প্রবলেম

হয় তোমার। সবকিছুই যদি তোমার অপছন্দ হয় তাহলে তুমি মিসেস সৃজন চৌধুরী হবে কি করে লীনা?

সজোরে ধাক্কাটা সেদিন লেগেছিল দেবলীনার। ওর পরিচয় শুধুই মিস্টার সৃজন চৌধুরীর ওয়াইফ?

ওর স্কুলের ক্লাসরুম, প্রেয়ার লাইনের জাতীয় সংগীত, টিচার্স রুম, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বেস্ট টিচারের তকমা... সব কিছুকে মিথ্যে করে দিয়ে, দেবলীনার সমস্ত সত্তাকে ভুলে গিয়ে শুধুই মিসেস চৌধুরী হওয়ার জন্য লড়াই করতে হবে ওকে! ভালোবাসা বুঝি এতটাই স্বার্থপর হয়?

মিসেস চৌধুরী হয়ে ওঠার লড়াইয়ে ও সেদিন থেকেই একটু একটু করে অসহযোগিতা শুরু করেছিল। স্বর্ণালী বলেছিল, সৃজন কিন্তু তোকে ভালোবাসে, হয়তো প্রসেসটা একটু আলাদা। ঐখানেই তো দ্বন্দ্ব চলছিল দেবলীনার, এত শর্তসাপেক্ষে হয় নাকি ভালোবাসা! এমন হলে তো ওই ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ডের মিষ্টতাই নষ্ট হয়ে যাবে! টানাপোড়েনের দড়ি টানাটানি খেলায় হারিয়ে যাবে অনুভূতিগুলো। অবশ্য শেষ রক্ষা হলোও না। শেষপর্যন্ত ওদের প্রায় তিনবছরের সম্পর্কটা চিড়ফাট থেকে বড় ফাটল ধরলো, আর এন্ড অফ দ্য রিলেশনের রেজাল্ট দাঁড়ালো ব্রেকআপ। ব্রেকআপটা ওরা দুজনেই চাইছিলো বলেই হয়তো ছাড়াটা সহজ হয়েছিল।

তবুও তিনবছরের স্মৃতি তো কিছু কম নেই। দৃষ্টিপথকে ঝাপসা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সৃজনের সাথে প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকে শেষ দেখা পর্যন্ত, মাঝের মেঘলা বিকেল, তারা জ্বলা সন্ধে, ঘুঘু ডাকা ছুটির দুপুর, প্রায়

মধ্যরাতের ডিস্কোর উদ্দামতা সব কিছু মিলিয়ে স্মৃতির ডায়রির শেষ পাতা পর্যন্ত ভর্তি হয়ে গেছে। সেসব দুদিনে ভোলা বোধহয় সত্যিই কষ্টকর। তবুও দেবলীনা জানে ওকে এসব ভুলে এগোতে হবে। আর সেই চেষ্টাতেই নিজের সাথে একান্তে কিছুক্ষণ কাটতেই ওর এই একা একা বেড়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত।

ভীষণ ঘাম হচ্ছে, বোধহয় জ্বরটা ছাড়ছে।

আস্তে আস্তে দিগন্তর দেওয়া ঢাকাটা গা থেকে সরিয়ে বসলো দেবলীনা।

তাকিয়ে দেখলো দিগন্ত ঘুমাচ্ছে। প্যাসেজের লাইটটা জ্বলছে, সম্ভবত কিছু প্যাসেঞ্জার সামনেই নামবে, ওদের ফিসফাস শোনা যাচ্ছে। একটু ওয়াশরুমে যাওয়ার দরকার। কিন্তু ট্রেনের ওয়াশরুমগুলোতে যেতে হবে ভাবলেই কান্না পায় দেবলীনার। যতই এসি কামরার ওয়াশরুম হোক, কমন তো।

তবুও বাধ্য হয়েই সিটের নিচে থেকে নিজের চপ্পল দুটো খুঁজে বের করলো মোবাইলটা জ্বেলে। চারটে বেজে গেছে। আরেকটু পরেই ভোরের আলো ফুটবে। দিগন্ত যেন কি বলছিলো ওকে, ওর জন্য নাকি অপেক্ষা করে আছে একটা নতুন সকাল। কি দেবে ওকে নতুন সকালটা? আবার মানুষের প্রতি বিশ্বাস জাগাবে? আবার ভালোবাসা নামক শব্দের প্রতি মোহ তৈরি করতে পারবে? নাকি নতুন সূর্যও বলবে সেই একই কথা, ভেঙে গেছে পুরোনো বিশ্বাস, হারিয়ে গেছে সেই দেবলীনা। ওর কজন ছাত্রী সেদিন হঠাৎই ক্লাসে ওকে প্রশ্ন করেছিল, ম্যাম, আপনি

আর হাসেন না কেন আগের মত। আমাদের একদম ভালোলাগে না। বড্ড গম্ভীর থাকেন আজকাল, কি হয়েছে ম্যাম? ওদের নিষ্পাপ গলায় আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়েছিলো দেবলীনা, তবুও অকারণে কঠিন হয়ে বলেছিল, তোমাদের পড়াশোনার কি ক্ষতি হচ্ছে? আমি কি তোমাদের ভালো করে পড়াচ্ছি না?

মেয়েগুলো অপ্রস্তুত গলায় বলেছিল, না না ম্যাম, সেটা নয়। আপনি তো সব থেকে ভালো করে পড়ান। আমাদের সব থেকে পছন্দের টিচার আপনি।

তবে বেশ কিছুদিন ধরে আপনাকে একটু মনমরা লাগছিলো, তাই জিজ্ঞেস করলাম, সরি ম্যাম।

মেয়েগুলো ধীর পায়ে চলে গিয়েছিল নিজেদের বেঞ্চে। নিজের ওপরেই রাগ হয়েছিল দেবলীনার। এভাবে ওর প্রতি মনযোগ দেওয়া মানুষগুলোকে ও দূরে ঠেলে দিচ্ছে কেন! একটা নির্জন দ্বীপে বাস করতে চায় কি ও?

বাবা, মাকেও কথায় কথায় এমন সব উল্টোপাল্টা বলে ফেলেছে, যে তারাও এখন মেয়েকে ভয় পেতে শুরু করেছে। সেদিন ডাইনিং টেবিলে মা খুব ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করলো, তুই ব্রেকফাস্ট করবি তো? নুডলস বানিয়ে দেব?

মায়ের গলার স্বর শুনে দেবলীনার নিজেরই কষ্ট হচ্ছিল। মা জানে লীনার পছন্দের খাবার নুডলস, তারপরেও মায়ের চোখে শঙ্কিত একটা চাউনি। বাবাও লীনার হাত থেকে দৈনিক কাগজটা চাওয়ার সময় একটু

অপ্রস্তুত গলাতেই বলেছিল, তোর পড়া হয়ে গেলে আমায় একটু দিস তো।

এসবের কারণ তো লীনা নিজেই। বাড়ির সকলকে বলেছে, লিভ মি অ্যালোন। বাড়িতে আমি কি একটু প্রাইভেসি পেতে পারি না? দিনরাত তোমাদের এই বেশি বেশি যত্ন, আমি জাস্ট নিতে পারছি না। প্লিজ, আমাকে একটু একা থাকতে দাও। মায়ের অবশ্য তাতেও শান্তি নেই, মেয়ের ঠিক কি হয়েছে সেই দুশ্চিন্তায় রয়েছে মা। বাবা নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়েছে লীনার থেকে। কাকু, কাকিমারাও যেন একটু এড়িয়েই যাচ্ছে ওকে।

ওর চারপাশের ওকে নিয়ে ভাবা মানুষগুলোকে ও দূরে ঠেলে দিয়েছে ইচ্ছে করেই। পালাতে চাইছিলো সকলের আড়ালে, নাহলে ঠিক ধরা পড়ে যেত ওর মুখের যন্ত্রণার অভিব্যক্তিগুলো। সৃজনের সাথে যেদিন থেকে রাকার ঘনিষ্ঠ ছবিটা দেখেছিলো, সেদিন থেকে বুকের মধ্যে একটা ঝড় তোলপাড় করছিল ওকে। সেই ঝড়টা কালবৈশাখী হয়ে নেমেছিল যখন সৃজন পরিষ্কার ভাবে বলেছিল, হ্যাঁ রাকাকে আমি পছন্দ করি। ওর আর আমার মধ্যে ভীষণ মিল। অ্যাডজাস্ট করতে হয় না, মিলগুলো এমনিই হয়ে যায়। রাকার সাথে মেশার পর আমি বুঝেছিলাম, মুহূর্তের ভালোলাগা বা সাময়িক ভালোবাসার সম্পর্কের বাইরেও আরেকটা জিনিস খুব দরকার হয় জীবন কাটাতে গেলে, সেটা হলো দুজনের মনের মিল, পছন্দের মিল। যেটা তিনবছর চেষ্টা করেও তোমার আমার মধ্যে হয়নি, আর ভবিষ্যতেও হবে না। জানো দেবলীনা,

রাকা যেন আমার সব পছন্দের খবর রাখে, অথবা আমার ভালোলাগা গুলোই ওর পছন্দ। দেবলীনা, আই নিড ব্রেকআপ।

দেবলীনার গলা ধরে এসেছিল, বুকের মধ্যে কালবৈশাখীর তোলপাড়, দুচোখ ছাপিয়ে বৃষ্টি নামতে চেয়েছিল, সব কিছুকে কঠিন হাতে শাসন করে অনুভূতিহীন গলায় ও বলেছিল, ইয়েস সৃজন। উই নিড ব্রেকআপ। ইনফ্যাক্ট আমিও ভাবছিলাম এই কথাটাই তোমাকে বলবো। উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরুকে জোর করে মেলানোর চেষ্টা করেছিলাম আমরা। দুজনেই হয়তো ক্লান্ত। এবারে ফ্রিডম খুঁজছে আমাদের দুজনেরই মন, তাই না সৃজন?

একটু বোধহয় চমকেছিলো সৃজন। ওর এতটা ঠাণ্ডা গলা শুনবে বুঝতে পারেনি। দেবলীনা যে সৃজনকে বড্ড বেশিই ভালোবাসতো সেটা বোধহয় বুঝেছিলো ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও। তাই লীনার এতটা নিরুদ্বিগ্ন গলা শুনে একটু থেমে সৃজন বলেছিল, কষ্ট হবে না তোমার?

দেবীলনার দুচোখে তখন ঘন মেঘ, থরথর করে কাঁপছিল ঠোঁট দুটো। তবুও কাটা কাটা গলায় বলেছিল, কষ্ট হতো, যদি আমরা জোর করে টেনে ধরে রাখার চেষ্টা করতাম সম্পর্কটাকে, হয়তো বসন্ত বাতাস হয়ে উঠত অত্যন্ত রুক্ষ। তার থেকে এই মিউচ্যুয়াল ব্রেকআপটা ঢের ভালো। আমরা দুজনেই এনাফ ম্যাচিওরড, এখন কি আর ঝগড়া ঝাঁটি, কান্নাকাটি শোভা পায়! তাছাড়া গত একবছর ধরে আমাদের সম্পর্কটা মধুরতা হারিয়ে হোঁচট খেতে

খেতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। মানিয়ে নিতে নিতে আমিও খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম সৃজন। তাই এই বেশ ভালো হলো। সৃজন আলগা স্বরে বলেছিল, তবে তুমি যদি থাকতে চাও, থাকতে পারো আমার জীবনে, কিন্তু রাকাকে তোমায় মেনে নিতে হবে।

দেবলীনা তিক্ত স্বরে বলেছিল, না সৃজন, আমি চাই না। তবে এসব বলে নিজেকে আর আমার চোখে ছোট করো না। লজ্জা করবে আমার, মনে হবে আমি এতদিন এমন একজনকে ভালবাসতাম, যার ভাবনা, চিন্তাটাই স্বচ্ছ নয়। এক্স বলে, আমি তোমায় ঘৃণা করতে চাই না।

সৃজন ফোনটা রাখার সময় বলেছিল, আমিও চাই তোমার জীবনেও তোমার পছন্দের কেউ আসুক।

ফোনটা রেখে দিতেই মনের ভিতরের দামাল কালবৈশাখীর ঘন মেঘটা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছিল দেবলীনার দুচোখ দিয়ে। গাল থেকে চিবুক বেয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছিল বুকের কাছের চুড়িদারের অংশটাকে। নোনতা জলের ধারাকে মোছার চেষ্টাও করেনি লীনা, ভিজিয়ে দিক ওকে, হৃদয়তন্ত্রীর প্রতিটা সুর কঁকিয়ে উঠে গেয়েছিল ভাঙনের গান। "একলা চল রে" সুরের মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছিল ওর ভালোবাসা হারিয়ে একা হয়ে যাওয়ার গল্পটা। সৃজনকে ওরও বিরক্ত লাগছিলো ঠিকই, কিন্তু হারিয়ে ফেলার পরের শূন্যতাটা যে এতটা কষ্ট দেবে ওকে তখন বোঝেনি ও। যদিও ধীরে ধীরে নিজেকে অনেকটাই সামলে নিয়েছে দেবলীনা। তবে বাবা, মাকে এখনো বলা বাকি। যতবার ওরা বিয়ের কথা বলেছে, ততবার দেবলীনা

বলেছে, চিন্তা করো না, আমার পছন্দের মানুষকে তোমাদেরও পছন্দ হবে। তবে বিয়েটা এখুনি নয়, এখুনি তোমাদের ছেড়ে যেতে চাইনা, আর কিছুদিন পরে।

বাবা, মা সৃজনের কথা জানতো, ওদের যে কিভাবে ফেস করবে দেবলীনা সেটাই চিন্তার বিষয়।

তবে ওদের ফেস করার থেকেও নিজের ভালো থাকাটা সত্যিই প্রয়োজন, সৃজনের সাথে মানিয়ে নিতে নিতে বোধহয় সেটা ভুলেই গিয়েছিল দেবলীনা। দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে মুখোমুখি হবে বাবা-মায়ের, বলে দেবে সব সত্যিটুকু।

সিট থেকে উঠতে গিয়েই মাথাটা ঘুরে গেল দেবলীনার।

আরেকটু হলেই ঠোক্কর খাচ্ছিল, তখনই দিগন্ত একটা হাত দিয়ে ধরে ফেললো ওকে। সিটে বসিয়ে দিয়ে বললো, আচ্ছা মানুষ তো আপনি, একটু ঘুমিয়েছি এই সুযোগে আমার নামে কেস দেওয়ার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন। আরে মশাই, একবার ডাকতে কি হয়েছিল? কি মনে হয় আপনার আমাকে? সত্যিই এই পিসিমণির ভাইপো মনে হয় নাকি! কানের কাছে ঢাক বাজালেও নাক ডাকার বিরতি পড়বে না মনে হয়?

তাহলে ডাকলেন না কেন? নেহাত মোবাইলটার আলো চোখে পড়লো আর অন্য প্যাসেঞ্জারদের ফিসফাস কথায় ঘুমটা ভাঙলো তাই, নাহলে তো রীতিমত জেল হয়ে যেত আমার। আরে জ্বরটা হয়তো সবে ছেড়েছে, এখুনি একা ওঠার কি দরকার ছিল বলুন তো!

দেবলীনা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, বড্ড জ্বালাচ্ছি আপনাকে, সরি। কিন্তু হঠাৎ আপনাকে কে জেলে পাঠাবে বলুন তো?

দিগন্ত ওর নিজস্ব ঢঙে হেসে বললো, রেলকর্তৃপক্ষ পাঠাবে। সামনের সিটে একজন সবল পুরুষমানুষ বসে থাকতেও সহযাত্রী মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে, আর সে এতটুকু কেয়ারিং নয়, এই তথ্য যদি তাদের কাছে যায় তো অমানুষ হবার দায়ে জেলে যাবো, বুঝলেন!

এখন বলুন তো, কোথায় যাচ্ছিলেন কোথায়? নিউজলপাইগুড়ি তো অনেকটা দেরি আছে।

দেবলীনা বাধ্য হয়ে বলল, একটু ওয়াশরুমে যাচ্ছিলাম।

নিজেকেই দোষারোপ দেবার ঢঙে দিগন্ত বললো, ওহ, সরি, চলুন আমি যাচ্ছি সঙ্গে।

দেবলীনা অস্বস্তি নিয়েই বললো, আমি পারবো যেতে।

দিগন্ত হাসি মুখে বললো, আমার মা বলতো, আমি নাকি ছোট থেকেই বিকট টাইপের অবাধ্য, তাই ভদ্রলোকের কথা কোনোকালেই তেমন শুনি না। চলুন চলুন...

আর কথা না বাড়িয়ে দিগন্তর হাতটা ধরলো দেবলীনা। বহুদিন পরে যেন একটা ভরসা করার মত হাত ধরলো ও। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আবারও ওকে বার্তা পাঠালো, মানুষটা মোটেই খারাপ নয়। তবে একটু অদ্ভুত টাইপের, ওর দেখা আর পাঁচজনের থেকে আলাদা।

ওয়াশরুমের বাইরে অপেক্ষা করছি, বলেই দিগন্ত বললো, এত সংকুচিত হবেন না। বন্ধু না ভাবলেও চলবে,

শুধু সহযাত্রী ভাবলেই হবে। মানুষ এটুকু মানুষের জন্যই করে। আমি অসুস্থ হলেও স্থির বিশ্বাস করি, আপনি হেল্পের হাত বাড়াতেন। আমরা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে, মেয়ে তো, তাই ছোট থেকেই একটা মূল্যবোধ নিয়ে বড় হয়েছি। আমার মা বলেন, সুখে না পাশে থাকতে পারলেও, দুঃখে থাকবো। দেবলীনা খুশি হয়ে বলল, এটা তো আমার মায়েরও কথা। দিগন্ত ঘাড় নেড়ে বললো, মা কখনো আলাদা হয় নাকি!

।। ৬।।

নিজের সিটে সোজা হয়ে বসতেই দিগন্ত বললো, এখন শরীর ফিট? নাকি দুর্বল লাগছে? আপনি একা কিভাবে ঘুরবেন বলুন তো? মহা চিন্তায় ফেললেন তো।

দেবলীনা নিরাসক্ত গলায় বলল, কোনো চিন্তা নেই, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে আপনি আপনার পথ ধরবেন, আমি আমার। এমনিতেই আমি যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছি আপনার, আর নয়। প্লিজ, টেনশন করবেন না, আমি পারবো।

দিগন্তর ভ্রূর ভাঁজে তবুও দুশ্চিন্তার মেঘের আনাগোনা দেখে অবাক লাগছিলো দেবলীনার। কয়েকঘন্টা আগেই মাত্র পরিচয় হয়েছে দিগন্তর সাথে, ওকে ভালো করে চেনেও না, তাতেও ওকে নিয়ে চিন্তা করছে মানুষটা। আর গত তিনবছর যাকে উজাড় করে ভালোবাসল, সে শুধুমাত্র এক্স হয়ে গেছে বলে আর খোঁজটুকুও নিলো না। প্রেজেন্ট আর পাস্টের মধ্যে কত পার্থক্য, এই কয়েকদিন আগে যে মানুষটা ফোন রিসিভ না করলে দুশ্চিন্তা করতো,

মেসেজের পর মেসেজ করতো সে এখন নিশ্চিন্তে রয়েছে ওর কোনো খবর না নিয়েই। দেবলীনা জানে সকাল নটার আগে সৃজন ঘুম থেকেই ওঠে না। কিন্তু উঠেই ওকে গুড মর্নিং মেসেজ পাঠাতে ভুলত না আগে। আগে বলতে যতদিন রাকা আসেনি ওর জীবনে।

এই যে ম্যাডাম, এত কি আকাশ পাতাল ভাবছেন বলুন তো? আর দু ঘন্টার মধ্যে ট্রেন এন জি পি ঢুকবে। কি করবেন ভেবেছেন?

অন্য কোনো ট্রেনের টিকিট দেখবো, বা ফ্লাইটের ব্যবস্থা করবো? বাড়ি ফিরে যাওয়াই তো ভালো মনে হয়। এই জ্বর নিয়ে ঠান্ডার জায়গায় যাওয়া কি ঠিক?

দেবলীনার চোখে একটু বিরক্তি ফুটে উঠলো। ইদানিং একটুতেই বিরক্ত হয়ে মেজাজ হারানোটা ওর রোগ হয়ে গেছে যেন। ও কিছু বলার আগেই দিগন্ত বললো, বিরক্ত হচ্ছেন? ভাবছেন তো, পাড়া-পড়শীর কেন ঘুম নেই?

আসলে লোকে বলে একসাথে সাত পা চললেই নাকি বন্ধু হয়, আর আমরা তো কয়েকশো কিলোমিটার একসাথে এলাম, তাই চিন্তা হচ্ছিল আর কি।

বিরক্ত যখন হচ্ছেন তখন আর কিছু বলবো না। এমনিতেই আমার পুচু সোনা রাগ করবে আপনার সাথে এত কথা বলছি জানলে।

দিগন্তর বলার ভঙ্গিমায় সব ভুলে বহুদিন পরে হো হো হেসে উঠলো দেবলীনা।

দিগন্ত সেদিকে অপলক তাকিয়ে বললো, হাসলে কিন্তু আপনাকে বেশ লাগে, নির্মল, প্রশান্ত, ভারহীনভাবে

হাসুন। এই যে আপনারা মুখে দিনরাত হাবিজাবি মেখেই চলেছেন, স্কিনের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে, সেসব না মেখে মন খুলে হাসুন দেখি, এমনিই স্কিন গ্লো করবে।

আমার হাসির আওয়াজে বোধহয় আপনার পিসিমণির ঘুম ভেঙে গেল। ওই দেখুন, উনি তাকাচ্ছেন।

দিগন্ত ফিসফিস করে বললো, আপনার হাসির আওয়াজে নয়, মানুষ ন ঘন্টার বেশি ঘুমানো পাপ বলে এবারে উনি উঠবেন ভাবছেন। ট্রেনে ন ঘন্টা নিশ্চিন্তে ঘুমানোর মত পাপ তো আর হয়ই না। দেবলীনা হাসতে হাসতেই বললো, বন্ধু না হোক, সহযাত্রী যখন হলাম, তখন আপনার পুচু সোনার নামটা জানতে পারি কি?

দিগন্ত একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, রাই বিশ্বাস। যদিও আমি ওকে রাই বিশ্বাসঘাতক বলি। ও খুব রেগে যায় বুঝলেন এটা শুনলে।

দেবলীনার খুব ভালো লাগছিলো একটা সহজ সরল প্রেমের গল্প শুনতে। ভালোবাসা শব্দের ম্যাজিক যেন নিঃশেষ হয়ে না যায় পৃথিবী থেকে, তাহলেই মানুষ বিশ্বাস হারাবে।

দিগন্তর চোখে একটা লাজুক দৃষ্টির আনাগোনা। ঠোঁটের কোণে মায়াময় হাসির দিকে তাকিয়ে দেবলীনা মনে মনে বললো, রাই তুমি লাকি। ভীষণ লাকি, যে তুমি একটা প্রকৃত পুরুষ মানুষকে পেয়েছো জীবনসঙ্গী হিসেবে।

যেটা এই সমাজে সত্যিই বিরল।

কি হলো নতুন বউয়ের মত লজ্জা কেন পাচ্ছেন? বলুন আপনার রাইয়ের কথা। তার সাথে আপনার আলাপ

কোথায়? কলেজে না অন্য কোথাও? দিগন্ত একজন চাওয়ালাকে বললো, দুটো লিকার দিন। মুচকি হেসে বললো, আমার পিসিমণি যে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিসানগঞ্জ তো ঢুকে গেলো, আর কিন্তু বেশিক্ষণ নেই।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, কলেজ স্কুল এসব তো মানুষ জন্মেই যায় না? কিন্তু আমার রাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছিল জন্ম মুহূর্তেই।

চোখগুলো বড় বড় করে দেবলীনা বললো, ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইনটারেস্টিং। প্লিজ কন্টিনিউ...

আমার মা আর রাইয়ের মা একই সাথে একই নার্সিংহোমের একই কেবিনে ভর্তি হয়েছিল। আমি জন্মানোর মাত্র দুঘন্টা পরে উনি জন্মেছিলেন। আপনারা মহিলারাই ভালো বলতে পারবেন, কিভাবে লেবার পেন নিয়েও গল্প করা যায়, রীতিমত সই পাতানোও যায়। আমার মা আর তাপসী আন্টি ওই বাইশ বছর বয়সে দুজনে দুজনের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হয়ে উঠলো। স্বাভাবিকভাবেই দুই বাড়িতে যাতায়াত শুরু হলো ঘন ঘন। রাইদের বাড়ি খুব বেশি দুরেও নয় আমাদের বাড়ি থেকে। আমার মায়ের নাকি ইচ্ছে ছিল একটা মেয়ে হোক। তো ওই রাই সুন্দরী জন্মেই মায়ের সেই ইচ্ছে পূরণের দায়িত্ব নিয়ে নিল, আর আমায় জাস্ট ব্যাকফুটে ঠেলে দিলো। ওই মেয়ে জন্মে থেকে শুরু করলো তীব্র প্রতিবাদ। কেঁদে কেঁদে এমন অবস্থা করেছিল কেবিনের, যে আমার মাও নাকি আমায় পাশে শুইয়ে দিয়ে রাই সুন্দরীকে ভোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এটা যদিও আমার

শোনা কথা। ওই অসভ্য মেয়ে ছোট্ট থেকে যেদিন আমাদের বাড়িতে আসতো, ইচ্ছে করে আমার পছন্দের কোনো একটা খেলনা নিয়ে যাবার জন্য বায়না ধরতো। আর আমার মা তো ওকেই বেশি ভালোবাসতো, তাই প্রতিবারই বলতো, ওকে দিয়ে দে দিগন্ত, আমি তোকে কিনে দেব। আমিও মায়ের কথা বিশ্বাস করে ওই ইতর মেয়েকে প্রিয় খেলনাটা দিয়ে দিতাম। মাকে দ্বিতীয়বার কিনে দেবার কথা বললেই বলতো, তুই এত হিংসুটে কেন রে? ও ছোট, আব্দার করে নিয়ে গেছে, তাতে এত ঝামেলা কেন করছিস?

মাত্র দুঘন্টা ছোট হবার বেনিফিট তুলেছিল রাই। তখন থেকেই ঠিক করেছিলাম এমন জব্দ করবো ওই মেয়েকে, যে কেঁদে কুল করতে পারবে না।

আমিও ওদের বাড়ি গিয়ে ওর প্রিয় পুতুলগুলো আনতে শুরু করলাম। রাইয়ের বাবা, মা দুজনেই আমাকে খুব ভালোবাসতো। বাসবে নাই বা কেন বলুন, অমন বায়নাধারী মেয়ের পাশে আমি তো সোনার টুকরো। ওর বাবা মানে জয়ন্ত আঙ্কেল প্রায় বলতো, দিগন্তকে দেখে শেখ, কোনো রকম বায়না নেই, বাধ্য ছেলে আর তোর শুধু দিনরাত আব্দার। না পেলেই পা ছড়িয়ে কান্নাকাটি।

সেই শুনে ওই মেয়ে বলেছিল, ওকেই আমার পছন্দ, আমার পুতুলের সাথে বিয়ে দেব দিগন্তর। একদিন ওদের বাড়ি থেকে ওকেই তুলে নিয়ে চলে আসবো।

হতে পারি ছোট, কিন্তু মেল ইগোতে মারাত্মক ধাক্কা লেগেছিল মশাই। শেষ পর্যন্ত আমার একটা জীবন্ত বউও

জুটবে না, বিয়ে হবে কিনা একটা গোলাপি রঙের ফ্রক পরা সোনালী চুলের চোখ পিটপিট করা মেয়ের সাথে! ভেবেই রাগে জ্বলে গিয়েছিলাম। এমন শান্ত আমিও রাইয়ের চুল ধরে টেনে বলেছিলাম, কখনো না। তোর পুতুলকে আমি কোনদিন বিয়ে করবো না।

রাই ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ ছল ছল করে কেঁদে উঠেছিলো। ওই মুহূর্তে কি যে হয়েগিয়েছিলো আমার, ওই ছিঁচ কাঁদুনে, বায়নাকুটে মেয়েটাকেই মায়া হয়েছিল। বুঝলেন দেবলীনা ম্যাডাম, মায়া দয়া হলো বড় বিষম বস্তু। ওই যে বছর ছয়েকের দিগন্তর মায়া হয়ে গেল রাইয়ের প্রতি, অমনি মেয়ে সুযোগ নিয়ে আমার ঘাড়ে উঠে নাচতে শুরু করলো। এখনও নামার নাম নেই। এই ঘাড়টাই ওর পার্মানেন্ট সিংহাসন হয়ে গেছে।

দেবলীনা বললো, বিয়ে করছেন না কেন? এবারে শুভ কাজ সেরে ফেলুন। বিয়েতে কিন্তু আমায় নিমন্ত্রণ করবেন।

দিগন্ত ফিসফিস করে বললো, যতদিন বিয়ে না করে থাকা যায় আরকি। দেখছেন তো দূর থেকেও কেমন কন্ট্রোলে রাখে আমায়। কাছে এলে আর রক্ষা থাকবে না। দিগন্তর ঠোঁটের কোণে প্রশ্রয়ের হাসি। সেদিকে তাকিয়ে মনটা ভালো হয়ে গেল দেবলীনার।

আচমকা প্রশ্ন করে বসলো, আচ্ছা আপনার সাথে তো নিশ্চয়ই রাইয়ের মানসিকতার, পছন্দের বেশ কিছু পার্থক্য আছে। আপনি কখনো চেষ্টা করেছেন, রাইকে নিজের মত করে তুলতে?

দিগন্ত অবাক হয়ে বলল, পাল্টে ফেলতে চাইবো মানে? তাহলে তো আমার রাই বদলে যাবে। আমি তো রাইয়ের ওই ছটফটে, প্রাণোচ্ছল স্বভাবটার জন্যই ওকে ভালোবেসেছিলাম। রাই আমার মত শান্ত নয়, বুঝদার তো নয়ই, বড্ড অবুঝ টাইপের, ঐজন্যই তো ও রাই আর আমি দিগন্ত।

সামনের ভদ্রমহিলাকে কেউ একজন ডাকতে এসেছিল, মহিলা উঠে বসেই বললেন, ট্রেনে একদম ঘুম হয় না আমার, সারারাত প্রায় জেগে ছিলাম। তোমরা দুটিতে তো বেশ ভালোই ঘুমালে দেখলাম।

দিগন্ত এক মুখ হেসে বললো, পিসিমণি, আপনি জেগে ছিলেন বলেই তো আমরা ব্যাগপত্রর চিন্তা না করে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পেরেছি।

দেবলীনার পেটের মধ্যে হাসির দমক উসখুস করছিল, অনেক কষ্টে কন্ট্রোল করলো। একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করলো ও, দিগন্তের সঙ্গে গল্প করলে মনখারাপি বাতাসটা ঘেঁষতে পারছে না ওর ধারে কাছে। মন ভালো করার একটা ওষুধ বোধহয় দিগন্তের কাছে আছে। নির্ঘুম রাত কাটানো দিগন্তর পাতানো পিসিমণি চলে গেল নিজের সিটে।

দিগন্ত নিজের ব্যাগপত্র সিটের নিচে থেকে বের করার সময় দেবলীনার ট্রলি ব্যাগটাও বের করে দিলো সামনে। এবারে রেডি হয়ে নিন, মিনিট দশেকের মধ্যেই নামতে হবে।

দেবলীনার হঠাৎ কেমন ভয় ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল একজন কেউ ছিল ওর সঙ্গে, এবারে ও একদম একা হয়ে যাবে অপরিচিত একটা পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে। কিন্তু ও তো একা একা সময় কাটাবে বলেই এসেছিল এখানে, ইনফ্যাক্ট স্বর্ণালীকেও সঙ্গে নিতে ইচ্ছে করেনি, সৃজনের কথা ঘুরে ফিরে আসবে বলেই। তাহলে এখন একা হতে এত ভয় করছে কেন?

হ্যান্ড ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে চুলটা একটু ঠিক করে নিলো ও। ঠোঁটে লিপগার্ড লাগলো। কপালের টিপটাকে জায়গা মত বসিয়ে নিতেই দিগন্ত বললো, কেউ আপনাকে কখনো বলেনি, বিনা সাজগোজেও আপনাকে বেশ লাগে। শহুরে জাঁকজমকের বাইরের সবুজ প্রকৃতির কোলে নিকোনো মাটির ঘরের মত। পরিপাটি অথচ সাজসজ্জা বিহীন, একেবারে অকৃত্রিম।

আপনার মধ্যে আমার সব থেকে বেশি ভাললেগেছে কোন জিনিসটা জানেন?

দেবলীনা বললো, বলে ফেলুন, নিজের প্রশংসা তো ভগবানও পছন্দ করেন, আমি তো নিতান্ত মনুষ্য।

পজেটিভিটি, সব থেকে আকর্ষণ করেছে আপনার পজেটিভ মনোভাব। সাধারণত বাঙালী মধ্যবিত্ত মেয়েদের দেখা যায়, প্রেমে ব্রেকআপ ঘটে গেলে জীবন যেন থমকে যায়। তাকে ছাড়া আর কিছুই যেন করার নেই। এই যে আপনি নিজের মনের খোঁজ করতে, নিজের সাথে নিজে সময় কাটাতে একা একা বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছেন, এটার জন্যই আপনাকে আমি একশোর মধ্যে আশি দিয়ে

দিয়েছি। আর কুড়ি দিয়েছি আপনার রিয়ালাইজেশনের জন্য, সম্পর্ককে জোর করে ধরে রাখতে নেই, তাতে তার মাধুর্য হারায়, এটাই বলছিলেন না আপনি আপনার বন্ধুকে! এটার জন্য কুড়ি দিয়ে দিলাম।

দেবলীনা হাসিমুখে বললো, বলেন কি, আপনি তো বেশ দরাজ হস্ত আছেন। ভাগ্যিস স্কুল টিচার নন। তাহলে তো কিছু ছাত্র একশো তে একশো দশ পেত। আমি কিন্তু বেশ কড়া শিক্ষিকা। আমার হাতে এইটটি পেলে, সে বোর্ডের পরীক্ষায় অবশ্যই নাইনটি ফাইভ পাবেই। কিছু নম্বর আমি হাতে রেখেই দিই। তবে আপনাকে একটু বেশি নম্বরই দিয়ে ফেলেছি, এতটা দরাজ হওয়া হয়তো ঠিক হলো না।

দিগন্ত হেসে বললো, তাড়াতাড়ি বলুন, কত পেলাম। এবারে নামতে হবে। আপনার ব্যাগটা আমি নামিয়ে দিচ্ছি। সাবধানে নামবেন, মনে রাখবেন সারারাত আপনার ভালো জ্বর ছিল, জ্বর ছাড়লেও শরীরটা কিন্তু দুর্বল আছে। তাই বেড়াতে গিয়েও সাবধানে থাকবেন প্লিজ। বেশি দৌড়ঝাঁপ করবেন না।

দেবলীনা ফিসফিস করে বললো, আপনাকে নাইনটি দিয়ে ফেলেছি নিজের অজান্তেই।

দিগন্ত ব্যাগগুলো ট্রেনের দরজার সামনে নিয়ে যেতে যেতে বললো, ওই দেখুন, রাইকে ফোন করতে ভুলে গেছি, আজ হয়তো আমার কপালে দুঃখ আছে।

দেবলীনা চমকে উঠলো একটু। মনে পড়ে গেলো, দিগন্ত শুধুই রাইয়ের। ওকে নম্বর দেওয়ার অধিকার

একমাত্র রাইয়ের আছে।

ট্রেন থেকে ট্রলিটা নামিয়ে দিয়ে দিগন্ত বললো, একটু দাঁড়ান, আমি কলটা করে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দেবো।

দেবলীনা উদাস চোখে দেখছিলো দিগন্তকে। সৃজনও তো বহুবার বাইরে ট্যুরে গেছে, পৌঁছে, নিজের কাজ মিটিয়ে একটা মেসেজ করেছে—পৌঁছালাম। এভাবে কল করার জন্য তো কখনো উদগ্রীব হয়নি! মনে মনে আবার বললো দেবলীনা, রাই তোমায় যেন হিংসে না করে ফেলি আমি। ভেবেছিলাম দিগন্তর কাছে তোমার ছবি দেখবো, না থাক, তুমি থাকো তোমার দিগন্তর চোখে অনন্যা হয়ে। আমার কুনজর তোমার ওপরে না পড়াই ভালো। ভালো থেকো রাই, তোমার দিগন্তকে এভাবেই সামলে রেখো।

আবার ভাবনার জগতে চলে গেলেন? এই জন্যই আপনাকে কবিনী বলেছিলাম ম্যাডাম।

দিগন্ত ওর ট্রলিটা নিতে যেতেই দেবলীনা বললো, কাল থেকে আপনার ওপরে অনেক অত্যাচার করেছি, আর নয়। এবারে আমি চললাম আমার গন্তব্যে। আপনি যান আনন্দে ঘুরুন, আর আপনার পুচু সোনাকে কল করুন। নিজের ব্যাগটা টেনে নিয়ে দেবলীনা বললো, এই ট্রিপটা আমি সারাজীবন মনে রাখবো। মনে রাখবো এমন একজন সহযাত্রী পেয়েছিলাম, যে নিঃস্বার্থ ভাবে আমার উপকার করেছিল। ধন্যবাদের মত ফর্মাল শব্দ ব্যবহার করে আপনার উপকারকে ছোট করবো না।

এলাম দিগন্ত, ভালো থাকবেন আপনি আর আপনার রাই। নিজের ব্যাগটা নিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলো দেবলীনা। কয়েকঘন্টার পরিচয়ে দিগন্ত যে ওর মনের ওপরে বেশ ভালোই প্রভাব ফেলেছে, সেটা ও উপলব্ধি করতে পারছে। তাই পিছন ফিরে আর তাকাতে চাইছে না, ওর কোনোরকম দুর্বলতা যেন কিছুতেই প্রকাশ না পায় দিগন্তর সামনে।

দেবলীনার আকস্মিক ব্যবহারে হয়তো দিগন্ত কিছুটা বিহ্বল হয়েই বললো, বেশ আসুন, বেস্ট অফ লাক। এনজয় ইয়োর ট্রিপ।

দেবলীনা এগিয়ে এসেছে গাড়ি স্ট্যান্ডের দিকে। শরীরটা অল্প দুর্বল লাগছে, কিন্তু মনের মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি। সৃজনের সাথে ব্রেকআপের সময়েও বোধহয় এমন অনুভূতি হয়নি ওর। এই নতুন অনুভূতির সাথে দেবলীনা পরিচিত নয়। তবে মনে হচ্ছে খুব নিকট কাউকে হারিয়ে ফেললো ও। আরেকবার কি ছুটে যাবে ওদিকে? খুঁজে দেখবে দিগন্তকে, কোথায় চলে গেল ছেলেটা। এখন একা একা দার্জিলিংয়ে কোথায় যাবে ও। ম্যালের ওপরে হোটেল নেবে ঠিক করেছিল, অনলাইনে দেখেও রেখেছিলো, যদিও বুক করেনি। গিয়ে ঘর দেখে বুক করবে। এটা অফ-সিজন, তাই রুম পেতে অসুবিধা হবে না ভেবেই বুক করে নি। সবই তো চলছিল প্ল্যান অনুযায়ী, হঠাৎ দিগন্ত নামক নরম, মিষ্টি বাতাসটা এসে দেবলীনার সবকিছু কেমন এলোমেলো করে দিয়ে গেল যেন।

গাড়ির ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো, ম্যাডাম, কোথায় যাবেন? দার্জিলিঙের কোন হোটেল? অ্যাড্রেসটা দিন ম্যাডাম।

দেবলীনা অস্ফুটে বললো, দাঁড়ান, আমি আসছি।

।। ৭।।

দেবলীনাকে একা ছাড়াটা বোধহয় ঠিক হলো না। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে হাঁটতেই ভাবছিলো, হলেই বা ও রাইয়ের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাই বলে অসুস্থ একজন মহিলাকে এভাবে অপরিচিত জায়গায় একা ছেড়ে দেওয়াটা বোধহয় অন্যায়। তাছাড়া মেয়েটাকে বড্ড ক্লান্ত লাগছিলো। রাতে যখনই ঘুম ভেঙেছে ওর, তখনই দেখেছে দেবলীনা এপাশ-ওপাশ করছিল। তাছাড়া ওর মনটাও বেশ বিষণ্ণ হয়েই রয়েছে, সম্ভবত এর প্রধান কারণ ব্রেকআপ। যদিও দিগন্ত ব্রেকআপ কথাটাতে খুব একটা কম্ফোর্টেবল নয়। ওই ছোট্ট অনুভূতিহীন শব্দ দিয়ে হৃদয় ভাঙার যন্ত্রণা অনুভব করা সম্ভব নয়। ভালোবাসা হারানোর কষ্টটা তো নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার মত বেদনাদায়ক। তাকে ওই ঠুনকো ব্রেকআপ নামের প্রচণ্ড চলতি কথার ঘেরাটোপে রাখতে রাজি নয় দিগন্ত। ওর তো মনে হয় এ কষ্ট যে পেয়েছে একমাত্র সেই বোঝে। প্রাক্তনের সব স্মৃতি বয়ে নতুনের দিকে হাত বাড়াতে হয়। কারণ জীবন তো থেমে থাকে না, খুঁড়িয়ে হলেও এগোয়।

আর ওই চলন্ত জীবনের কাঁধে থাকে একটা পুরোনো ডায়রির ভার, যার পাতার রং হলুদ হয়ে গেলেও স্মৃতিগুলো ভীষণ রকমের জীবন্ত। তাই ভালোবাসা ভাঙার

কষ্টের পর নিজেকে আবার জীবন স্রোতে ফিরিয়ে আনতে গেলে যে লড়াইটা করতে হয় সেটা সত্যিই দুঃসাধ্য। দেবলীনা এখন সেই লড়াইয়ে নেমেছে। কাল অবধি যে ছিল ওর মনের মণিকোঠায়, আজ তাকেই ভুলতে হবে পণ করতে হয়েছে ওকে। এই মনেপড়ে যাওয়া আর ভোলার আপ্রাণ চেষ্টাতে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছে মেয়েটা। এই অবস্থায় ওকে অমন ভাবে একলা ছেড়ে দেওয়াটা বোধহয় অত্যন্ত অমানবিক একটা কাজ হলো। রাই জানতে পারলেও হয়তো কোমরে হাত দিয়ে বকবে দিগন্তকে। বলবে, আর কবে বড় হবে তুমি? মিনিমাম আক্কেল জ্ঞান নেই তোমার। ওর রাইয়ের বকুনিটা বড্ড মিষ্টি, যেন কোনো পাক্কা গিন্নী কোমর বেঁধে শাসন করছে তার বোকা-সোকা স্বামীকে। রাইয়ের কাছ থেকে পরে পারমিশন নিয়ে নিলেই চলবে।

আপাতত দেবলীনাকে খোঁজা দরকার, বেরিয়ে গেল নাকি গাড়ি নিয়ে! একাই গাড়ি বুক করলো নাকি শেয়ার গাড়ি নিলো? হন্তদন্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো দিগন্ত। বড্ড বোকার মত কাজ করে ফেলেছে, এত গল্প করলো মেয়েটার সাথে অথচ ওর ফোন নম্বরটাই নিতে ভুলে গেছে। দেবলীনা বোধহয় চেয়ে নিয়েছিল দিগন্তর নম্বর। কিন্তু দেবলীনারটা নেওয়া হয়নি। এই কারণেই ও সেই ছোট্ট থেকে বকুনি খেয়ে আসছে রাইয়ের কাছে। তবুও কোনো পরিবর্তন হলো না দিগন্তর স্বভাবের। আজও একইরকম অগোছালো থেকে গেল। ব্যাগপত্র নিয়ে

খোঁজাও তো মুস্কিলের কাজ। তাছাড়া দেবলীনা যদি গাড়ি বুক করে বেরিয়ে যায়, তাহলে তো হয়েই গেল।

বিরক্ত মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো দিগন্ত।

হঠাৎই পিঠে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করলো।

সঙ্গে পরিচিত গলায় কেউ বলে উঠলো, আমায় খুঁজছিলেন বুঝি? দিগন্ত ঘুরেই দেখলো, দেবলীনা রীতিমত হাঁপাচ্ছে। ওর চোখ দুটো টকটকে লাল, দৃষ্টিতে একটা চোরা ভয় নিয়েই ঠোঁটের কোণে ফিরে পাওয়ার হাসি। হাঁপাতে হাঁপাতেই বললো, আমি তো ভাবলাম আপনাকে হারিয়েই ফেললাম বোধহয়। ফোনেও ট্রাই করলাম, পেলাম না। দিগন্ত জলের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বললো, জল খান, হাঁপাচ্ছেন কেন? আর আমাকেই বা খুঁজছিলেন কেন? সেটার উত্তর জল খেয়ে নিয়ে দেবেন। দেবলীনার যেন খুব পিপাসা পেয়েছিলো, অথচ জল খেতে ভুলে গিয়েছিল, এভাবেই ঢকঢক করে প্রায় শেষ করে ফেললো জলের বোতলের জলটুকু।

তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললো, আমায় নিয়ে চলুন প্লিজ। আমার একা একা ভয় করছে। না ঠিক ভয় নয়, ভালো লাগছে না।

দিগন্ত একটু চিন্তিত মুখে বললো, কিন্তু আমি তো দার্জিলিং যাবো না। আমি যাব রা-বাংলা। ওখান থেকে ট্রেকিং করে যাবো অজানা কোনো পাহাড়ে।

দেবলীনা নিজের জিন্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেশ সাহসের সাথে বললো, আমিও ট্রেকিংয়ে যাবো। আমারও

কখনো যাওয়া হয়নি ট্রেকিংয়ে, তবে বন্ধুদের মুখে শুনেছি দারুণ থ্রিলিং একটা ব্যাপার।

দিগন্ত হেসে বললো, বুঝলাম। একা একা ঘোরার ভয়েই আপনি আমায় পাকড়াও করেছেন, তাই তো? দেবলীনা ঘাড় নেড়ে বললো, একদম ঠিক ধরেছেন। ভেবে দেখলাম, এক যাত্রায় পৃথক ফল করে লাভ নেই। চলুন, চলুন আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, আগে ব্রেকফাস্ট করে নিই, তারপর যাবো ওসব ট্রেকিংয়ে। না খেয়ে খালি পেটে কি যাওয়া যায়?

দিগন্ত দেখছিল দেবলীনাকে, কালকের গম্ভীর টাইপ, বিষণ্ণ মেয়েটা যেন কেমন পাল্টে গেছে সূর্যের কমলা রঙে। মুখটা একটু ক্লান্ত হলেও হাসিতে ঝলমল করছে। মেয়েটা এত হাসতে পারে বুঝি, কাল তো বোঝেনি দিগন্ত। দেবলীনা আবার বললো, বোঝো কাণ্ড, আমার কবি কবি ভাবটা দেখছি আপনার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে, সংক্রামক নাকি? খালি পেটে দাঁড়িয়ে কি এত ভাবছেন বলুন তো? আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে দোকান আবিষ্কার করে ফেলেছি। ওই ডানদিকে, এক বৌদি দারুণ কচুরি আর ঘুগনি বানাচ্ছে, গন্ধে আমার ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল, নেহাত আপনাকে খোঁজার তাড়া ছিল বলে খেতে পারিনি। চলুন আপনাকে আজ দেশি ব্রেকফাস্ট করাবো। ধুর মশাই, আসুন না, সাতপাঁচ ভাবার কিছু নেই। আমি আপনার প্রেমে পড়িনি, বন্ধুত্ব চেয়েছি শুধু। আপনার পুচু সোনা বকবে না আপনাকে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি ফোনে বলে দেব রাইকে, যে সারারাত আপনি আমার

মাথার কাছে বসে ছিলেন, আমার জ্বর বাড়ছে কিনা দেখার জন্য। আপনি বড্ড ভালো মানুষ।

দিগন্ত থমকে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি তো মশাই মারাত্মক মহিলা। নিজের ব্রেকআপ করে শান্তি হয়নি, আমারটাও করিয়ে ছাড়বেন! আপনি দার্জিলিং যাবেন, না কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদতলে বসবেন, তা আপনি বুঝুন, আমি চললাম। দেবলীনা হো হো করে হেসে বললো, আপনি দেখছি রাই সুন্দরীকে বেশ ভয় টয় পান। সে যাবেন ক্ষণ, আগে আপনার বৌদিভাইয়ের দোকানের কচুরিটা তো খেয়ে যান। দিগন্ত অবাক হয়ে বলল, আমার বৌদিভাই মানে? আমি তো তাকে চিনিই না।

না চিনলে কি আপন হয় না? কাল রাতের মহিলা যদি আপনার পিসিমণি হতে পারে, তাহলে এও আপনারই বৌদিভাই। আপনি সম্পর্ক দারুণ পাতাতে পারেন।

দিগন্ত মুচকি হেসে বললো, আপনি ঠিক রাইয়ের মত। রাইও এমন সরল ভাবে কথা বলে। আর সব সময় আমার লেগপুল করে।

দেবলীনা বললো, এক্সট্রা চার্জ লাগবে। এই যে রাইয়ের অনুপস্থিতিতে আপনি রাইয়ের ফ্লেভার পাচ্ছেন, তাই ওকে একটু কম কম মিস করেছেন, এ জন্য পুরো ক্রেডিট আমার। এইজন্য এক্সট্রা চার্জ লাগবে আমার।

দিগন্তর বেশ লাগছিলো এই সহজ শর্তবিহীন বন্ধুত্ব। কালকের অপরিচিত মেয়েটা যেন ওর কত চেনা।

বলে ফেলুন ম্যাডাম, কত ফিজ আপনার?

দেবলীনা বললো, প্রথমত আমায় ট্রেকিং করা শেখাতে হবে, দ্বিতীয়ত আমায় তুমি বলতে হবে, তৃতীয়ত এই ট্রিপের যাবতীয় খাবার খরচ আমার। ঘোরানোর দায়িত্ব আপনার।

দিগন্ত বললো, ওহ তার মানে আমার বৌদিভাইয়ের কচুরি খাইয়েই আপনি আমাকে রেহাই দেবেন না? গোটা ট্রিপটার চোদ্দটা বাজানোর জন্য পুরো প্ল্যান ছকে ফেলেছেন?

দেবলীনা ঘাড় দুলিয়ে হাসি মুখে বললো, সহযাত্রী হয়ে অসহায়, অবলা মহিলাকে আপনি এভাবে ফেলে দেবেন বলুন? আপনার পুচু সোনাও কিন্তু একজন নারী। ভেবে দেখুন, নারীর অবমাননা সে কিছুতেই মেনে নেবে না। পজেসিভনেস তখন ফেমিনিজিনমে বদলে যাবে। আপনার বিরুদ্ধে তৈরি হবে কড়া আইন।

দিগন্ত হেসে বললো, কবে থেকে করেন, স্কুল লাইফ থেকে, নাকি কলেজ লাইফে শুরু করেছেন?

দেবলীনা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বলল, কি করি?

ড্রামা কবে থেকে শিখছেন? সেটাই জানতে চাইলাম। আর আপনার আবিষ্কৃত বৌদিভাইয়ের দোকানটা কি জলপাইগুড়ির মধ্যেই, নাকি বাইরে?

আর শুনুন, কাল রাত অবধি অবলা শব্দটা আপনার পাশে বসলে আমি নিমরাজি হয়ে মেনে নিতাম, কিন্তু এখন কোনোভাবেই মানতে পারবো না। আপনারা মহিলারা যদি নিজেদের অবলা বলেন, তাহলে তো আমাদেরকে মুক, বধির বলতে হয়।

দেবলীনা বললো, প্রথমত আমায় ট্রেকিং করা শেখাতে হবে, দ্বিতীয়ত আমায় তুমি বলতে হবে, তৃতীয়ত এই ট্রিপের যাবতীয় খাবার খরচ আমার। ঘোরানোর দায়িত্ব আপনার।

দিগন্ত বললো, ওহ তার মানে আমার বৌদিভাইয়ের কচুরি খাইয়েই আপনি আমাকে রেহাই দেবেন না? গোটা ট্রিপটার চোদ্দটা বাজানোর জন্য পুরো প্ল্যান ছকে ফেলেছেন?

দেবলীনা ঘাড় দুলিয়ে হাসি মুখে বললো, সহযাত্রী হয়ে অসহায়, অবলা মহিলাকে আপনি এভাবে ফেলে দেবেন বলুন? আপনার পুচু সোনাও কিন্তু একজন নারী। ভেবে দেখুন, নারীর অবমাননা সে কিছুতেই মেনে নেবে না। পজেসিভনেস তখন ফেমিনিজিনমে বদলে যাবে। আপনার বিরুদ্ধে তৈরি হবে কড়া আইন।

দিগন্ত হেসে বললো, কবে থেকে করেন, স্কুল লাইফ থেকে, নাকি কলেজ লাইফে শুরু করেছেন?

দেবলীনা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বলল, কি করি?

ড্রামা কবে থেকে শিখছেন? সেটাই জানতে চাইলাম। আর আপনার আবিষ্কৃত বৌদিভাইয়ের দোকানটা কি জলপাইগুড়ির মধ্যেই, নাকি বাইরে?

আর শুনুন, কাল রাত অবধি অবলা শব্দটা আপনার পাশে বসলে আমি নিমরাজি হয়ে মেনে নিতাম, কিন্তু এখন কোনোভাবেই মানতে পারবো না। আপনারা মহিলারা যদি নিজেদের অবলা বলেন, তাহলে তো আমাদেরকে মুক, বধির বলতে হয়।

দেবলীনা মুচকি হেসে বললো, ওই যে উনিই ঠাকুরপোকে ডাকছেন। চলুন, চলুন ভিতরে বেঞ্চে গিয়ে বসি।

দিগন্ত কচুরিতে কামড় দিয়েই বললো, বৌদিভাই, আপনার কতদিনের দোকান? এটা কি আপনি একাই সামলান?

দেবলীনা দেখছিল মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষটাকে। সাবলীল ভাবে মিশে যেতে পারে সকলের সাথে। বয়েসের পার্থক্য, ফ্যামিলি স্ট্যান্ডার্ড এসব যেন বড় তুচ্ছ ওর কাছে। মানুষ কত সাধারণভাবেও আনন্দ পেতে পারে, সেটা যেন শিখিয়ে দিয়ে যায় দিগন্তর জীবনবোধ। দেবলীনা যে কেন বারবার সৃজনের সাথে তুলনা করে ফেলছে দিগন্তর, সেটা ও নিজেও জানে না। সৃজনকে ও ছেড়ে এসেছে বা ভেঙে গেছে ওদের সম্পর্কটা, যেখানে আর ফিরতে চায় না ও। আর দিগন্ত শুধুই রাইয়ের। তাই দুজনের কেউই যখন ওর হবে না, তখন কেন বারবার এদের মধ্যে তুলনা টানছে কে জানে! কেন মনে হচ্ছে, সৃজনের পরিবর্তে যদি দিগন্তর সাথে দেখা হতো ওর, তাহলে হয়তো ভালোবাসা শব্দের অর্থ অন্যরকম হতো ওর কাছে। হয়তো দেবলীনাও রাইয়ের মত আগলে রাখতে চাইতো মানুষটাকে। যার কাছে ভালোবাসা মানে ডিস্কো ঠেক, ওয়েস্টার্ন ড্রেস আর আভিজাত্যের অহংকার নয়। এমন মানুষটাকে কেন দেবলীনা পেলো না!

কি হলো, খাচ্ছেন না কেন? আপনি কি ডিরেক্ট নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেকিং করবেন ভেবেছেন? এখান

থেকে গাড়িতে যেতেই তো মিনিমাম ঘন্টা পাঁচেক। কচুরি হাতে বসে না থেকে তাড়াতাড়ি করুন।

দেবলীনা শান্ত গলায় বলল, আপনাকে বেশ বিপদে ফেললাম, তাই না?

দিগন্ত সবজে রঙের প্লাসটিকের জগের জলে হাতটা ধুয়ে বললো, এবারে পড়েছি ভীষণ বিপদে, একটু আগেই বন্ধুত্বের শর্তে রাজি হলাম, এখন আবার নানা রকম ফরম্যালিটিস করছেন! খাওয়ানোর দায়িত্ব যখন আপনার তখন বৌদিভাইকে পেমেন্ট আপনিই করুন। আমি একটা গাড়ি বুক করি...দিগন্ত দু পা এগোতেই দেবলীনা বললো, দাঁড়ান একসাথেই যাবো।

দিগন্ত মুচকি হেসে বললো, চিন্তা নেই, আপনাকে কলকাতার বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়েই বন্ধুত্বের শর্তপূরণ করবো। তার আগে পালাবো না।

রা-বাংলা অবধি একটা গাড়ি বুক করতেই দেবলীনা বললো, এটা কিন্তু দুজনে শেয়ারে দেব। দিগন্ত জানালার বাইরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে বলল, বেশি হিসেবে করবেন না। যারাই বেশি হিসেব করে জীবন চালাবে ভাবে, তাদের জীবনটাই বড্ড এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে যায়। তাই মুহূর্তগুলোকে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করুন। দেখবেন, জীবনটা অনেক সহজ। মান-সম্মান, ইগোর লড়াই, ঐতিহ্য, আভিজাত্যের দম্ভ সব কিছুর সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসে দেখুন, একটা স্ট্রেইট লাইন অপেক্ষা করে আছে আপনার জন্য। যেখানে কোনো জটিলতা

নেই। বন্ধুত্বের সংজ্ঞা সেখানে টিফিন বেলার ঘন্টা পড়ার মতোই স্বাভাবিক।

দেবলীনা বহুদিন পরে আবার প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলো। মাকে কল করে বললো, খুব ভালো আছি, একদম টেনশন করো না। যখন ফিরবো তোমার আগেকার লীনা হয়েই ফিরবো।

ওর কথা শেষ হতেই দিগন্ত বললো, পাল্টে গিয়েছিলেন বুঝি? তো এই কদিন নতুন বন্ধুত্বের খাতিরে আগেকার লীনাকে কি দেখার সৌভাগ্য হবে আমার?

দেবলীনা হাসি মুখে বললো, ঘাড় থেকে যখন নামাতে পারেন নি, তখন আমার সব বদভ্যেস দেখবেন বৈকি।

দিগন্ত জোর করে নিজেকে শাসন করে মনে মনে বললো, উঁহু এই মেয়েটার প্রতি দুর্বল হলে কিছুতেই চলবে না। রাইয়ের কাছে মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন হয়ে যাবে তাহলে। কেন কে জানে, কাল থেকেই দেবলীনাকে যতবার দেখছে, ততবার মনে হচ্ছে ঠিক যেন রাই। এত মিল ওর সাথে রাইয়ের স্বভাবের, যে মিশিয়ে ফেলছে দিগন্ত। ফিসফিস করে নিজের মনেই বললো, রাই, দিগন্ত শুধুই তোমার থাকবে।

।। ৮।।

তারপর বলুন দেখি এত উদাস হয়ে কি ভাবছিলেন? অবশ্য বিশাল পাহাড়ের সামনে মানুষ যে ঠিক কতটা নগণ্য, সেটা ভাবতে গেলে উদাস হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

রা-বাংলার ছোট্ট ব্যালকনির মত ছাদের বেতের চেয়ারে বসেছিলো দেবলীনা। ওর ঘরের লাগোয়া এই ব্যালকনিটা। যদিও এটা এদের হোটেলের তিনতলার কমন ব্যালকনি, তবুও অফ সিজন বলেই হয়তো লোকজন তেমন নেই হোটেলে। দিগন্ত অনেক চেষ্টা করেও পাশাপাশি দুটো রুম বুক করতে পারেনি। কারণ ওর রুম বুক করাই ছিল। তাই দুটো রুম পরে দেবলীনার রুমটা পাওয়া গেছে। একই ফ্লোরে তাই অসুবিধা কিছুই নেই। ও এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, পাশের রুমের বোর্ডারদের দেখলেন নাকি? আমি কাল থেকে ওদিকের একটা কাপেল ছাড়া আর কাউকেই দেখিনি। দেবলীনা ঘাড় নেড়ে বললো, এরা বোধহয় আজ আসবে। সকালে ঘর দুটো ওয়াশ হচ্ছিল দেখলাম।

বললেন না তো, সৃজনের সাথে কি ভাবে আলাপ হয়েছিল? দিগন্ত চায়ের কাপ হাতে সামনের চেয়ারে বসে পড়লো। দেবলীনা বললো, বলতে পারেন সিনেমার মত করেই পরিচয় হয়েছিল আমার সাথে সৃজনের। মডেলিং করেছিলাম ওদের গোল্ড এমপরিয়াম কোম্পানির হয়ে।

তখনই আমায় দেখে নাকি সৃজন প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। প্রথম দর্শনেই প্রেম বুঝলেন।

দিগন্ত হেসে বললো, এতে আমি সৃজনবাবুর তেমন দোষ দেখি না। প্রথম দর্শনে প্রেমে আমিও বিশ্বাসী। কি বলুন তো, যাকে দেখে মনের মধ্যে একটা অন্যরকম অনুভূতির সঞ্চার হবে, মনে হবে এরকম অনুভূতি তো

আগে কখনো হয় নি, ইন্দ্রিয়রাও বিদ্রোহ করে বলবে, এই সে। তখনই বোধহয় ঘটে লাভ অ্যাট ফার্স সাইট।

দেবলীনা নরম গলায় বলল, আর কিছুদিন পরেই যখন বুঝবেন দুজনের মানসিকতায় বিস্তর ফারাক, তখন কি করবেন? যখন বুঝবেন ভালোবাসাটা ধীরে ধীরে হারিয়ে গিয়ে লোকদেখানো ভদ্রতা বা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার দায়ে পরিণত হয়েছে, তখন কি করবেন?

দিগন্ত বললো, শান্ত ভাবে বেরিয়ে আসবো অর্ধমৃত সম্পর্কের বেড়াজাল থেকে।

দেবলীনা করুণ হেসে বললো, সেটাই তো করলাম আমরা। মিউচ্যুয়াল ব্রেকআপ বলতে পারেন, মিউচ্যুয়াল ডিভোর্সের মতই। দুজনের সম্পূর্ণ মত নিয়ে বিচ্ছিন্ন হলাম। কিন্তু মুশকিল কি বলুন তো, কিছুতেই ভুলতে পারছি না ফেলে আসা মুহূর্তগুলোকে। তাই নিজের সাথে চলছে অহরহ দ্বন্দ্ব। যন্ত্রণাগুলো কিছুতেই জমাট বাঁধছে না যে, এখনও তরল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রক্তবাহী শিরা, উপশিরা দিয়ে।

দিগন্ত হালকা গলায় বলল, জোর করে ভুলে থাকার চেষ্টাই বা করছেন কেন? কে বলেছে, প্রাক্তন মানেই তার সবটা খারাপ, তাকে ভুলতে হবে? ছোটবেলার সব স্মৃতি কি ভুলে গেছেন? স্কুলের বেস্টফ্রেন্ডকে একেবারেই ভুলে গেছেন কি?

মনে নিশ্চয়ই আছে, দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে, তাই ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে গেছে তার স্মৃতি, তাই না? যখন অন্য স্কুলে চলে গেলেন, তখন কি জোর করে তাকে ভুলতে

চেয়েছিলেন? বরং মনখারাপ হয়েছিলো, তারপর আস্তে আস্তে স্মৃতির পাতাগুলো ধূসর হয়ে গিয়েছিল। জোর করে ভুলতে চাইবেন না, তাহলে আরও বেশি করে মনে পড়বে তাকে। সময় দিন, ধূসর হতে একটু সময় তো লাগবেই।

দেবলীনা দিগন্তর হাতটা নরম করে ধরে বলল, থ্যাংক ইউ বলবো না, শুধু বলবো, সঠিক সময়ে এভাবে পাশে দাঁড়ালেন, এর জন্য আপনাকে দিলাম ওই দূরের পাহাড় চূড়ার মাথায় জমে থাকা একমুঠো সোনালী বরফ। দেখুন, সূর্যের আলো পড়ে বরফটা কেমন সোনার মত লাগছে। দিগন্ত দেবলীনার হাত থেকে নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললো, এবারে কিন্তু সত্যি আমার পুচু সোনা রাগ করবে। আমি একজন সুন্দরী মহিলার হাত ধরে বসে আছি জানলে রেগে আগুন হবে। দেবলীনা হেসে বললো, জানি, আপনি শুধুই রাইয়ের। কিন্তু ওই যে বললেন, মুহূর্তটুকুকে নিয়ে বাঁচতে, তাই স্পর্ধা দেখিয়ে ফেলেছিলাম।

আরে কি মুশকিল, আপনি কথায় কথায় এত সিরিয়াস কেন হয়ে যাচ্ছেন বলবেন? চলুন, রেডি হয়ে নিন। আমি পাহাড়ে চরবো, এখানের লোকাল ট্রেকিং সেন্টারের সাথে কথা বলে রেখেছি। ওরা হেল্প করবে। আপনি নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন। দেবলীনা মুখ ভেঙচে বললো, কেন আমি কি ভীতু না বাচ্চা, যে আমি নিচে দাঁড়িয়ে থাকবো? আমিও চরবো পাহাড়ে।

দিগন্ত একটু হেসে বললো, ও ম্যাডাম, এটা পাহাড়ে ওঠার কথা হচ্ছে, আপনার ফ্ল্যাটের লিফট দিয়ে পাঁচ তলায় ওঠার কথা হচ্ছে না।

দেবলীনা আর কথা না বাড়িয়ে নিজের রুমে ঢুকতে ঢুকতে বললো, আমি ট্রেকিং করার মত ড্রেস পরে রেডি হয়ে নিচ্ছি। বাই দ্য ওয়ে, আমরা কোন পাহাড়ে উঠবো?

দিগন্ত ওর অ্যাটিটিউড দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, সত্যিই যাবেন নাকি? কি যন্ত্রণা, আর পাহাড়ের নাম জেনে কি করবেন, ফেসবুকে আপডেট দেবেন?

দেবলীনা ঘাড় বেঁকিয়ে বললো, ওয়েট, আমি রেডি হয়ে আসছি।

।। ৯।।

গাড়িটা এসে থামলো রঙ্গীত নদীর ধারে। দিগন্ত বললো, জানেন এখানে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারী মাসে এলে গরম জলের ধারা দেখা যায়। আর আগস্টে এলে এদের স্থানীয় উৎসবে সামিল হওয়া যায়। পাহাড় আমায় বড্ড টানে, তাই মাঝে মাঝেই ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি পাহাড়ের খোঁজে। পাহাড়ের একটা অদ্ভুত রহস্যময়তা আছে, একটু আগেও বোঝা যায়না পরের বাঁকে আপনার জন্য কি অপেক্ষা করছে। এদিকে হয়তো কুয়াশা রানী তার ঘন আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছে কোলের সন্তানকে, আবার ওদিকে দামাল বাচ্চারা সূর্যের প্রখর রোদে লাফালাফি করে খেলছে। তাই সবটাই বড্ড রহস্যে মোড়া।

দেবলীনা রঙ্গীত নদীর স্বচ্ছ জলের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার আরেকটা শর্ত আপনি কেন মানলেন না, সেটাই তো আমার কাছে রহস্য। বলেছিলাম, আমায় তুমি বলুন, সেই আপনিতেই রয়ে গেলেন।

দিগন্ত হাসি মুখে বললো, সম্বোধনে কি আসে যায়! আমি রাইকে ছোটবেলায় তুই বলতাম। তারপর যখন ওর প্রেমে পড়লাম, তখন ওর আব্দারে ওকে তুমি বলা অভ্যেস করতে হয়েছে অনেক কষ্টে।

দেবলীনা একটু বিরক্ত হয়েই বললো, প্রতি মুহূর্তে রাইকে উদাহরণ হিসেবে না টানলেও আমি বুঝতে পারি আপনার সব কথাই। চলুন, আমিও পাহাড়ে উঠবো।

আমরা কোন পাহাড়ে উঠবো? দিগন্ত বললো, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাব্রু, পান্ডিম হলো এই শহরের প্রতিবেশী পর্বত শৃঙ্গ। এদের চূড়াগুলো বরফে ঢাকা থাকে। পান্ডিমের কিছুটা ওপরে আমরা উঠবো ঠিক করেছি, সবটা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার না ওঠাই ভালো। দেবলীনা গম্ভীর ভাবে বললো, কেন রাই কখনো আপনার সাথে ট্রেকিং করেনি বলেই কি চাইছেন না, যে এই অভিজ্ঞতা আপনার সাথে আমার প্রথম হোক?

দিগন্ত বেশ বুঝতে পারছিল দেবলীনা ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। মনে মনে বললো, না কিছুতেই না, দেবলীনাকে কিছুতেই আর কাছে আস্তে দেওয়া যাবে না।

মেয়েটা সবে মাত্র কষ্টগুলো থেকে রিলিফ পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, হয়তো দিগন্তকে সামনে পেয়ে খড় কুটোর মত আঁকড়ে ধরতে চাইছে, কিন্তু মেয়েটাকে আর যন্ত্রণা পেতে দিতে পারে না ও। দেবলীনা সত্যিই বড্ড ভালো মেয়ে। পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে যদি ওকে কেউ জিজ্ঞেস করে, পাহাড়কে সাক্ষী রেখে সত্যি করে বলতো, দেবলীনাকে এক মুহূর্তের জন্যও তোমার ভালো লাগে

নি? তাহলে অস্বীকার করার মত মনের জোর ওর অবশিষ্ট নেই। দেবলীনা ভালোলাগার মতই মেয়ে। আর সেই জন্যই চিন্তা হচ্ছে ওকে নিয়ে, কিছুতেই যেন মেয়েটা ওর কাছ থেকে কোনোরকম দুঃখ না পায়।

দিগন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে মজার ছলেই বললো, দেখবেন, পাহাড়ে চড়তে গিয়ে পা ভেঙে বাড়ি যাবেন না যেন, তাহলে আপনার বাবা আমার নামে কেস করবে।

দেবলীনা বললো, চিন্তা করবেন না, যা করবো নিজের দায়িত্বে করবো। দিগন্ত বেশ বুঝতে পারছিল, দেবলীনা ওর ইগনোরেন্সটাকে মেনে নিতে পারছে না, কিন্তু দিগন্ত নেহাতই নিরুপায়।

দেবলীনা কথা না বলে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। গাড়িতে বসেও বেশি কথা বলছিল না ও। দিগন্ত চেষ্টা করছিল পরিবেশটাকে সহজ করার, কিন্তু ও কিছুতেই আর সহজ ভাবে হাসতে পারছিল না। দিগন্তর বলা অনেক কথার উত্তরে দু একটা হুঁ, হ্যাঁ ছাড়া চার ঘন্টার পথে তেমন কথাই হলো না ওদের।

বোরং থেকে পান্ডিমের পাদতলের দিকে চলেছে ওরা। পান্ডিমের সামনেই হয়েছে ট্রেকিং ক্যাম্প। সারাবছরই এখানে ট্রেকিংয়ের ভিড় থাকে। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় বাঙালির সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। গাড়ি থেকে নামার সময় দিগন্ত দেখলো, দেবলীনা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর কপালের ওপরে এক গুচ্ছ চুল এসে পড়েছে। আড়াল করে রেখেছে ওর দুই ভ্রূর মাঝের ছোট্ট কালো টিপটাকে। নাকের হিরের ফুলটা সকালের রোদ পড়ে ঝিকমিক করে

উঠলো। দিগন্ত সব ভুলে নির্নিমেষ তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। দেবলীনার থুতনির ভাঁজে একটা অদ্ভুত দৃঢ় অথচ আদুরে ভঙ্গিমা আছে। যখন ও গম্ভীর হয়ে যায় তখন থুতনির ভাঁজের দৃঢ়তা বলে দেয়, মেয়েটা প্রয়োজনে কঠিন হতে জানে। আবার যখন আব্দার করে কিছু চায়, তখন ওই কঠিন হওয়া ভাঁজটাই আদুরে ভঙ্গিমায় একমুঠো আদর চায় যেন। ট্রাকসুট টাইপের ডার্ক ব্লু একটা সেট পরেছে দেবলীনা। বোধহয় ট্রেকিং করবে বলেই। দিগন্ত মুচকি হেসে বললো, থাক ঘুমুক, ডেকে কাজ নেই। মাথার পোকাটা নড়লেই মুশকিল। শেষে হাত, পা ভেঙে পড়ে থাকবে। দিগন্ত পিছন ঘুরতেই গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লো দেবলীনা, আলতো করে বললো, ঘুমন্ত আমার দিকে তাকালে বুঝি আপনার রাই কিছু বলবে না? তা আমায় না ডেকে চলে যাচ্ছিলেন যে বড়?

দিগন্ত একটু লজ্জা পেয়ে বললো, আপনি একটু ওয়েট করুন, আমি রাইকে একটা কল করে উঠবো পাহাড়ে। এতক্ষণ ফোন সুইচ অফ থাকলে ও টেনশন করবে। দেবলীনাকে আবার যেন সজোরে পাথুরে মাটিতে আছড়ে ফেললো দিগন্ত। বুঝিয়ে দিলো, ওর ওপরে শুধুই রাইয়ের অধিকার। দেবলীনাও চায়না দিগন্তর জীবনে ওর জন্য কোনোরকম ঝড় নেমে আসুক। দিগন্ত ওর দিকে যে ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তারপর ওর দ্বারা কোনো ক্ষতি হলে, নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না দেবলীনা। সব জানা সত্ত্বেও অবুঝ মনটা কেন যে বারবার দিগন্তকে আপন করে পেতে চাইছে, সেটা ও নিজেও জানে না।

কেন যে অদেখা রাইকে মনে মনে হিংসে করছে সেটাও বুঝতে পারছে না। সৃজনের সাথে ওর প্রায় তিনবছরের সম্পর্ক ছিল, কখনো তো এমন অনুভূতির সম্মুখীন হয়নি ও। এমন তোলপাড় করা ঝড় কোনোদিন তো ওঠেনি ওর মনের অন্দরে। দিগন্তকে পিছনে ফেলেই ও এগিয়ে গেলো ক্যাম্পের দিকে। জীবনে কোনোদিন ভাবে নি ও ট্রেকিং করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত জেদ কাজ করছে ওর মধ্যে। ও দিগন্তকে দেখিয়ে দেবে, রাই যা পারেনি, ও সেটা পেরেছে। কারণ ছাড়াই এ ভ্রান্ত লড়াইয়ে সামিল হয়ে গেছে দেবলীনা। ট্রেকিংয়ের জিনিসপত্র বুঝে নিচ্ছিলো দেবলীনা। তখনই দিগন্ত এসে বেশ গম্ভীর গলায় বলল, একা আগে আগে উঠবেন না, ঠিক আমার পিছনে থাকবেন। আপনার পিছনে থাকবে ওই ব্লু জ্যাকেটের ছেলেটি। কোনো সমস্যা হলেই আমাদের দুজনকে ডাকবেন, অবাধ্য হবেন না প্লিজ। দেবলীনা অল্প হেসে বললো, বাধ্য আর হতে পারলাম কোথায়, চিরকালের অবাধ্য হয়েই যে রয়ে গেলাম।

।। ১০।।

হাতের চেটোতে অসম্ভব ব্যথা হয়েছে দেবলীনার। হাঁটুটাও বোধহয় একটু ছড়েছে। তবুও হার স্বীকার করেনি ও। দিগন্তর পিছন পিছন একবারও আঃ উঃ না করেই উঠেছে ওদের লক্ষ্য পর্যন্ত। তবে নামার সময় ওর ক্লান্ত মুখটা দেখেই বোধহয় বারবার নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছিল দিগন্ত। না, জেদ করেই দেবলীনা ধরেনি ওর হাত। হেসে বলেছে, আপনার রাই সুন্দরী রাগ করবে।

আমি ম্যানেজ করে নেব। নামার সময়েই একবার পা হড়কেছিল দেবলীনার, দিগন্ত প্রায় চিৎকার করে বলেছিল, হাতটা ধরো, বলেছিলাম না, অবাধ্য হবে না। কথা শোনো দেবলীনা প্লিজ। এটা ছেলেমানুষি করার জায়গা নয়। দেবলীনা পাহাড়ের দুর্গম রাস্তা, কাছের আকাশ আর এবড়োখেবড়ো পাথরকে সাক্ষী রেখে চেপে ধরেছিল দিগন্তকে। মনে মনে বলেছিল, আর কেউ আসবে না আমার জীবনে। আজকের এই মুহূর্তটুকুকে নিয়েই বাঁচবো আমি। এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া হয়ে থাকবে। এক হেঁচকা টানে দিগন্তর বুকের কাছে মুখ রেখেছিলো ও। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাসের উত্তাপে নিজেকে শান্ত করেছিল দেবলীনা। মনে মনে বলেছিল, সব পাওয়ার নামই শুধু ভালোবাসা নয়, হারিয়েও পূর্ণ হওয়ার নাম ভালোবাসা। যেমন দিগন্তকে কোনোদিন নিজের করে পাবে না জেনেও ভালোবাসতে আর বাধা নেই দেবলীনার। রাই আর দিগন্ত ভালো থাক, কিন্তু ওর একতরফা ভালোবাসার অধিকার তো দিগন্ত কখনো কেড়ে নিতে পারবে না, তাই আজ থেকে দিগন্ত ওরও।

কানের কাছে ফিসফিস করে দিগন্ত বললো, প্লিজ বি কেয়ারফুল। এখুনি একটা বিপদ ঘটে যেত। আমার হাত ধরে নামো তুমি। দেবলীনা আদুরে গলায় বলল, আমার তৃতীয় শর্তটাও তুমি মেনে নিলে তাহলে। সব প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা আমি। আরেকটু থাকি এই পাথরের খাঁজে, এই সবজে ধূসর পাথরটা আমাকে অনেক কিছু দিলো যে। মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়ে জীবনের মন্ত্র

শেখালো, ভালোবাসা শব্দের মানে বোঝালো। আরেকটু থাকি দিগন্ত প্লিজ।

দিগন্ত আরক্ত মুখে বললো, দেবলীনা এভাবে আমায় দুর্বল করে দিও না। আমি রাইয়ের কাছে কথা দিয়েছিলাম, ওকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসবো না। দেবলীনা বললো, কে বলেছে তোমায় প্রতিশ্রুতি ভাঙতে? কিন্তু তোমার আর তোমার রাইয়ের কোনো ক্ষমতাই নেই আমার কাছ থেকে এই অধিকারটাও ছিনিয়ে নেবে!

দিগন্ত খুব সাবধানে হাতটা ধরে ধরে ওকে নামিয়েছিল। দেবলীনা বুঝেছিলো, এই অনুভূতিকেই বলে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও পরিপূর্ণ হওয়া। দেবলীনা আজ পরিপূর্ণ। সৃজনের সাথে ব্রেকআপের দুঃখ নেই, দিগন্তকে নিজের করে পাওয়ার আগ্রাসী বাসনা নেই, তবুও ওর সব আছে। ভালোবাসা শব্দের ম্যাজিক্যাল উপলব্ধি আছে ওর মনের গোপন কুঠুরিতে। নীল আকাশ আর অহংকারী পাহাড়কে সাক্ষী রেখেই ও প্রতিজ্ঞা করলো, তুমি ছাড়া এই হাত আর কেউ ছোঁবে না দিগন্ত। এই মনের দরজায় আর কাউকে প্রবেশ করতে দেব না আমি। নিজের ঘরে বসে সকালের অভিজ্ঞতার কথা ভাবছিলো দেবলীনা। শরীরে অসহ্য ব্যথা সত্ত্বেও ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। দরজায় নক করছে কেউ। উঠে দরজাটা খুলতেই একটা ওষুধ হাতে দিয়ে দিগন্ত বললো, খেয়ে নিও, ব্যথা থাকলে কমে যাবে। তোমার ফেরার টিকিট যেন কবে?

দেবলীনা জোরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, তোমার একদিন আগেই। আর মাত্র কালকের দিনটা জ্বালাবো

তোমায়। তারপর হারিয়ে যাব তিলোত্তমার জন সমুদ্রে। তবে তুমি নিমন্ত্রণ না করলেও, তোমার আর রাইয়ের সাথে দেখা করতে আমি ঠিক একদিন পৌঁছে যাবো তোমাদের বাড়ি। এই দিগন্ত, তোমাদের বাড়ির অ্যাড্রেসটা দিলে না তো? আর রাইয়ের নম্বরটাও দাও, তার কাছেও আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ, অন্তত একবার ফোন করে থ্যাংকস জানাতে চাই।

দিগন্ত দীর্ঘশ্বাসটা গোপন না করেই বললো, আমাদের পরিচয়টা বোধহয় এখানেই শেষ হলে ভালো হয়।

দেবলীনা আবার আদুরে ঢঙে বললো, বিশ্বাস করতে পারছো না আমায়, তাই তো? ভাবছো নিজের স্বার্থের জন্য ভেঙে দেব তোমাদের জন্মমুহূর্ত থেকে তৈরি হওয়া সম্পর্কটাকে! আরে না দিগন্ত, আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

দিগন্ত বললো, বেশ নোট করে নাও তবে। কিন্তু ফোন না করলেই আমি খুশি হবো। রাই বড্ড অবুঝ, শেষে ভুল না বুঝে বসে। তবে তোমাকে অবিশ্বাস করিনা বোঝাতেই দিলাম নম্বরটা। আমার বাড়ির অ্যাড্রেস তো আগেই বলেছি, সুযোগ হলে এসো একদিন।

দেবলীনা বললো, দেখো জানালা দিয়ে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে কেউ খেলনা বাড়ি দিয়ে ঝুলন সাজিয়ে রেখেছে। আর ঝুলনের বাড়িগুলোতে এখন একটা করে প্রদীপ জ্বলছে। আচ্ছা দিগন্ত, ঝুলন শেষ হলে আমরাও তো যে যার নিজের নিজের খেলনা গুছিয়ে বাড়ি ফিরতাম। ভেঙে যেত সাজানো শহরটা। পড়ে থাকতো

কাঠের গুঁড়ো, বালি, ঘাসের চাঁই। কিন্তু কতটা জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল ঝুলনের শহর সেটা বেশ বোঝা যেত। একটা দাগ থেকেই যেত তাই না!

যতদিন না বৃষ্টি হতো ততদিন রয়ে যেত ঝুলন সাজানোর চিহ্ন। ধরো কোনোদিনও নামলো না বৃষ্টি, তাহলে তো ওই দাগ রয়েই যাবে, তাই না? আমি যদি রাবাংলার এই স্মৃতিটুকুকে আঁকড়ে ধরে রাখি, যদি ধুয়ে যেতে না দিই চোখের নোনতা জলে, তাহলেও কি তোমার আপত্তি থাকবে? থাকলেও আমি অপারগ দিগন্ত। বিশ্বাস করো, আমি নিরুপায়।

দিগন্ত চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বললো, ভালো থেকো দেবলীনা। হয়তো দেখা হবে না আর কোনোদিন, তবু তুমিও থাকবে ঝুলন শেষ হওয়া ভাঙা চিহ্নের মধ্যে।

দিগন্তর চোখ দুটো ছলছল করছে, সেদিকে অপলক তাকিয়ে আছে লীনা। প্রাপ্তি, এই তো ওর প্রাপ্তি। দিগন্তর চোখের কোণে জমে থাকা ওই বিন্দুমাত্র বাষ্পটা অন্তত রাইয়ের জন্য নয়, ও নিশ্চিত ওই বাষ্পটুকু শুধুই ওর, একান্তভাবেই ওর।

পরের দিন ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই দিগন্তকে আর দেখতে পেল না দেবলীনা। রিসেপশনে বললো, খুব ভোরে উঠে গাড়ি চেয়েছিলেন উনি। তারপর বেরিয়ে গেছেন বোরং-এর দিকেই। দেবলীনা নিজের মনেই হেসে বললো, সেকি দিগন্ত, শেষ পর্যন্ত পালাতে হলো তোমাকে আমার কাছ থেকে! পাছে দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেল, পাছে অপমান করে ফেল তোমার রাইয়ের ভালোবাসাকে।

মনে মনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলো দেবলীনা। রাইয়ের প্রতি এতটা গভীর ভালোবাসা দেখে সত্যিই দিগন্তর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো ওর। যাক এতদিন পরে অন্তত এমন একটা মানুষের সান্নিধ্য পেল, যাকে সর্বস্ব উজাড় করে ভালোবাসা যায়, অন্তত অপাত্রে দান করা হবে না। দুহাত ভরে ওর অনুভূতিদের আপন করে না নিক দিগন্ত, ওর তো দিতে কোনো বাধা নেই। বন্ধ থাকুক দিগন্তর মুঠো, পড়ে যাক অনামি রাস্তার ধারে, তবুও দেবলীনার দিয়েই শান্তি।

বেশ সন্ধে করে হোটেলে ফিরল দিগন্ত। এসেই হালকা গলায় বলল, তোমার প্যাকিং কমপ্লিট?

দেবলীনা একটা শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তি ওর হাতে দিয়ে বললো, একটা ছোট্ট গিফট তোমাদের দুজনের জন্য। আমি কাল ভোরেই বেরোবো দিগন্ত, হয়তো তোমার সাথে দেখা হবে না। একটাই অনুরোধ করবো, আমায় মনে রেখো না। গুড নাইট দিগন্ত।

বুদ্ধ মূর্তিটা হাতে নিয়ে চলে গেল দিগন্ত। দেবলীনা ঝাপসা চোখে তাকিয়ে ওর চলে যাওয়ার মুহূর্তটুকুকে দেখছিলো। মনে হচ্ছিল, একটা দ্রুতগামী ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। দেবলীনার ধরার কথা ছিল ট্রেনটা, কিন্তু অনেক দৌড়েও ধরতে পারলো না। চুপচাপ কাঠের চেয়ারে বসে ট্রেনের ঝমঝম আওয়াজটা শুনলো, আর চলে যাওয়া দেখলো।

।। ১১।।

দিগন্ত আশা করেছিল, দেবলীনা যাওয়ার সময় দেখা করে যাবে। কিন্তু রিসেপশনের মেয়েটি জানালো, ম্যাডাম তো ঘন্টাখানেক আগেই বেরিয়ে গেছেন। আপনাদের দুজনের খাওয়া-দাওয়ার সব বিল পেমেন্ট করলেন, তারপর গেলেন। ওহ, আপনার জন্য এই মেসেজটা রেখে গেছেন উনি। দিগন্ত হাত বাড়িয়ে নিলো ছোট্ট চিরকুটটা। আজ আকাশ একেবারে ঝকঝক করছে, ব্যালকনি থেকেই দেখা যাচ্ছে সকলের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখা বরফ ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। দেবলীনা বলেছিল, যেদিন আকাশ খুব ক্লিয়ার থাকবে, সেদিন তুমি আর আমি সামনে ধোঁয়া ওঠা কফি নিয়ে বসে দেখবো মহারানী কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। দেবলীনার ইচ্ছেপূরণ করতে পারলো না দিগন্ত। গতকালও আকাশ ক্লিয়ার ছিল। কিন্তু ওর থেকে পালাতে হবে ভেবেই ভোর ভোর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বোরং-এর পথে। দিগন্ত বুঝেছিলো, চোখের আড়াল হলেও মনের আড়াল করা অনেক সময় সম্ভব হয়না। তাই ওই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামের সীমান্তে বসে বসেও ও ভাবছিলো দেবলীনারই কথা। নিজের দৃষ্টিপথকে স্বচ্ছ করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও দেবলীনার চোখের গভীর চাউনিটা বারবার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো দিগন্তর সামনে। অনেক চেষ্টা করেও রাইকে বসাতে পারছিল না চোখের সামনে। কেন যে সব এলোমেলো হয়ে যায়! কেন যে আবার ভালোবাসা নামক মোহময়ী শব্দ জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে ও কে জানে! নিজের মনকে শক্ত করে ভেবেছিল দিগন্ত, কথাতেই আছে আউট অফ সাইড আউট অফ

মাইন্ড। দেবলীনা তো কালকেই ফিরে যাবে কলকাতা, তারপর আর কোনো যোগাযোগই থাকবে না ওর সাথে। তখন তো ওর জীবনে চাকরি, ক্লাবের বন্ধুরা আর ওর রাই। এই কয়েক ঘন্টার দুর্বলতাকে জয় করতে পারলেই জিতে যাবে দিগন্ত। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না রাইয়ের কাছে। অবশেষে চারদিনের ট্রিপ কাটিয়ে ফিরে গেছে দেবলীনা। ও এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। ভয়ে ভয়ে তাকালো দেবলীনার রুমটার দিকে, মনে হলো যেন এখুনি ঘুম চোখে বেরিয়ে এসে বলবে, দিগন্ত, তুমি একা একা কফি খেয়ে নিলে? কি হিংসুটে তুমি! দাঁড়াও নালিশ করবো তোমার পুচু সোনার কাছে। নয়তো আব্দারের গলায় বলে বসবে, আজ ভেবেছি মাথায় পাহাড়ি ফুল গুঁজে ছবি তুলবো। তুলে দেবে ছবিটা?

কতরকমের বায়না যে করছিল এই কটা দিনে তার হিসেব নেই। ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে দিগন্তর। দেবলীনার রেখে যাওয়া ছোট্ট চিরকুটটা খুললো দিগন্ত।

দিগন্ত,

চললাম, খুব ইচ্ছে করছিল যাওয়ার সময় তোমার ঘুমন্ত মুখটা একবার অন্তত দেখে যাই। আর হয়তো দেখা হবে না আমাদের কোনোদিন। না হলেও ক্ষতি নেই, নিরস, কঠোর পাহাড় আমায় যা দিয়েছে তার ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারবো না। কখনো কখনো আমরা মোহ, ভালোলাগা এগুলোর সমার্থক শব্দ হিসাবে ভালোবাসা শব্দটাকে বসিয়ে ফেলি। বহুদিন পরে আবিষ্কার করি, ওটা আসলে ভালোবাসা ছিলই না। তুমিই একমাত্র মানুষ যে

আমাকে ভালোবাসা শব্দের সঠিক অর্থ বুঝতে সাহায্য করেছ। আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। ভালো থেকো দিগন্ত তোমার রাই সুন্দরীকে নিয়ে। না, তোমাদের বিয়েতে আমায় নিমন্ত্রণ করো না। আমি জানি ভালোবাসা বড্ড হিংসুটে হয়। তোমাকে স্বচক্ষে অন্যের হতে দেখার থেকে মৃত্যু শ্রেয়। আমার পরিচয় তোমার কাছে শুধুই সহযাত্রী হয়ে থাকুক।

স্যার, এনি প্রবলেম? আপনার গাড়ি রেডি, বেরোবেন বলেছিলেন।

দিগন্ত অপ্রস্তুত হাতে নিজের ভিজে যাওয়া গাল দুটো মুছে নিলো। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, আজ আর বেরোবো না। কাল একেবারে ট্রেন ধরতে যাবো।

ছেলেটি কি বুঝলো কে জানে, তবে চুপচাপ চলে গেল। দেবলীনার ঘরটাতে বোধহয় নতুন বোর্ডার আসবে। ঘরটা ওয়াশ করার জন্য দুটো ছেলে মেয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল ঘরটাতে, ওদের দরজার কাছে থামিয়ে দিয়ে দিগন্ত বললো, তোমরা মিনিট দশেক পরে এস।

ঘরে ঢুকে বিছানার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলো দিগন্ত দেবলীনা কাল সারারাত ঘুমায় নি। নিভাঁজ বিছানা, বালিশই তার প্রমাণ বহন করছে। জানালার ধারে একটা চেয়ার রাখা। বোধহয় রাতটা ওই চেয়ারে বসেই কাটিয়েছে মেয়েটা। হয়তো নির্ঘুম রাতের প্রতিটা প্রহর গুণছে বসে বসে। অপেক্ষা করছিল কি অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্য ওঠার! এই পাঁচদিনে কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল ওরা নিজেরাও বুঝতে পারলো না। তবে দিগন্ত যত

চেষ্টাই করুক দেবলীনার চোখে ওর দুর্বলতা ধরা পড়ে গেছেই। দেবলীনার বসা চেয়ারেটাতে মিনিট দুয়েক বসলো দিগন্ত। বেতের চেয়ারে আটকে আছে দেবলীনার মাথার লম্বা একটা চুল। টুকরো স্মৃতির মতই ওটাও রয়ে গেছে দিগন্তর জন্যই। ড্রেসিং টেবিলে দুটো সেফটিপিন, একটা কালো টিপের পাতা। ওই পাতাটা থেকেই দুই ভ্রূর মাঝে টিপ পরছিল দেবলীনা। তিনটে টিপ ব্যবহার হয়েছে দেখা যাচ্ছে। নেহাতই অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আনমনে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিলো ও। বেরিয়ে এলো হালকা পায়ে। আজ আর ঘুরতে বেরোতে ইচ্ছে করছে না। একা একা ঠিক করে পৌঁছাতে পারবে তো মেয়েটা। একটা ফোন করে জানবে কি ট্রেন ছাড়ল কিনা!

ধুর, ও কেন এত চিন্তা করছে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক, শিক্ষিতা, চাকুরীরতা মেয়ে এন জি পি থেকে কলকাতা যাবে বাই ট্রেন, তাতে এত ভাবার কি আছে? ফোন করলেই দেবলীনা বুঝতে পারবে দিগন্ত মিস করছে ওকে। কিছুতেই না, এটা ওকে বুঝতে দেওয়া যাবে না।

সারাটা দিন দূরের পাহাড়ের হাতছানির দিকে তাকিয়ে আর গান শুনে কাটিয়ে দিলো দিগন্ত। আনমনে মাঝে মাঝে হেসে উঠছিল ও। দেবলীনার কিছু ছেলেমানুষি মনে পড়ে যাচ্ছিল। দিগন্ত বলেছিল, আপনাকে স্টুডেন্টরা ভয় পায় বলছেন? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। বরং মনে হচ্ছে ইলেভেন টুয়েলভের ছেলেরা আপনাকে প্রোপোজ করে বসবে কোনোদিন। যা দিনকাল আসছে!

দেবলীনা রাগী রাগী গলায় বলেছিল, মোটেই না, আমি আপনার সাথে যেমন ফাজলামি করছি, স্কুলেতে সেটা কখনই করি না। তাই ছাত্ররা আমায় ভীষণ ভয় করে। এই দেখুন, আমি এরকম করে চোখ বড় বড় করলেই ওরা ভয় পেয়ে যায়। দিগন্ত দেখেছিলো, দেবলীনা সত্যিই চোখগুলোকে গোল গোল করে বড় করে রয়েছে। মুচকি হেসে ও বলেছিল, ওরে বাবা, আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। দেখি একটু ওয়াশরুম থেকে ঘুরে আসি।

মেয়েটার পাগলামিতে সাথ দিতে মন্দ লাগছিলো না দিগন্তর। একাকীত্ব শব্দটা যে ভয়ঙ্কর একা সেটা দিগন্তও বোঝে। এই কদিন দেবলীনা সঙ্গে থাকায় একাকীত্বের উৎপাত সহ্য করতে হয়নি ওকে।

যত সময় যাচ্ছিল দিগন্তর টেনশন তত বাড়ছিল। ওর হোয়াটসআপ চেক করে দেখলো, লাস্ট সিন দেখাচ্ছে গতকাল রাত দুটো। তারপর আর অন হয়নি মেয়েটা। ফোন নিয়ে খুটখাট করার অভ্যাস তো ভালোই আছে দেবলীনার। দিগন্তর অবশ্য এসব ফেসবুক টেসবুক মোটেই ভালোলাগে না। তবে দেবলীনা ছবি তুলেই পোস্ট করছিল ফেসবুকে। ওর অ্যাকাউন্টে এই প্রথম উঁকি দিলো দিগন্ত। রঙ্গীত নদীর তীরে সেদিন দিগন্তকে দিয়ে একটা ছবি তুলিয়েছিলো ও। সেটাই প্রোফাইল পিকচার করেছে। নীচে ছবি তোলার সৌজন্যে বলে লিখেছে—"আমায় আবার হাসতে শেখাল যে"। সৃজন চৌধুরীর কমেন্টও চোখে পড়লো দিগন্তর। "লুকিং নাইস" বলে কমেন্ট করেছে। দেখেই অসহ্য রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হলো ওর।

ব্রেকআপ হয়ে গেছে দেবলীনার সাথে, তারপরেও আবার ন্যাকামি কিসের? দেবলীনাই বা ছেলেটাকে এখনো ব্লক করে নি কেন? বিরক্ত লাগছিল ওর। মাথার মধ্যে জমা রাগটাকে নিয়েই কল করে বসলো দেবলীনাকে।

বার দুয়েক রিং হওয়ার পরে রিসিভও করলো ফোনটা। দেবলীনাকে হ্যালো বলার সুযোগটুকু না দিয়েই দিগন্ত বললো, মিনিমাম ভদ্রতাটুকু আশা করা বোধহয় অন্যায় হয়েছে আপনার কাছ থেকে। চারদিন পাশাপাশি থাকার পরেও যাওয়ার আগে সৌজন্যবোধেও বাঁধলো না, দেখা না করেই চলে গেলেন। ট্রেনে উঠেও একটা কল করার প্রয়োজন অনুভব করলেন না। অদ্ভুত মানুষ বটে! কলকাতা ফিরে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়োটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে আপনার! সৃজন চৌধুরীর কমেন্ট দেখেই বোধহয় উতলা হয়ে উঠেছেন। খুব ভালো, ব্রেকআপের পর প্রাক্তন ফিরে এলে ভালোবাসা দ্বিগুণ হয় শুনেছি। যাইহোক, সহযাত্রী হিসাবে একটু বেশিই চেয়ে ফেলেছিলাম বোধহয়। ফোন না করে আমার জায়গাটা বুঝিয়ে দিলেন। হ্যাপি এন্ড সেফ জার্নি। একবারও দম না নিয়েই ঝড়ের গতিতে কথাগুলো বলে দিল দিগন্ত। তবুও মাথার ডান দিকে দেবলীনার ছবিতে সৃজন চৌধুরীর কমেন্ট করার রাগটা এখনো দপদপ করছিল।

দেবলীনা শান্ত নিরুদ্বেগ গলায় বলল, হ্যাঁ ফোন করেছিল সৃজন। সে নাকি আমাকে মিস করছে, তবে এই মুহূর্তে রাকার সাথে এতটা জড়িয়ে গেছে, যে রাকার কাছ

থেকে নিজেকে বের করতে নাকি একটু সময় দিতে হবে ওকে।

আমার বেশ মজা লাগছিল ওর সাথে কথা বলতে। যখনই বুঝলো আমি সৃজন চৌধুরীকে ছাড়াও হাসছি, তখনই মিস করার পরিমাণ বেড়ে গেলো। তবে কি বলতো দিগন্ত, এখন সৃজন কেন, স্বয়ং ভগবানও যদি নেমে এসে বলেন, দেবলীনা আমি তোমায় ভালোবাসতে চাই, তাহলে আমি তার প্রোপোজালও ফিরিয়ে দেব। বললাম না, ভালোবাসা শব্দের অর্থ আমার কাছে এখন রঙ্গীত নদীর জলের মতো স্বচ্ছ। তাই বারবার মোহকে ভালোবাসার প্রতিশব্দ ভেবে ভুল করবো না।

দিগন্ত আমি তোমাকে এই কদিনে সত্যিই ভীষণ বিরক্ত করেছি, অস্বস্তিতে ফেলেছি, রাই তোমার জীবনে আছে জেনেও তোমার দিকে হাত বাড়িয়েছি। জানি, তুমি বারবার পালাতে চেয়েছ আমার কাছে থেকে। তবুও আমি উত্যক্ত করে গেছি, তাই ভাবলাম আজ তোমায় ফ্রি ভাবে এনজয় করার সুযোগটুকু অন্তত দিই।

দিগন্ত কি বলবে খুঁজে না পেয়ে আচমকা বলে বসলো, সবই যে আপনি বুঝে বসে থাকবেন এমন তো নয়। ওই উত্যক্ত করাটাকেই যে আজ মিস করছি আমি, সেটা তো আর কাউকে বলার নেই। যাকগে সাবধানে পৌঁছাবেন। কেউ কিছু ট্রেনে দিলে খেয়ে নেবেন না।

দেবলীনা হেসে বললো, প্যারাসিটামল দিলেও খাবো না তাই তো?

একটু উদ্বিগ্ন হয়ে দিগন্ত বললো, আজও কি জ্বরটা এসেছে নাকি?

দেবলীনা বলল, না আর জ্বর আসেনি। এনজয় ইয়োর লাস্ট ডে ইন রা-বাংলা। আরেকটা কথা, এই যে আবার আপনিতে ফিরে গেলে এটাতেই বুঝিয়ে দিলে, কিছু দূরত্ব কোনোদিন ঘোঁচে না।

ফোনটা কেটে দিলো দেবলীনা। ও নিজেও বুঝছে দিগন্ত হয়তো একটু হলেও দুর্বল হয়ে পড়েছে ওর প্রতি। কিন্তু এই সুযোগটা দেবলীনা কিছুতেই নিতে পারবে না। সারাজীবন রাইয়ের চোখে ছোট হয়ে যাবে ও। হয়তো দিগন্তও কিছুদিন পরে আফসোস করবে নিজের এই সাময়িক ভুলের জন্য। কারণ দেবলীনা বেশ বুঝেছে, দিগন্ত শুধুই রাইকে ভালোবাসে। দেবলীনার খুব ইচ্ছে একবার অন্তত রাইয়ের গলাটা শোনার। দিগন্ত বারবার রাইকে কল করার জন্য আড়ালে সরে যাচ্ছিল, তখন থেকেই ইচ্ছেটা দানা বেঁধেছে ওর। কলকাতা ফিরে একবার অন্তত মিস কলেও শুনবে ওর গলাটা।

।। ১২।।

অফিস জয়েন করেছে দিগন্ত। দু একজন কলিগ এসে বলে গেল, কি ব্যাপার, ঘুরে বেরিয়ে এলে, চাঙ্গা লাগার কথা তো, এত মনমরা কেন লাগছে? কাল রাতে মাও একই কথা বললো, দিগন্ত, তোর কি হয়েছে রে? মনখারাপ? আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বারবার প্রশ্ন করেছে দিগন্ত। কিসের মনখারাপ? কার জন্য মনখারাপ? সহযাত্রী বৈ তো নয়। তাহলে কেন বারবার দেবলীনা উঁকি

দিচ্ছে ওর মনের গোপন কোণে। জোর করে হাসার চেষ্টা করে বললো, কি যে বলো সাগ্নিকদা, বিন্দাস আছি।

গলার স্বরটাই নিজের কাছে অপরিচিত ঠেকলো যেন। ওর গলার স্বরে আনন্দের রেশ মাত্র নেই, যেন এক মুঠো কান্না ঝরে পড়লো। ধুর, রা-বাংলা থেকে ফিরেছে দিন তিনেক হলো, এখনো মনখারাপি বাতাসটা ওর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেবলীনা আর কল করেনি, জানায়নি পৌঁছানোর খবরটাও। ও নিজেও আর কল করেনি। ভুলে যাওয়াই ভাল। রাইকে বুদ্ধ মূর্তিটা দিয়ে বলেছে, আমার এক সহযাত্রী গিফট করেছে তোমায়।

নামটা কেন বলতে পারল না রাইয়ের কাছে! তবে কি চোরা পাপবোধই দেবলীনা নামটা উচ্চারণ করতে বাধা দিল ওকে! কাজকর্ম গুছিয়ে একরাশ মনখারাপ নিয়ে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরল দিগন্ত। ক্লাবে যেতে ইচ্ছে করছিল না। বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে নয় বরং একা থাকতে বড্ড ইচ্ছে করছে ওর। বাড়িতে ঢুকতেই মা বললো, তোর বন্ধু এসেছে, তোর ঘরে ওয়েট করছে।

বন্ধু বলতে সুজয় হবে বোধহয়। ক্লাবে দুদিন না দেখে খোঁজ নিতে এসেছে হয়তো। কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে গেল দিগন্ত। দেবলীনা দাঁড়িয়ে আছে ওর কাঁচের শো কেসের সামনে। ঘন অন্ধকার রঙের একটা শাড়ি পরেছে, সঙ্গে লালচে ব্লাউজ। ঘাড়ের কাছে একটা ব্যাক ক্লিপ ধরে রেখেছে ওর অবাধ্য চুলের গোছা। একমনে তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে। ওর আর রাইয়ের একই দিনে জন্মদিনের ছবি ওটা। একটাই কেক কেটেছিল সেবার।

দিগন্তর পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়ালো দেবলীনা। চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা। যেন এক্সরে মেশিন দিয়ে পড়ে নেবে ওর মনের ভিতরে অলিগলির গোপন কথা।

দিগন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে হালকা গলায় বলল, কি ব্যাপার, খবরাখবর না দিয়ে একেবারে বেডরুমে দিদিমণিকে দেখলে একটুও ভয় করবে না এমন বিচ্ছু ছেলে আমি কোনোদিনই ছিলাম না। দেবলীনা ওর কথায় না হেসে সোজাসুজি প্রশ্ন করলো, রাই কোথায়? একবার তাকে এ বাড়িতে ডাকা যাবে? তার সাথে আলাপ করার বড্ড ইচ্ছে হলো। তাই বিনানোটিশে হানা দিলাম। একটু থতমত খেয়ে দিগন্ত বললো, কি মুশকিল রাই কি এ বাড়িতে সব সময় থাকে নাকি! সে এখন গানের ক্লাসে গেছে না অন্য কোথাও, আমি তো জানি না। দেবলীনা নিজের ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বললো, এই যে রাইয়ের নম্বর, একটা কল করুন না প্লিজ।

দিগন্ত থমকে গিয়ে বলল, কেন হঠাৎ ওকে কেন ডাকতে চাইছেন?

দেবলীনা কাটা কাটা তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, কারণ আপনি তাকে চব্বিশ ঘন্টা ডেকে চলেছেন তো তাই! আরেকবার ডাকুন আমার অনুরোধে প্লিজ।

সামনের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো দিগন্ত। দুটো হাত দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে কেঁদে ফেললো ফুঁপিয়ে।

দেবলীনা থামানোর চেষ্টা করলো না। সুযোগ দিলো বুকের মধ্যে পাথরের মত জমে থাকা বরফগুলোকে গলে যেতে। কষ্টগুলো একটু নরম হোক, বড্ড কঠিন হয়ে বসে

আছে দিগন্তের হৃদয়ে। একটা ভ্রান্ত স্বপ্নের মধ্যে বাস করে দিগন্ত, এখনো বেঁচে আছে একটা ঘোরের মধ্যে। এর থেকে ওকে বের করতেই হবে দেবলীনাকে। এভাবে শেষ হয়ে যেতে দিতে পারে না ও দিগন্তকে।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই দিগন্ত বললো, আমি বিশ্বাস করি রাই আছে। না ও মারা যায়নি। ওর অস্তিত্ব আজও আছে। দেখো ওই ছবিটা, রাই হাসছে। দেখো, ওটাতে ও বায়না করছে বেলুন কিনে দিতে হবে বলে। রাই আমার সাথেই আছে।

দেবলীনা বললো, রাই মারা গেছে দিগন্ত। অ্যাকসিডেন্টটা তো অস্বীকার করতে পারো না! গত দুবছর ধরে রাইয়ের নম্বরে তুমি রিচার্জ করে চলেছ। ওই নম্বরে অকারণে ফোন করে ভুলভাল বকো তুমি। ওই তো ফোনটা পড়ে আছে তোমার ডেস্কে। অসুস্থ হয়ে যাচ্ছ তুমি দিগন্ত। তোমার মা বললেন, রাই নাকি সেবার ওর বন্ধুদের সাথে পাহাড়ে যাচ্ছিল, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে তিনজন স্পট ডেড হয়েছিল, তার মধ্যে রাই বিশ্বাস একজন। তুমিই তো ডুয়ার্সএ গিয়ে ওর বডি সনাক্ত করেছিলে। ওর ফোনটাও বোধহয় তুমিই এনেছিলে ওখান থেকে। দিনে অন্তত বার চারেক বাজে ওই নম্বরটা। সেটা তোমার নম্বর নিশ্চিত জানে বলে কেউ রিসিভও করে না। আমি গতকাল ফোন করেছিলাম রাইয়ের সাথে কথা বলবো বলে। ফোন বেজেই গেল। বার চারেক ফুল রিং হবার পরে একজন মহিলা কণ্ঠ ধরে বললেন, কে বলছেন? আমি বললাম,

রাই আছে? তিনি একটু থমকে গিয়ে বললেন, রাই? আপনি কে?

আমি বলেছিলাম, ওর বান্ধবী। সেই শুনে তিনি বললেন, আপনি কেমন বান্ধবী, যে দুবছর আগে রাই মারা গেছে জেনেও তার নম্বরে কল করছেন? তারপর আমি স্তব্ধ হয়ে ফোনটা কেটে দিয়েছিলাম। আজ তোমাদের বাড়িতে এসে সবটা শুনলাম। তুমি না আমায় বাঁচার কথা বললে, স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে নয়, মুহূর্তকে ভালোবেসে বাঁচতে শেখালে। সেই তুমিই আজ দুবছর ধরে রাইয়ের স্মৃতি অঁকড়ে এভাবে ধূসর অতীতের পিছনে ছুটছ!

দিগন্ত ঘাড় নেড়ে বললো, আমি রাইকে কথা দিয়েছিলাম, ওকে ছাড়া আর কাউকে আসতে দেব না জীবনে। প্রতিদিন নিয়ম করে চারবার ওকে ফোন করতেই হতো। তাই সেই নিয়ম আজও বজায় রেখেছি। দেবলীনা বললো, দিগন্ত তুমি ফোন কানে নিয়ে কেন ওসব মিথ্যে বলে চলছিলে আমার সামনে? দিগন্ত ফুঁপিয়ে উঠে বললো, কারণ তোমায় দেখেই আমার ভাল লেগে গিয়েছিল। তাই নিজেকে সতর্ক করার জন্য রাইকে ভুয়ো ফোন করছিলাম। আমি যে কথা দিয়েছিলাম রাইকে।

দেবলীনা দিগন্তর পিঠে একটা হাত রেখে বললো, কিন্তু রাই যে আর নেই। এটা তোমাকে মেনে নিতে হবে দিগন্ত।

তুমি তো ধীরে ধীরে মানসিক রোগী হয়ে যাবে। যে নেই তাকে শ্রদ্ধা করা যায়, কিন্তু তাকে নিয়ে জীবন কাটানো যায় না দিগন্ত।

চোখের জলটা মুছে দিগন্ত বললো, চলে যাও তুমি। চলে যাও দেবলীনা। যেদিন থেকে তোমাকে দেখেছি, আমার সব হিসেব নিকেশ এলোমেলো হয়ে গেছে। কি জানতে এসেছো তুমি, তোমায় আমি ভালোবাসি কিনা? না বাসি না ভালো। এই কদিনে একবারও মনে পড়েনি তোমায়। প্লিজ লিভ মি। চলে যাও এখান থেকে।

দেবলীনা দিগন্তর মাথার ঘন চুলে আঙুল ডুবিয়ে বললো, আমি তোমার সহযাত্রী হিসাবে এসেছিলাম আজ। ভালোবাসা ভিক্ষে করতে নয় দিগন্ত। আমি চললাম, নিজেকে ভালোবেসে ভালো থাকার চেষ্টা করো তুমি। অতীতটাকে একটু একটু করে দূরে সরানোর চেষ্টা করো।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেবলীনা। ওর ঘন অন্ধকার শাড়ির আঁচলটা পার হয়ে চলে যাচ্ছে দিগন্তর ঘরের চৌকাঠ। আর স্থির থাকতে পারলো না দিগন্ত, উঠে গিয়ে চেপে ধরলো দেবলীনার একটা হাত। আমাকে আর একা করে দিও না দেবলীনা। একাকীত্বের যন্ত্রণা সহ্য করার সব ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

দেবলীনা বললো, আমার দুটো শর্ত আছে। আমাকেও দিনে চারবার ফোন করতে হবে। আর রেগে গেলেই আচমকা আপনি বলে সম্বোধন করতে হবে, ফেরার দিনে ট্রেনের ফোনটার মত। দিগন্ত লজ্জা পেয়ে বললো, সরি, তোমার ছবিতে সৃজনের কমেন্ট দেখে রেগে গিয়েছিলাম। দেবলীনা দুহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, বারবার অমন রেগে যাবে প্লিজ। রাইয়ের মত আমিও কিন্তু খুব হিংসুটে। দিগন্ত, আমার আরেকটা শর্ত আছে। রাইয়ের

ছবিগুলো ওখানেই থাক। ও আমাদের দুজনেরই বন্ধু আজ থেকে। দিগন্ত দেবলীনার কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললো,

'আমি যে নিজেই মত্ত
জানি না তোমার শর্ত
যদি বা ঘটে অনর্থ
তবুও তোমারে চাই।'